গড় নাসিমপুর

বারীন্দ্র নাথ দাশ

[illegible] প্রেস

৩১ এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

: প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী, ১৯৬০

: প্রকাশক :
শ্রীশান্তিরঞ্জন সেন গুপ্ত
৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা

: মুদ্রক :
শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা

: প্রচ্ছদ :
শ্রীগণেশ বসু

—লেখকের অন্য বই—

কর্নফুলি

রঙের বিবি

বেগম বাহার লেন

অনুরঞ্জিতা

পূর্বরাগের ইতিহাস

অন্তরতমা

বিশাখার জন্ম দিন

চায়না টাউন

রাজা ও মালিনী

মিতালী মধুর

নিশীথ-নিঝুম

দুলারীবাই

অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা

ইমন বেহাগ বাহার

বাহাদুর শাহর সমাধি

চন্দ্রচকোর

অতনু ও জীবন দেবতা

নগর কন্যা

শাহজাদা

উপনায়িকা

এক বেগম, এক সুলতান

ইত্যাদি।

: এক : : সূচনা :

ষোলো শো ষাট খ্রীষ্টাব্দ।

তখন গ্রীষ্মকাল। সন্ধ্যা অতীত হয়েছে অনেকক্ষণ। চারদিক ছেয়ে আছে কৃষ্ণপক্ষের তমসায়।

দুটি ছিপ নিঃশব্দে গঙ্গা পার হয়ে এক নির্জন জায়গায় এসে ভিড়লো।

চারদিকে ঘন গাছপালা। মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। এক এক জায়গায় শুধু জোনাকি উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। দূরাগত শৃগালরব আর ঝিঁঝিঁর গুঞ্জন ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শোনা যায় না। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দুটো ছিপ থেকে চুপচাপ বেরিয়ে এলো কয়েকজন লোক। নদীর উঁচু পাড় বেয়ে উঠে এসে একটি প্রাচীন অশথ গাছের নিচে এসে জড়ো হোলো সবাই।

"সবাই এখানে অপেক্ষা করবে," একজনের নেতৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠ শোনা গেল, "শুধু আমি, দেবীকান্ত, মহেশ্বর আর কালীকৃষ্ণ খালের পাড়ে গিয়ে অপেক্ষা করবো। পরে প্রয়োজনমতো নির্দেশ দেবো সবাইকে। মনে রেখো, একটু ভুলের জন্যে দুটি মূল্যবান প্রাণ নষ্ট

হতে পারে। চৌধুরী বংশের মান সম্ভ্রম সব তোমাদের উপর নির্ভর করছে।"

"আমরা জান দেবো ভুজঙ্গ ঠাকুর," একজন বলে উঠলো, "কিন্তু চৌধুরী বংশের মর্যাদা নষ্ট হতে দেবো না।"

"আমাদের প্রাণের দামও অনেক, সেকথাও ভুললে চলবে না," ভুজঙ্গ ঠাকুর বললো, "আমরা মোট কুড়িজন। আর গড়ের ভিতর লোক আছে অন্তত দুশো জন। আমাদের মধ্যে যদি একজনেরও জান যায়, তাহলে অত্যন্ত ক্ষতি হবে।"

সবাই চুপ করে রইলো।

"আমরা একজনকেও হারাতে পারবো না," শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললো ভুজঙ্গ ঠাকুর। তারপর একজনের দিকে ফিরে বললো, "এসো, দেবীকান্ত, আমরা এগিয়ে যাই।"

ঘন বৃক্ষরাজির নিচে দিয়ে সরু পথ চলে গেছে। চারজন এগিয়ে চললো সেই পথ ধরে। অত্যন্ত পরিচিত পথ, তাই অন্ধকারে কিছু দৃষ্টিগোচর না হলেও কারো কোনো অসুবিধে হোলো না।

প্রায় এক দণ্ডকাল পরে ওরা এসে পড়লো একটা খালের ধারে। খানিকটা গিয়েই সে-খাল গঙ্গায় পড়েছে। খালের ওপারে গড় নাসিমপুর।

ছোটো গড়। কিন্তু দুরধিগম্য। এদিকটা গড়ের পশ্চাদ্‌ভাগ। ওদিকে গঙ্গা, এদিকে খাল,—দুদিকে খাড়া দেওয়াল উঠে গেছে। এসময়টা গড়ে লোকজন বেশী নেই। জানলা গবাক্ষ বেশির ভাগই অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষের নক্ষত্রালোকে মসীকৃষ্ণ আকাশের পটভূমিকায় দেখাচ্ছে ভূতুড়ে মহলের মতো।

ভুজঙ্গ ঠাকুর, দেবীকান্ত, মহেশ্বর আর কালীকৃষ্ণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়লো খালের ধারে, একটি বিশাল বটবৃক্ষের নিচের

অন্ধকারে। চারদিক নিসাড় নিঃস্তব্ধ, শুধু অবিরাম ঝিল্লিরব। ক্বচিৎ কদাচিৎ বৃক্ষান্তরালে নিশাচর পাখির ডানার ঝটপট শব্দে জমাট অন্ধকারে একটুখানি আলোড়ন ওঠে। মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসে শেয়ালের ডাক। তারপর আবার এত স্তব্ধ যে, খালের জলে শুকনো পাতা পড়ার শব্দও পরিষ্কার শোনা যায়।

"কোন জানলা দেবীকান্ত?" চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো ভুজঙ্গ ঠাকুর।

"বামদিক থেকে তৃতীয়।"

ভুজঙ্গ ঠাকুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে পর্যবেক্ষণ করলো। তারপর মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করলো, "পারবে তো?"

"পারতে তো হবেই।"

"মায়ের আশীর্বাদে নিশ্চয়ই পারবে," শান্ত কণ্ঠে ভুজঙ্গ ঠাকুর বললো, "এখনো তো দেরী আছে কিছুক্ষণ। যতক্ষণ সঙ্কেত পাওয়া না যায়, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে চুপচাপ।"

সে সময় দেশে খুব গোলযোগ, ঘোর অরাজকতা।

আগ্রা দিল্লী আওরংজেবের দখলে, আগ্রার কেল্লায় বাদশাহ্ শাহ্জাহান আওরংজেবের বন্দী প্রায় ছ বছর ধরে। পাঁচ মাস আগে গোয়ালিয়র দুর্গে কোতল করা হয়েছে শাহজাদা মুরাদ বক্স্কে। তারও তিনমাস আগে খওয়াস্পুরার কয়েদখানায় শাহ-ই আলিজা দারা শিকোকেও হত্যা করা হয়েছে। দারার পুত্র সুলেমান শিকো নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় সপরিবারে গাড়ওয়াল অঞ্চলের শ্রীনগর রাজ্যের রাজা পৃথ্বীসিংহের কাছে আশ্রয় নিয়েছে।

আওরংজেবের নির্দেশে তার মনসবদার রাজা রাজরূপ একদল মোগল সৈন্য নিয়ে শ্রীনগর রাজ্যের সীমান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে সুলেমানকে ধরে আনবার জন্যে।

আওরংজেবের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে টিকে ছিলো শাহজাদা শুজা। কিন্তু তার পরিস্থিতিও নিরাশাজনক। আগের বছর চৈত্র মাসে বাংলার সুবাদার শাহ শুজা খজ্‌ওয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছিলো রাজমহলে। তারপর আজ বছর খানেক ধরে এ অঞ্চলে খুব যুদ্ধবিগ্রহ চলেছে শাহ শুজা এবং আওরংজেবের প্রধান সেনানায়ক মির জুমলার মধ্যে। মোগলবাহিনী মুঙ্গের থেকে সাহেবগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ থেকে সুরি, সুরি থেকে রাজমহলে তাড়িয়ে এনেছে শাহ শুজাকে। মির জুমলার সঙ্গে তখন ছিলো আওরংজেবের পুত্র মহম্মদ সুলতান। ওদের সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা শুজার বাহিনীর দ্বিগুণেরও বেশী। শুজার সহচরদের মধ্যেও অনিশ্চিত ভাব। তার প্রধান উপদেষ্টা অলাওয়ার্দি খাঁকে কোতল করা হয়েছে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে। গঙ্গার পশ্চিম-পাড়ের সমস্ত অঞ্চলটাই মির জুমলার হাতে।

রাজমহলেও টিকতে পারেনি শাহ শুজা। সেখান থেকে হটে এসেছিলো মালদহে। দেখতে দেখতে শুজার সৈন্যসংখ্যা কমে এলো পাঁচ হাজারে। পাটনার ফৌজদার দাউদ খাঁ আরেকদল সৈন্য নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে আক্রমণ করলো শুজার বাহিনীর ডান দিকে। শুজার কন্যা গুলরুখবানুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে মহম্মদ সুলতান আওরংজেবের পক্ষ ত্যাগ করে যোগ দিলো শুজার সঙ্গে। কিন্তু তার সেনাদল অনুগত রইলো মির জুমলার প্রতি। নসিপুর থেকে তণ্ডা, সেখান থেকে মিরদাদপুরের দিকে হটতে লাগলো শুজা। শীতের শেষে মহম্মদ সুলতান আবার শুজাকে ত্যাগ করে চলে গেল মির জুমলার কাছে। মির জুমলা তাকে বন্দী করে পাঠিয়ে দিলো আওরংজেবের কাছে।

শুজা হারতে লাগলো প্রত্যেকটা যুদ্ধে। অচল হয়ে গেল রাজশাহী, মালদহ, বীরভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা। রাজমহল, দোগাছি, তুনাপুর, সুরি, মালদহ, সাহেবগঞ্জ, আকবরপুর, মাহমুদাবাদ, জঙ্গিপুর, বেলাঘাটা, নসিপুর সব মোগল ছাউনিতে পরিণত হোলো। মির জুমলার প্রবল বাহিনীর সামনে আর দাঁড়াতে পারলো না শাহ শুজার সৈন্যদল। ছয়ই এপ্রিল শুজা সপরিবারে তণ্ডা থেকে রওনা হোলো ঢাকার দিকে।

মির জুমলা সবে তণ্ডা দখল করেছে। শুজার বাহিনী যোগ দিয়েছে মির জুমলার সঙ্গে। শুজার নওয়ারা মির জুমলার হস্তগত হয়েছে। ঢাকার দিকে রওনা হওয়ার তোড়জোড় করছে মির জুমলা।

নাসিমপুর পরগণার জমিদার রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ছিলো শাহ শুজার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। যুদ্ধের প্রথম দিকে শুজার কিছু সহায়তা করলেও বছরখানেক ধরে শুজার ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিলো। ভেবেছিলো, এবার স্বয়ং গিয়ে মির জুমলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নতুন বাদশাহ আওরংজেবের প্রতি আনুগত্য জানাবে।

কিন্তু হঠাৎ ভাগ্যের পরিহাসে আজ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী নিজেই গড় নাসিমপুরে বন্দী। এবং এর পেছনে ছিলো এক অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্র।

আর—তাঁর জীবনমরণ এখন নির্ভর করছে দেবীকান্তের উপর, যাকে তিনি কোনোদিনই ভালো চোখে দেখেন নি, যাকে তিনি বিষয়সম্পত্তিচ্যুত করেছিলেন, যাকে তিনিই করেছিলেন নিরাশ্রয়।

ভুজঙ্গ ঠাকুর কি যেন বলছিলো অন্য দুজনকে। দেবীকান্তর কানে কোনো কথা গেল না। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো খালের ওপারে গড় নাসিমপুরের দিকে।

: দুই : : দেবীকান্ত :

দেবীকান্ত চারদিকে তাকিয়ে দেখলো।

কৃষ্ণপক্ষের নিশুতি রাত থমথম করছে। পশ্চিম আকাশে ঘন গাছপালার আড়ালে ক্ষীণ চাঁদ অস্তমিতপ্রায়। গঙ্গায় ভাঁটার টান এসেছে। খালের জল নদীর দিকে বইতে শুরু করেছে কুলকুল করে। খুব মৃদু শব্দ। মাঝে মাঝে একটু একটু করে হাওয়া দিচ্ছে। শিরশির করে উঠছে বাঁশবনের পাতা।

দূরে মাটির উপর শুকনো পাতা মরমর করে উঠলো। ইঁদুর কি ছোটো সাপ কিছু একটা হবে। অন্ধকারের ভিতর থেকে পাখা মেলে নেমে এলো একটি মস্তো বড়ো প্যাঁচা, সেখানে ছোঁ মেরে আবার পাখা ঝাপ্‌টে মিলিয়ে গেল গাছপালার অন্ধকারে। দেবীকান্ত সাহসী পুরুষ, কিন্তু তার বুকও একটু দুরুদুরু করে উঠলো। এটা কোনো অশুভ লক্ষণ নয় তো!—ভাবলো সে। তার খুব অসোয়াস্তি লাগছে, অনিশ্চিতির অসোয়াস্তি। তাকে একলা লুকিয়ে ঢুকতে হবে ওই গড়ের ভিতর। তারপর মা কালী ভরসা। কি হবে না হবে কেউ বলতে পারে না। যে উদ্দেশ্য

নিয়ে সে এই অসমসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছে, সে উদ্দেশ্য সফল হবে কি না হবে, নির্ভর করছে তার উপস্থিতবুদ্ধি ও ভাগ্যের উপর।

দু-তিনটি শিয়াল ডেকে উঠলো একসঙ্গে। কিছুক্ষণ পরে মিলিয়ে গেল তাদের ঐকতান।

ওপাশে তাকিয়ে দেখলো দেবীকান্ত। কালীকৃষ্ণ আর মহেশ্বর একটি গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোমরে ঝুলছে খাটো তলোয়ার। মুখের ভাব নির্বিকার। বহুদিনের বহু দুঃসাহসিক কাজের সঙ্গী এই কালীকৃষ্ণ আর মহেশ্বর, আজো তার সঙ্গ না নিয়ে পারে নি। ওরা প্রথমটা শুনতেই চায়নি, বলেছিলো দেবীকান্তকে একলা অতোখানি ঝুঁকি নিতে দেবে না, ওরাও যাবে সঙ্গে। ওদের অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করেছে দেবীকান্ত। বলেছে, উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে তার একলা যাওয়াই প্রয়োজন, সমস্ত পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে সেভাবেই। ওরা এই শর্তে দেবীকান্তর কথায় রাজী হয়েছে যে, বিপদ ঘটলে দেবীকান্ত সংকেত করবে, এবং তখন তারা গড়ের ভিতর ঢুকবে যেমন করেই হোক, কেউ তাদের আটকাতে পারবে না।

দেবীকান্তকে একলা যেতে দেওয়ার ইচ্ছে ভুজঙ্গ ঠাকুরেরও ছিলো না। কিন্তু অন্য কোনো উপায় ছিলো না বলে তাকেও রাজী হতে হয়েছিলো। এবং সে একটা পরিকল্পনাও স্থির করে ফেলেছিলো দেবীকান্তকে উদ্ধার করবার, যদি সে কোনো বিপদে পড়ে। অনেক বিপদের ঝুঁকি ছিলো এই কাজে, তাই দুশ্চিন্তা ছিলো তারও।

কালীকৃষ্ণ আর মহেশ্বর চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো, কিন্তু ভুজঙ্গ ঠাকুর চুপ করে বসে থাকতে পারে না। সে নিঃশব্দে ঘুরে ঘুরে চারদিক পর্যবেক্ষণ করছিলো। কিছুক্ষণ পরে বোধ হয় ক্লান্তি বোধ করলো। যে গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিলো দেবীকান্ত, তারই গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে পড়লো।

আকাশে ছড়িয়ে আছে মুঠো মুঠো তারা। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেবীকান্তর মনে পড়লো অনেক পুরোনো কথা।

ওই গড় নাসিমপুরের ভেতরের মহলের ছাদে বসে ছেলেবেলায় কতোদিন আকাশের তারা গুনেছে।

একটির পর একটি মনে পড়লো সেই সব পুরোনো দিন।

এগারো বারো বছর আগেকার কথা।

আগ্রায় তখন বাদশাহ শাহ্‌জাহান অসীম প্রতাপের সঙ্গে রাজত্ব করছে। তরুণ শাহজাদা আওরংজেব মুলতান ও সিন্ধুর সুবাদার, কান্দাহারের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। বাংলার জমিদারদের মহলে-কাছারিতেও আলোচনা হচ্ছে সে সম্বন্ধে। জোর গুজব শোনা যাচ্ছে যে ইরাণের শাহ্‌ হিন্দুস্তান আক্রমণ করার উদ্যোগ করছে, সে জন্যেই এ যুদ্ধের প্রস্তুতি। বাংলা তখন শান্তিময়, রাজমহলে সাত বছর ধরে কায়েম হয়ে আছে সুবাদার শাহ শুজার উদার শাসন।

সুবর্ণগ্রামের জমিদার রায় রায়ান উমাকান্ত রায়, শাহ শুজার প্রধান উমরাহ অলাওয়ার্দি খাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। বাদশাহর উজীর সাহুল্লা খাঁ স্বয়ং নেকনজর রাখে উমাকান্ত রায়ের উপর। এক সময় আগ্রায় সাহুল্লা খাঁর কাছারিতে নায়েবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলো উমাকান্ত রায়। রাজপুত ছাড়া অন্য কোনো হিন্দু এর উপরে পদোন্নতি লাভ করতো না বড়ো একটা। তার জমিদারির সনদে ছিলো স্বয়ং শাহ-ইন-শাহর পাঞ্জা। বাংলার জমিদার সমাজে যথেষ্ট সম্মান ছিলো উমাকান্ত রায়ের।

তারই একমাত্র সন্তান দেবীকান্ত।

শিশুসন্তান দেবীকান্তকে রেখে তার জননী দেহত্যাগ করেছিলো অল্পবয়েসেই। উমাকান্ত আর দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহণ করেনি। সাধন ভজন পূজাপাঠ আর জমিদারি শাসন নিয়েই পড়ে থাকতো সর্ব সময়। জমিদারির বাইরে কোথাও আর যেতো না, শুধু বছরে একবার রাজমহলে যেতো সুবাদারের দরবারে উপস্থিত হয়ে নজরানা দিতে। বন্ধুবান্ধব, পূর্বপরিচিত কারো সঙ্গেই আর যোগাযোগ বড়ো একটা ছিলো না।

একমাত্র বন্ধু ছিলো শুধু ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

ইন্দ্রনারায়ণ তখন একজন সাধারণ ছোটোখাটো জমিদার। সুবাদার নাজিমের সরকারে নিয়মিত রাজস্ব যুগিয়ে যায়, তাই সুবাদারের দেওয়ানের নেকনজরেই আছে। তখনো নাসিমপুরের গড় তৈরী হয়নি, রাজা উপাধির সনদ পায়নি ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। কোচবিহারের যুদ্ধে মোগলসেনার রসদ বিভাগে নিযুক্ত ছিলো। মির বকশি মির্জা জান বেগ-এর তদ্বিরে এবং সুবাদার শাহ শুজার সুপারিশে নাসিমপুরের জমিদারির সনদ পায় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

ছোটো জমিদার, আভিজাত্য ছিলো না, কিন্তু মির্জা জান বেগ-এর প্রিয়পাত্র বলে মালদহের ফৌজদার খুব খাতির করতো,—এবং ফৌজদার খাতির করতো বলে প্রকাশ্যে সমীহ করতো অন্যান্য ছোটো জমিদারেরা। ঈর্ষা করতো অনেকেই,— স্নেহ করতো শুধু উমাকান্ত রায়।

উমাকান্ত রায় আর ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দুজনে জীবনের প্রারম্ভে একই সময়, রাজমহলের এক রাজপুত মনসবদারের জায়গিরের গুমশতাহ হিসেবে জীবন আরম্ভ করেছিলো। তখন থেকেই তাদের অন্তরঙ্গতা। জমিদারী-কৌলিন্যে দুজনের মধ্যে সমতা না থাকলেও তাদের সখ্যতায় কোনোদিন পদমর্যাদার পার্থক্যের ছায়া পড়েনি। যাওয়া আসা ছিলো দুজনের পরিবারের মধ্যে।

দেবীকান্তর এখনো ভাসা ভাসা মনে পড়ে তখনকার দিনগুলো, দেবীকান্ত তখন বেশ ছোটো।

পালকি চড়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসতো ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। পাইক পেয়াদা আসতো সঙ্গে। মহলে একটা হৈ-চৈ পড়ে যেতো।

ইন্দ্রনারায়ণও বিপত্নীক, একটি ছোটো মেয়ে ছিলো, নাম উত্তরা। তাকেও সঙ্গে নিয়ে আসতো। কখনো কখনো উমাকান্তর সঙ্গে দেবীকান্তও যেতো নাসিমপুরের চৌধুরীবাড়িতে।

উত্তরা দেবীকান্তর ছেলেবেলার বন্ধু। কতো খেলাধূলো করেছে একসঙ্গে। চোখ বুঁজে ভাবলে আজো দেবীকান্তর কানে ভেসে আসে উত্তরার প্রাণখোলা হাসির লহরী।

এগারো বছর আগেকার কথা, দেবীকান্তর বয়েস তখন দশ, উত্তরার সাত। সুবর্ণগ্রামের রায়দীঘির পাড়ে বৈশাখ মাসের দুপুরে আমবাগানের ছায়ায় ছায়ায় ছুটে ছুটে আম কুড়োনো, নাসিমপুরে গঙ্গার পাড়ে বসে বসে নৌকো গোনা, কালীপূজোর সময় রায়বাড়িতে আতশবাজির ধুম, দোলের সময় চৌধুরীবাড়িতে ফাগ-আবির আর রঙের সমারোহ—আজও পরিষ্কার মনে পড়ে।

উত্তরার সঙ্গে দেবীকান্তর ভাব খুব, আবার ঝগড়াও হোতো অনেক সময়। একজন আরেকজনের বাবার কাছে নালিশ জানাতো। কপট শাসনের আড়ালে দুই অভিভাবকই মুখ টিপে হাসতো। হয়তো দুজনের সম্বন্ধে একটা অন্তরঙ্গ বাসনা দুই অভিভাবকের মনেই ছিলো। পরিচারিকাদের মারফত কানে আসতো উমাকান্ত নাকি ইন্দ্রনারায়ণকে বলেছে,—এরা বড়ো হলে এদের বিয়ে দেবো।

একথার গুরুত্ব বুঝবার মতো বয়েস দেবীকান্তর নয়। সে মাঝে মাঝে উত্তরাকে খ্যাপাতো,—"এই, বাবা কি বলেছেন জানিস? তোর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন।"

বাচ্চা মেয়ে উত্তরা শুনে খুশী হোতো খুব। বিনুনি দুলিয়ে বলতো, "সত্যি সত্যি ? বেশ মজা হয় তাহলে। আমরা সব সময় সারাদিন খেলা করতে পারবো।"

তাদের আরো একজন খেলার সাথী ছিলো। একথা শুনে তার খুব রাগ হোতো।

"বাঃ, দেবীর সঙ্গে তোর বিয়ে হতে যাবে কেন," সে বলে উঠতো, "আমিও বুঝি তোর সঙ্গে খেলি না ?"

"তা না হয় খেলিস। কি হোলো তাতে ?"

"আমিও তোকে বিয়ে করবো।"

"সে কি করে হয় ?" উত্তরা খিল খিল করে হেসে উঠতো!

"কেন হবে না ?"

"বিয়ে দুজনের সঙ্গে হয়না জানিস ?"

"কেন হবে না ? অর্জুন মামার দুই বিয়ে।"

"ওরকম ছেলেদের হয়," উত্তরা বিজ্ঞভাবে উত্তর দিতো, "মেয়েদের হয় না।"

"বেশ, তা হলে তোর বিয়ে শুধু আমার সঙ্গেই হবে।"

"না। আমার সঙ্গে,—" বলে উঠতো বালক দেবীকান্ত।

"আমার সঙ্গে—।"

"কক্ষনো না। আমার সঙ্গে—।"

"আমার সঙ্গে, তোর সঙ্গে নয়।"

"না, আমার সঙ্গে—।"

বচসা করতে করতে মারামারি বেধে যেতো দুটি বালকের মধ্যে। তাদের চিৎকার চেঁচামেচির সঙ্গে উত্তরার তীক্ষ্ণকণ্ঠ মিশে একটা শোরগোলের সৃষ্টি হোতো।

ভৃত্যেরা এসে থামাতো। কথাটা বড়োদের কানে যেতো না বটে, কিন্তু চাকরবাকরেরা হাসাহাসি করতো নিজেদের মধ্যে।

দু-একজন ধমকাতো অন্য ছেলেটিকে,—এই, দেবীকান্তর গায়ে

কি হাত তুলতে আছে ? উনি রাজাবাবুর ছেলে। বলে দেবো দেওয়ানজীকে।

রাজাবাবুর ছেলে। রাজাবাবু মালিক। তার পিতা বেতনভোগী কর্মচারী,—কথাগুলো ঘুরে ফিরে তার মনে গিয়ে বাজতো। গম্ভীর মুখ করে সে সরে যেতো অন্যদিকে।

ওই টুকু বয়েসেই উত্তরা সইতে পারতো না কারো কষ্ট। সে আবার গিয়ে সাধ্যসাধনা করে ছেলেটির মান ভাঙাতো। রাগ পড়ে গেলে সে আবার খেলতে আসতো উত্তরা ও দেবীকান্তর সঙ্গে।

ছেলেটির নাম বাসুদেব। তার বাবা শিবশঙ্কর মজুমদার রায় রায়ান উমাকান্ত রায়ের দেওয়ান।

বাসুদেব দেবীকান্তেরই বয়েসী। দেবীকান্তর খেলার সঙ্গী। দেবীকান্ত তার বাবার সঙ্গে নাসিমপুর গেলে বাসুদেবও সঙ্গে যেতো মাঝে মাঝে। ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে উত্তরা সুবর্ণগ্রামে এলে বাসুদেবও গিয়ে জুটতো দেবীকান্ত আর উত্তরার সঙ্গে। বাসুদেব দেবী-কান্তর খেলার সঙ্গী বটে, কিন্তু সেই বয়েস থেকে সমস্ত ব্যাপারে একটা রেষারেষি দেখা যেতো ওদের মধ্যে। খেলাধূলো, দৌড় ঝাঁপ, কুস্তি, ধনুকবান ছোঁড়া সব কিছুর মধ্যেই যেন খেলার আনন্দের চাইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবই বেশী।

শিবশঙ্কর মজুমদারও বিগতদার। তিনটি বালক-বালিকার মধ্যে এখানেই মিল,—কারোই মা নেই।

শিবশঙ্কর মজুমদারের বিধবা বোন সুরেশ্বরী উমাকান্ত রায়ের মহলেই থাকেন। অন্দরমহলের সব কিছুর দায়দায়িত্ব তাঁরই উপর। তাঁরই কাছে মানুষ হয় দেবীকান্ত আর বাসুদেব।

শিবশঙ্কর মজুমদার রায় রায়ান উমাকান্ত রায়ের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত। সুবর্ণগ্রামের জমিদারির পত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়ানের পদে বহাল হয়েছিলো।

রাজমহলে নাইব-দিওয়ানের দফতরে সাধারণ আমিন ছিলো শিবশঙ্কর মজুমদার। সেখানেই উমাকান্ত রায়ের সঙ্গে পরিচয়। তারপর যখন পদোন্নতি লাভ করে আগ্রায় উজীর সাদুল্লা খাঁর কাছারিতে চাকরি করতে গেল উমাকান্ত রায়, সঙ্গে নিয়ে গেল শিবশঙ্করকেও। তখন থেকেই সঙ্গে সঙ্গে আছে। উজীর সাদুল্লা খাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলো রাজা রঘুনাথ। মোগল বাদশাহ্র এতখানি বিশ্বাসভাজন ছিলো যে সাদুল্লা খাঁর মৃত্যুর পর মির জুমলার নিয়োগকাল পর্যন্ত তিনমাস অস্থায়ী ভাবে উজীরের পদ অলঙ্কৃত করেছিলো ষোলো শো ছাপান্ন খ্রীষ্টাব্দে। পরে আওরংজেব বাদশাহ হবার পর, মির জুমলা যখন বাংলা আক্রমণ করলো, সে সময়ও রাজা রঘুনাথ ষোলো শো সাতান্ন থেকে ষোলো শো তেষট্টি পর্যন্ত তিনবছর কাল বাদশাহর উজীররূপে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত ছিলো। সেই রাজা রঘুনাথ যখন উজীর সাদুল্লা খাঁর নাইব, তখন তার খাস মুন্সির পদ পর্যন্ত পৌঁছেছিলো উমাকান্ত রায়। শিবশঙ্করকেও নিযুক্ত করে রেখেছিলো রাজা রঘুনাথের দফতরে। পরে যখন বাদশাহ শাহ্জাহানের কাছ থেকে জমিদারির ফরমান ও রায় রায়ান উপাধির সনদ নিয়ে সুবর্ণগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করলো উমাকান্ত রায়, শিবশঙ্করকেও নিয়ে এলো সঙ্গে করে। উমাকান্ত জমিদারি গড়ে তুলেছিলো নিজের উদ্যম ও অধ্যবসায়ে, কিন্তু তাতে শিবশঙ্করের অবদানও বড়ো কম ছিলো না। অসাধারণ তীক্ষ্ণধার কূটবুদ্ধি এই শিবশঙ্করের, কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বস্ত। তাকে ছাড়া উমাকান্ত এক মুহূর্তও চলতো না।

স্ত্রীর পরলোকগমনের পর থেকে উমাকান্ত বিষয়কর্মে বড়ো একটা মন দিতো না। কয়েক বছর আগেই সদ্গুরুর কাছে তন্ত্রসাধনায় দীক্ষিত হয়েছিলো। এখন বেশির ভাগ সময় কুলদেবী বিশালাক্ষীর পূজো নিয়েই পড়ে থাকতো।

বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করার সমস্ত দায়িত্ব দেওয়ান

শিবশঙ্করের উপর। সেদিক থেকে উমাকান্তর ভাবনা করার কোনো কারণ ছিলো না। ইন্দ্রনারায়ণকে মাঝে মাঝে বলতো,—"আর কয়েক বছর কোনো রকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তদ্দিনে দেবীকান্ত বড়ো হয়ে উঠবে। তখন উত্তরাকে কুলবধূ করে বাড়িতে এনে সমস্ত ভার পুত্র আর পুত্রবধূর হাতে দিয়ে চলে যাবো কাশী।"

"আমিও কি আর এখানে বসে থাকবো?"—ইন্দ্রনারায়ণ বলতো,—"তোমার ছেলে তো আমারই ছেলে। নাসিমপুরের জমিদারিও তারই। আমিও কাশী চলে যাবো তোমার সঙ্গে।"

একথা শুনে খুশী হোতো উমাকান্ত।

শিবশঙ্কর বলতো, "কর্তামশায়, আমাকেই বা এখানে রেখে যাবেন কেন? আমিও তো বুড়ো হয়ে যাবো তদ্দিনে।"

"বেশ তো, তুমিও যাবে, সুরেশ্বরীও যাবে," উত্তর দিতো উমাকান্ত রায়, "বাসুদেব তখন হবে নাসিমপুর-সুবর্ণগ্রামের জমিদারির দেওয়ান।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়তো শিবশঙ্কর। বলতো, "আমার ছেলে বাসুদেব একটু অন্য ধরনের। ওকে উত্তরা আর দেবীকান্তের সান্নিধ্যে না রাখাই ভালো। একসঙ্গে খেলাধূলো করে, ঠিক মালিক বলে মেনে নিতে পারবে না। ভাবছি ওকে রাজমহলে পাঠিয়ে দেবো। যদি যোগ্যতা থাকে, নিজের গুণে উন্নতি করবে।"

তাতেও আপত্তি নেই উমাকান্তর। সবাই সুখী হলেই হোলো। বলতো, "বেশ তো। বাসুদেব আরেকটু বড়ো হোক। তারপর আমি নিজেই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো রাজমহলে অলাওয়ার্দি খাঁর কাছে।"

এমনি ভাবে দিন কেটে যাচ্ছিলো খুব সহজ ভাবে। কারো মনের আকাশে কোনো মেঘ ছিলো না।

এই অনুগত দেওয়ান শিবশঙ্কর মজুমদারের সঙ্গেই একদিন রায় রায়ান উমাকান্ত রায়ের বিবাদ হোলো।

সঠিক কারণটা আজ আর দেবীকান্তর মনে নেই। তবে সেই সময়কার কয়েকটি ঘটনা ভাসা ভাসা মনে আছে।

একদিন হঠাৎ মহলে খুব থমথমে ভাব। কারো মুখে বিশেষ কোনো কথাবার্তা নেই। সুরেশ্বরীও অত্যন্ত বিষণ্ণ।

বাসুদেবও খুব গম্ভীর। দেবীকান্তর সঙ্গে খেলতে এলো না অন্যান্য দিনের মতো। দেবীকান্ত যখন ডাকতে গেল, সে মুখ ফিরিয়ে রইলো, কথাই বললো না তার সঙ্গে।

কাছারি থেকে ফিরে উমাকান্ত রায় স্নান করে পট্টবস্ত্র পরিধান করে চলে গেল পূজার ঘরে। দরজা বন্ধ করে দিলো ভিতর থেকে। সারাদিন আর দেখাই নেই।

সুরেশ্বরী চুপচাপ খাইয়ে দিলো দেবীকান্তকে। ওর নানা প্রশ্নের উত্তরে শুধু হুঁ-হাঁ করে গেল। খাওয়া শেষ হতে দেবীকান্ত যখন উঠে আসছিলো, হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "হ্যাঁ বাবা, আমরা চলে গেলে তুমি দাশরথির সঙ্গে থাকতে পারবে তো?"

দাশরথি রায়বাড়ির এক পুরাতন ভৃত্য। দেবীকান্ত জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা চলে যাবে কেন পিসীমা?"

সুরেশ্বরী কোনো উত্তর দিলো না।

দেবীকান্ত বললো, "তুমি যদি চলে যাও তো, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।"

সুরেশ্বরী চোখে আঁচল চাপা দিয়ে চলে গেল।

দেবীকান্ত দাশরথিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "দাশু-দা, পিসীমা চলে যাবে বলছে কেন?"

দাশরথিকেও দেখা গেল খুব বিমর্ষ হয়ে আছে। সে চারদিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললো, "দেওয়ানজী এখানে আর থাকবে না। চলে যাবে সুবর্ণগ্রাম ছেড়ে।"

"বাসুদেবও যাবে ?"

"হ্যাঁ দাদা, বাসুদেবও যাবে।"

"সে যাক," একটু প্রীত হয়ে দেবীকান্ত বললো, "কিন্তু পিসীমা যাবে কেন ?"

"ওনারা চলে গেলে পিসীমা তো এখানে একা থাকতে পারবে না দাদাভাই।"

"কিন্তু দেওয়ান-কাকা চলে যাবে কেন ?"

"ওনাকে কর্তামশাই যে খুব বকেছেন। উনি এখানকার কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন।"

"বাবা বকেছেন ?" দেবীকান্ত অবাক হোলো। উমাকান্ত রায় রাশভারী লোক, কিন্তু কাউকে যে ভৎর্সনা করতে পারে, একথা ছিলো দেবীকান্তর ধারণার বাইরে।

"কাউকে বোলো না," চাপা গলায় দাশরথি বললো, "দেওয়ানজী মৃত্যুঞ্জয় তাঁতির ভিটে জবরদখল করেছেন বলে রাজাবাবু ওঁকে খুব বকাবকি করেছেন।"

"জবর-দখল কি দাশু-দা।"

দাশরথি বোঝালো। দেবীকান্ত তার কথার অর্ধেক বুঝলো, অর্ধেক বুঝলো না। তার মনে পড়লো আগের দিন সন্ধ্যেবেলা উমাকান্ত যখন বিশালাক্ষী দেবীর আরতির পর ঠাকুর দালানের বাইরে বেরিয়ে এলো, তখন একটি লোক ও তার স্ত্রী ডাক ছেড়ে কেঁদে আছড়ে পড়েছিলো উমাকান্ত রায়ের পায়ের কাছে।

চারদিকে লোকজন জড়ো হোলো। দোতলার বারান্দা থেকে দেবীকান্তও দেখছিলো, দাশরথি এসে তাকে ডেকে ভিতরে নিয়ে গেল। দেবীকান্ত তখন শুনেছিলো, লোকটি তাঁতিপাড়ার মৃত্যুঞ্জয়।

দাশরথি বলেছিলো, "দেওয়ানজীর কী দোষ, উনি যা করেন মনিবের স্বার্থেই করেন। লোকটি খাজনা দিচ্ছিলো না অনেকদিন ধরে, সেদিন লাঠি চালিয়ে একজন পাইকের মাথাই ফাটিয়ে দিলে।"

"তবে বাবা দেওয়ানজী কাকাকে বকলেন কেন ?"

"রাজাবাবু বলছেন, তাঁকে না জানিয়ে একজন গরীব লোককে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করা হোলো কেন— ।"

"এজন্যে দেওয়ান কাকা চলে যাচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ দাদা, ওনার খুব সম্মানে লেগেছে কিনা। রাজাবাবু যে ওনাকে সবার সামনে বকাবকি করলেন।"

দেওয়ানের চাকরি ছেড়ে দিলো শিবশঙ্কর মজুমদার। উমাকান্ত রায়ও আত্মাভিমানী লোক, শিবশঙ্করকে থেকে যেতে অনুরোধ করলো না একটি বারও।

শিবশঙ্কর রায়বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। সুরেশ্বরীকেও নিয়ে গেল সঙ্গে করে।

ওদের চলে যাওয়ার দিনটি দেবীকান্তর আজও পরিষ্কার মনে আছে।

মহলের বাইরে তিনটি গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে। দুটো মালপত্তরে বোঝাই। দুজন বন্দুকচি ও লাঠি হাতে চার পাঁচজন পিয়াদা দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে গিয়ে পলাশডাঙার বিল পার করে দিয়ে আসবে। ওই অঞ্চলটা ভালো নয়। দুষ্ট প্রকৃতির লোক হামলা করে মাঝে মাঝে।

চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো দেবীকান্ত।

সুরেশ্বরী তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো। বোনকে একটা কড়া ধমক দিলো শিবশঙ্কর। সুরেশ্বরী চোখের জল মুছতে মুছতে গরুর গাড়িতে উঠে বসলো।

বাসুদেব আগেই উঠে বসেছিলো। দেবীকান্ত কাছে গিয়ে ডাকলো, "বাসুদেব, তুই চলে যাচ্ছিস ?"

বাসুদেব মুখ ফিরিয়ে রইলো। কোনো উত্তর দিলো না।

শিবশঙ্কর গাড়িতে উঠছিলো। একবার মুখ তুলে তাকালো

রায়বাড়ির দিকে। এ বাড়ির সঙ্গে তার বহু বছরের যোগাযোগ। হয়তো মনে একটু কষ্ট হচ্ছিলো।

ঠাকুর দালানের দরজা বন্ধ। উমাকান্ত সকাল থেকেই পূজোয় বসেছে। এখন পর্যন্ত বেরোয় নি। হয়তো বেরোবে না এরা যতক্ষণ আছে।

"দেওয়ান কাকা," দেবীকান্ত কাছে এসে ডাকলো।

শিবশঙ্কর এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। একটা হাত রাখলো দেবীকান্তর মাথার উপর। তারপর নিঃশব্দে গাড়িতে উঠে বসলো।

আস্তে আস্তে রওনা, হোলো তিনটে গরুর গাড়ি। আগে আগে চললো দুজন বন্দুকচি। পেছন পেছন অন্যান্য পিয়াদা লাঠিয়ালেরা। দেখতে দেখতে মেঠো পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল।

দাশরথি এসে টেনে নিয়ে গেল দেবীকান্তকে।

সেদিন থেকে দেবীকান্তর দেখাশোনা করার ভার পড়লো দাশরথির উপর।

তারই মুখে দেবীকান্ত শুনেছিলো শিবশঙ্করকে নিজের কাছারিতে ডেকে নিয়ে দেওয়ানের পদে বহাল করেছে ইন্দ্রনারায়ণ

এ সংবাদ উমাকান্তও পেয়েছিলো। কিন্তু রাগ করেনি। মনে মনে খুশীই হয়েছিলো একথা ভেবে যে, শিবশঙ্করের অন্যত্র একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

এ বাড়ি নিমন্ত্রিত হয়ে এসে ইন্দ্রনারায়ণ একদিন বলেছিলো, "ওকে কাজে নিযুক্ত করতে মন একটু খুঁত খুঁত করছিলো, তোমারই দেওয়ান ছিলো সে,—কিন্তু ভেবে দেখলাম, লোকটি অত্যন্ত উপযুক্ত, তাই—"

"না, না, ভালোই করেছো," বলে উঠলো উমাকান্ত রায়,

"আমার এখান থেকে চলে গেছে বলে তার কোনো অসুবিধে হলে আমি সত্যিই দুঃখিত হতাম।"

দাশরথি দেবীকান্তকে বলেছিলো, "দাদা, কাজটা ভালো হোলো না।"

"কেন ?" দেবীকান্ত জিজ্ঞেস করেছিলো।

দাশরথি কি বলেছিলো এতবছর পরে আজ আর দেবীকান্তর মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে যে, সে যা বলেছিলো, বাচ্চা ছেলে দেবীকান্ত তার বিন্দুবিসর্গও বোঝে নি।

এই ঘটনার কিছুদিন পরই রায়-রায়ান উমাকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়।

ভালো করে কিছু বুঝবার বয়েস তখন দেবীকান্তর নয়।

পূজো করছিলো উমাকান্ত রায়। সেই অবস্থায় হঠাৎ সন্ন্যাস রোগের আক্রমণ হোলো। রাতারাতি বড়ো বড়ো কবরেজ এলো মালদহ থেকে। কিন্তু কিছুই করা গেল না। অচেতন অবস্থায় উমাকান্ত রায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

দেখতে দেখতে রায়বাড়ি জনশূন্য হয়ে গেল। নিকট আত্মীয়স্বজন কেউ ছিলো না, দূর আত্মীয় যারা ছিলো সবাই সরে পড়লো এক একজন করে। বাড়িময় বিশৃঙ্খলা। কাছারিতে সব কাজকর্ম বন্ধ, শুধু নায়েব গোমস্তা আমলাদের জটলা। দেবীকান্ত সামনে পড়লে সবাই চুপ করে যেতো, একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাতো তার দিকে।

কয়েকদিন পরে সুবর্ণগ্রামে এসে উপস্থিত হোলো ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। তার খাতির যেন আগের থেকে অনেক বেশী। শিবশঙ্কর

মজুমদার আসেনি। লোকমুখে শোনা গেল সে নাকি হঠাৎ জরুরী কাজে চলে গেছে রাজমহল।

ইন্দ্রনারায়ণ নিজে দাঁড়িয়ে তদ্বির করে শ্রাদ্ধশান্তি করালো। তারপর দেবীকান্তকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল নাসিমপুর।

এই ব্যবস্থায় দেবীকান্ত খুশীই হয়েছিলো। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে সে নিজের হিতৈষী বলেই জানতো। তা-ছাড়া নাসিমপুরের চৌধুরীবাড়ীতে গিয়ে পেয়ে গেল্ল সুরেশ্বরীকে। সুরেশ্বরী চোখের জল মুছে দেবীকান্তকে কোলে টেনে নিলো। সুরেশ্বরীর কাছে এসে নিশ্চিন্ত বোধ করলো দেবীকান্ত। তার কাছে সে বড়ো হয়েছে, তার কাছে ফিরে এসে সে মনে সান্ত্বনা পেলো। বাসুদেবকে হয়তো বলে দেওয়া হয়েছিলো, তার ব্যবহারেও রূঢ়তা অনেক কম। খেলার সঙ্গীকে সব সময়ের জন্যে কাছে পেয়ে উত্তরারও আনন্দের সীমা নেই। ওদের সঙ্গ পেয়ে দেবীকান্তর মনের ভার কেটে গেল অনেকখানি।

নিজের সম্পত্তির কি হলো সে জানতো না, তার জানবার কথাও নয়। অনেক পরে বড়ো হয়ে শুনেছিলো যে, উমাকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর তৎকালীন রেওয়াজ অনুযায়ী সুবর্ণগ্রামের জমিদারি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। তারপর রাজমহলে সুবাদারকে এবং আগ্রায় বাদশাহ্‌কে বহু অর্থ নজর দিয়ে সুবর্ণগ্রাম নিজের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত করার সনদ পায় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

উমাকান্ত রায়েয় মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শিবশঙ্কর মজুমদারের রাজমহলে যাওয়ার কারণ ছিলো এটাই। এই পরিকল্পনার পেছনে ছিলো তারই কূটবুদ্ধি। উমাকান্ত রায়ের আত্মীয়-স্বজন কর্মচারী-আমলাদের অর্থ দিয়ে বশীভূত করা হয়েছিলো, তাই কেউ দেবীকান্তর হয়ে একটা কথাও বলতে আসেনি।

কিছুদিন পর থেকেই নিজের অবস্থার একটা পরিবর্তন দেবীকান্তও অনুভব করতে পারলো।

সুরেশ্বরীর কাছে মায়ের আদর পেলেও অন্য সবার চোখে সে এবাড়ির আশ্রিত। তাই তাদের ব্যবহারও ছিলো সেরকম।

উত্তরা আর বাসুদেবের সঙ্গে সে খেলাধূলো করতো বটে, কিন্তু বাসুদেব ইদানীং মারধর করতো তাকে। তার হয়ে কেউ বলার ছিলো না। উত্তরা তার হয়ে ঝগড়া করতো বাসুদেবের সঙ্গে, কিন্তু বাসুদেব ভ্রূক্ষেপ করতো না। একদিন বলেই বসলো, "ও বাড়িতে দেবীকান্ত ছিলো রাজাবাবুর ছেলে। কিছু বললেই সবাই হাঁ-হাঁ করে আসতো। এখানে আমায় কেউ কিছু বলতে আসুক দেখি!"

উত্তরা টেনে নিয়ে যেতো দেবীকান্তকে। সান্ত্বনা দিতো তার সাধ্যে যতটুকু কুলোয়। দেখা যেতো সুরেশ্বরীও কিছু বলতে সাহস করে না বাসুদেবকে। কারণ, সুবর্ণগ্রামে দেওয়ান শিবশঙ্কর মজুমদারের যতো না প্রতাপ ছিলো, তার চাইতে অনেক বেশী আছে এখানে। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তার কথায় ওঠে বসে।

বাবাকে গিয়ে বলে দাও,—উত্তরা মাঝে মাঝে বলতো দেবীকান্তকে। বাসুদেবের উৎপীড়ন যখন অসহ্য হয়ে উঠতো, দেবীকান্ত বলতে যেতো ইন্দ্রনারায়ণকে। কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণও ইদানীং সহ্য করতে পারতো না দেবীকান্তর সান্নিধ্য, তাকে দেখলেই যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতো, তাকাতে পারতো না তার চোখের দিকে, বার বার চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতো। তার অস্বস্তি-বোধ প্রকাশ পেতে লাগলো ব্যবহারের রূঢ়তায়। শেষ পর্যন্ত দেবীকান্ত এড়িয়ে চলতে শুরু করলো ইন্দ্রনারায়ণকেও।

দেওয়ান শিবশঙ্কর মজুমদারের কড়া হুকুম ছিলো, দেবীকান্তর সঙ্গে যেন ব্যবহারের কোনো তারতম্যতা না হয়, যেন তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোন ত্রুটি না হয়, আর দশজন অভিজাত বংশীয়

বালকের মতোই যেন তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এ হুকুম ঠিকমতো মেনে চলা হচ্ছে কিনা দেখবার অবসর তার ছিলো না। নিজেকে সে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলো ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর জমিদারির শ্রীবৃদ্ধির কাজে।

বছর খানেকের মধ্যেই আগ্রার দরবার থেকে রাজা উপাধির সনদ এলো। গড় তৈরী করার অনুমতিও পাওয়া গেল সুবাদার শাহ শুজার কাছ থেকে।

দেবীকান্তর চোখের সামনেই তৈরী হোলো গড় নাসিমপুর।

তখন দেবীকান্ত আরেকটু বড়ো হয়েছে, বুঝতে শিখছে একটু একটু করে।

সেবছরটা ষোলো শো বাহান্ন খ্রীষ্টাব্দ। দেবীকান্তর বয়েস তখন তেরো হয়ে এলো। হিন্দুস্তানের রাজনীতিতে জটিলতা দেখা দিচ্ছে একটু একটু করে। রাজমহল থেকে কাছারিতে লোকজন আসে প্রায়ই। তাদের মুখে শোনা যায়, শাহ্‌জাহানের পর কে বাদশাহ হবে তাই নিয়ে নাকি মনোমালিন্য দেখা দিচ্ছে শাহজাদা-দের মধ্যে। বিশেষ করে শাহজাদা আওরংজেব আর শাহ-ই-আলিজা দারার মধ্যে নাকি প্রবল রেষারেষি। কান্দাহারে যুদ্ধ করছিলো শাহজাদা আওরংজেব। যুদ্ধে সুবিধে করতে পারেনি। তাকে ডেকে পাঠিয়েছে শাহ-ইন-শাহ বাদশাহ। আওরংজেব ফিরে আসছে। এবার শাহ-ই-আলিজা দারা নিজেই কান্দাহার অভিযানে যাবে বলে শোনা যাচ্ছে। আওরংজেবকে নাকি সুবাদার করে পাঠানো হবে দাক্ষিণাত্যে।

"আমাদের শাহজাদা শুজা এসব গোলমালের মধ্যে নেই," রাজমহল থেকে যারা আসতো ওরা বলতো, "উনিও আছেন সুখে, ওঁর রাজত্বে আমরাও সুখে আছি।"

এসব খবর খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনতো দেবীকান্ত। আগ্রা, দিল্লী, রাজমহলের ঐশ্বর্য জাঁকজমকের গল্প শুনতো, আর কল্পনার

জাল বুনতো মনে মনে। ভাবতো,—যদি আমিও চলে যেতে পারতাম !

এখানে তার আর ভালো লাগছিলো না।

সেই রাত্রির কথা দেবীকান্তর এখনো মনে আছে।

সমাপ্ত হয়েছে গড় নাসিমপুরের নির্মাণকার্য। সেদিন নববর্ষ, গড় নাসিমপুরে খুব ধুমধাম। চারদিক আলোয় আলোকময়, খুব হৈ-চৈ আর আতশবাজির ধুম।

মালদহের ফৌজদার বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, আশপাশের পরগণা থেকে এসেছে আরো কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি।

গড় নাসিমপুর লোকে লোকারণ্য। খাওয়া-দাওয়া নাচগান চলছে সারাদিন ধরে।

সন্ধ্যে থেকেই দেবীকান্তর মন খারাপ। চুপচাপ একা বসে ছিলো মহলের ছাদের এককোণে। পুরোনো দিনের অনেক কথা তার মনে পড়ছিলো। নববর্ষের দিনে খুব হৈ-চৈ আনন্দ উৎসব হোতো সুবর্ণগ্রামে রায়বাড়িতে। এমনিতরো ভিড় হোতো অতিথি অভ্যাগতের। ঘুরে ঘুরে সবার তদারক করতো রায় রায়ান উমাকান্ত রায় নিজে। চোখ বুঁজলে দেবীকান্ত যেন দেখতে পারছিলো তার বাবাকে। থেকে থেকে চোখ দুটি জলে ভরে আসছিলো। পশ্চিমের আকাশে দপদপ করে জ্বলছিলো একটি মস্তো বড়ো তারা। দেবীকান্তর মনে হোলো যেন তার বাবা আকাশের তারা হয়ে স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

একসময় সেখানে এসে উপস্থিত হোলো ইন্দ্রনারায়ণের কিশোরী কন্যা উত্তরা।

"তুই এখানে একলা বসে আছিস কেন?" জিজ্ঞেস করলো সে

"এমনি।"

"সবাই পেছন দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আতশবাজি দেখছে, তুই দেখবি না?"

"না

"কেন রে?"

"আমার মন ভালো নেই।"

"মন ভালো নেই! কেন ভাই?"

দেবীকান্ত চুপ করে রইলো। কোনো উত্তর দিলো না।

উত্তরা তার কাছে এসে দাঁড়ালো। একটি হাত রাখলো তার কাঁধের উপর।

দু-এক মুহূর্ত দুজনেই চুপ করে রইলো। উত্তরার কোমল হাতের সান্ত্বনা-নিবিড় স্পর্শ সন্ধ্যার স্নিগ্ধ সমীরের মতো সতেজ করে তুললো দেবীকান্তর মনকে।

তাদের অন্তরঙ্গতায় একটা গভীরতা এসেছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার মতো বুদ্ধি তাদের তখনো হয়নি।

"কি হয়েছে আমায় বলবি না?" উত্তরা জিজ্ঞেস করলো তার কাজল-পরা চোখ দুটো তুলে।

বলতে খুব ইচ্ছে করলো দেবীকান্তর, কিন্তু তার মনের কথা প্রকাশ করার মতো ভাষা পেলো না। উত্তরার কাছে দেবীকান্ত তার মনের কথা খুলে বলতে পারতো খুব সরল ভাবে। উত্তরা তাকে মানতো খুব, অন্য সবার তাচ্ছিল্য অবহেলার হাত থেকে আড়াল করে রাখবার চেষ্টা করতো নিজের সাধ্যমতো। বাসুদেব কি অন্য কেউ দেবীকান্তর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে উত্তরা দেবীকান্তর হয়ে খুব ঝগড়া করতো, নালিশ করতে যেতো ইন্দ্রনারায়ণের কাছে, শিবশঙ্করের কাছে, সুরেশ্বরীর কাছে। আর অবাক হয়ে ভাবতো,—

কেন ইন্দ্রনারায়ণ কিছু বলে না বাসুদেবকে, কেন শিবশঙ্কর বিরক্তি প্রকাশ করে ছেলেপিলেদের এসব খুঁটিনাটি ব্যাপার তাঁর কানে তোলা হয় বলে, কেন সুরেশ্বরী বাসুদেবের পিঠে হাত বুলিয়ে শুধু বলে,—এরকম করেনা বাবা।

মাঝখান থেকে বাসুদেব আরো চটে যেতো। সুযোগ পেলে দেবীকান্তকে শুনিয়ে দিতো আরো দুচার কথা।

দেবীকান্ত মুখ ফিরিয়ে তাকালো উত্তরার দিকে। বললো, "আমার কিছুই ভালো লাগছে না। তোরা গিয়ে আতশবাজি দেখ। আমার এখানে একলা বসে থাকতেই ভালো লাগছে।"

"আমায় বল না ভাই," উত্তরা অনুনয় করলো।

"কি বলবো ?"

"কেন তোর মন ভালো নেই—।"

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো দেবীকান্ত, তারপর আস্তে আস্তে বললো, "বাবার কথা মনে পড়ছে।"

উত্তরা একটু চুপ করে রইলো, তারপর দেবীকান্তর হাত ধরে টানলো। বললো, "ওসব কথা শুনবো না। এমন দিনে কেউ মন খারাপ করে ? সবাই আতশবাজি দেখছে, আর তুই এখানে একলা বসে থাকবি ! চল তুই আমার সঙ্গে।"

"তুই যা—।"

"না। তুই না এলে আমি রাগ করবো বলে দিচ্ছি।"

অগত্যা দেবীকান্ত চললো উত্তরার সঙ্গে। নিচে যাওয়ায় পথে সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল রাজা ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে।

কি যেন দরকারে মহলের ভিতর এসেছিলো। এমনিই স্নেহভরে জিজ্ঞেস করলো কন্যাকে, "কি খবর তোমাদের ? কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?"

সব কিশোরীর মতোই একটু বেশী কথা বলে উত্তরা। সে বলতে শুরু করলো, "পেছন দিকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবাই

আতশবাজি দেখছে, তাই দেবীকান্তকেও ধরে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে। ওতো কিছুতেই আসবে না। ওর মন খারাপ কিনা, তাই একলা চুপচাপ বসেছিলো ছাদের কোণে।”

“মন খারাপ? কেন?” একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো রাজা ইন্দ্রনারায়ণ।

আজকের দিনে তার নিজের মন মেজাজ খুব ভালো, তাই আর কারো যে মন খারাপ হতে পারে ভাবতেই পারে না। মালদহের ফৌজদার বলেছে, সে চেষ্টা করবে যাতে রাজা ইন্দ্রনারায়ণের গড়ের বুরুজে দুটো তোপ রাখবার অনুমতি পাওয়া যায়। আজকাল জলদস্যুদের উৎপাত বড্ড বেড়েছে, তাই এ অনুমতি পেতে অসুবিধে হবে না।

গড়ে তোপ রাখার অনুমতি, এ এক মস্ত সম্মান। এ অঞ্চলে আর কোনো হিন্দু জমিদারের এই সম্মান অর্জন করার সৌভাগ্য হয় নি এ পর্যন্ত। তাই খুব সুপ্রসন্ন ছিলো রাজা ইন্দ্রনারায়ণ।

হেসে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলো, “কেন তোমার মন খারাপ, দেবীকান্ত?”

উত্তরাই উত্তর দিলো, “ওর বাবার কথা মনে পড়ছে।”

বাবার কথা মনে পড়ছে! রায় রায়ান উমাকান্ত রায়ের কথা! হঠাৎ যেন রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মুখের উপর কেউ চাবুক মারলো। দপ করে নিভে গেল মনের সমস্ত খুশির আলো।

ইদানীং রায় রায়ান উমাকান্তের নাম কেউ করতো না রাজা ইন্দ্রনারায়ণের সামনে। করলে যে সে বিরক্ত হয় সবাই জানতো। মনকে মাঝে মাঝে প্রবোধ দিতো ইন্দ্রনারায়ণ,—শাহী কানুন অনুযায়ী উমাকান্ত রায়ের জমিদারি সরকারে বাজেয়াপ্ত তো হোতোই, অন্য কেউ সেই জমিদারির মালিক হওয়ার সনদ পেতো, না হয় তদ্বির করে আমিই পেয়েছি। জমিদারি অন্য কারো হাতে

গেলে কে দেখতো উমাকান্ত রায়ের ছেলেকে? আমি কী এমন অন্যায় করেছি? ওর ছেলেকে যে নিজের ছেলের মতো করে মানুষ করছি, সেটা কি কিছু নয়? কেন লোকে একথা বলবে যে, উমাকান্ত রায়ের ছেলেকে বঞ্চিত করে আমিই তার বিষয় সম্পত্তি ভোগ করছি?

কেউ হয়তো মুখ ফুটে বলতো না একথা, কিন্তু রাজা ইন্দ্রনারায়ণের মনে হোতো তার আড়ালে লোকে নিশ্চয়ই এমন কথা বলাবলি করে।

আজ তার মনে হোলো না যে, নববর্ষের এই উৎসবের দিনে ওইটুকু ছেলে দেবীকান্তর তার বাবার কথা মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক। ইন্দ্রনারায়ণের বিবেক কোথায় যেন অহরহ খোঁচা দিতো তার মনে। আজ তাই মেয়ের মুখে একথা শুনে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হোলো ইন্দ্রনারায়ণ। প্রথমটা মুখে কোনো কথা এলো না। তারপরই সংযম হারিয়ে অত্যন্ত তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, "বটে? বাবার কথা মনে পড়ছে! আমি দেবো খেতে পরতে, আমার মহলে উৎসবের দিন উনি মন খারাপ করে ওঁর বাবার কথা ভাববেন?"

উত্তরা স্তম্ভিত হয়ে ইন্দ্রনারায়ণের দিকে তাকালো, পিতাকে এরকম রুক্ষ ভাষায় কথা বলতে সে কোনোদিন শোনেনি।

এরকম ব্যবহার আশা করেনি দেবীকান্তও, সে বিস্মিত হয়ে তাকালো ইন্দ্রনারায়ণের দিকে।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণ বলে গেল, "মন যদি খারাপ করতে হয়, গড়ের বাইরে ফাঁকা মাঠ আছে, সেখানে গিয়ে মন খারাপ করো। এখানে আমার বাড়ির ভিতর বসে মন খারাপ করে চৌধুরীবাড়ির অকল্যাণ করতে হবে না।"

বলতে বলতে ইন্দ্রনারায়ণ নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

পাথরের মতো শক্ত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো দেবীকান্ত। উত্তরা খুব মর্মাহত হয়েছে। খুব অপরাধী মনে হোলো নিজেকে।

তাকে বললো, "দ্যাখ, বাবা এরকম রেগে যাবেন জানলে আমি ওকথা বলতাম না। মিছি মিছি তোকে বকুনি খেতে হোলো আমার জন্যে।"

"না, তোর কোনো দোষ নেই," শুকনো কণ্ঠে দেবীকান্ত উত্তর দিলো।

সমস্ত ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলো উত্তরা। বাইরে আতশবাজির কান ফাটানো শব্দ। সে ছু-চারবার টানাটানি করলো দেবীকান্তকে।

সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামতে লাগলো দেবীকান্ত। কিন্তু পেছন দিকের বারান্দার দিকে গেল না। হাঁটতে লাগলো উল্টো দিক ধরে।

"আতশবাজি দেখবি না?" উত্তরা জিজ্ঞেস করলো।

"না।"

"কেন?"

"না, আমি দেখবো না। আমার ভালো লাগছে না। তুই গিয়ে দেখ।"

"তুই কোথায় যাবি?"

"এমনি একটু বেড়িয়ে আসি গড়ের পাঁচিলের ওধারে।"

"চল, আমিও যাবো।"

"না, তোকে আসতে হবে না। কাকামশায় রাগ করবেন।"

উত্তরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। দেবীকান্ত চলে যাচ্ছিলো, উত্তরা ডাকলো।

"শোন দেবীকান্ত, একটা কথা বলবো তোকে?"

"কি কথা?"

"ত্যাখ, বাবার কথায় কক্ষনো মন খারাপ করিস না। বড়োরা ছোটোদের সব সময় এরকম বকে। আমায়ও তো কতো বকেছেন কাল।"

চুপ করে উত্তরার কথা শুনলো দেবীকান্ত। তারপর চলে যাচ্ছিলো, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে ডাকলো, "উত্তরা।"

"কি ভাই?"

"আচ্ছা, আমি যদি কোনোদিন চলে যাই এখান থেকে?"

"চলে যাবি?" উত্তরা হেসে ফেললো, "কেন ভাই?"

"যে কারণেই হোক, মনে কর আমি যদি চলে যাই?"

"আমায় ছেড়ে?"

খুব সরল মনে বললো কিশোরী মেয়েটি, কিন্তু তার এই সহজ কথাতেই কিশোর দেবীকান্তর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

সে উত্তর দিলো, "মনে কর তোকেও ছেড়ে যদি চলে যাই?"

"খুব ভালো হয়," উত্তরা হাসিমুখে বললো।

"ভালো হয়?" দেবীকান্ত বিস্মিত হয়ে তাকালো। এ উত্তর সে আশা করেনি। সে ভেবেছিলো উত্তরা তাকে অনুনয় করবে এসব কথা মনেও স্থান না দেওয়ার জন্যে।

"হ্যাঁ, বেশ ভালো হয়," উত্তরা বলে গেল, "তুই রাজমহল চলে যা। কিংবা আগ্রা, নয় তো বা দিল্লী। সেখানে গিয়ে সবাই নাকি খুব উন্নতি করে। যখন ফিরে আসবি, খুব মজা হবে।"

"মজা!" বিমর্ষতা সত্ত্বেও দেবীকান্ত না হেসে পারলো না। "মজা হবে কিরকম?"

"যখন ফিরে আসবি, তখন তো তোর সঙ্গে অনেক লোকজন আসবে, হাতি আসবে, ঘোড়া আসবে। খুব মজা হবে তখন। সবাই চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করবে,—কে ইনি? কোথাকার রাজপুত্তুর? আমি বলবো,—আরে, এ যে দেবীকান্ত গো। তখন বাবা চিনতে পেরে বলবেন,—দেবীকান্ত? আমাদের দেবীকান্ত? এসো বাবা, এসো এসো। কোথায় ছিলে এই ক-বছর? আমরা সবাই কতো বলাবলি করি তোমার কথা।—বুঝলি দেবীকান্ত, তখন

সবাই তোর যে কী খাতির করবে বলার নয়। আর, তখন ভয়ও পাবে। বাসুদেবও তোকে আর মারধোর করতে সাহস করবে না।"

হাসিমুখে উত্তরার কথা শুনছিলো দেবীকান্ত। সে থামতে জিজ্ঞেস করলো, "আর তুই ?"

"আমি ?" হেসে উঠলো উত্তরা। "আমি তখন সবাইকে বলবো, "কেমন ? আমি বলতাম না, দেবীকান্ত খুব মস্ত বড় লোক হবে।"

বলতে বলতে উত্তরার খেয়াল হোলো যে, বড্ড বেশী আকাশ-কুসুম কল্পনা করা হচ্ছে। বললো, "কেন মন খারাপ করছিস দেবীকান্ত ? আয় না ভাই, সবাই মিলে আতশবাজি দেখবো। দেখবি এক্ষুনি মন ঠিক হয়ে গেছে।"

"না," বললো দেবীকান্ত।

"আসবি না ?"

দেবীকান্ত ঘাড় নাড়লো।

উত্তরার হোলো রাগ। বললো, "বেশ, দেখিস না। যা তোর যেখানে খুশী। এত সাধলাম, ওঁর রাগ পড়ে না কিছুতেই। অনেক সেধেছি, আর পারি না বাবা।"

দেবীকান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

"তুই আসবি না ?" জিজ্ঞেস করলো উত্তরা।

"না।"

"এত সাধছি, তবু আসবি না ?"

"আমার ভাল লাগছে না।"

উত্তরা আর কিছু বললো না, চলে গেল রাগ করে।

দেবীকান্ত দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে চললো বাইরের দিকে।

সেদিন চারদিকে প্রচুর লোকজন, অনেকের যাওয়া আসা, তাকে কেউ লক্ষ্য করলো না।

এক জায়গায় একজন বাজিকর নানারকম কসরত দেখাচ্ছে। খুব ভিড় সেখানে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখলো দেবীকান্ত, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো ফটকের দিকে। এক পাশে শামিয়ানা খাটিয়ে যাত্রা হচ্ছে, দর্শকদের পেরিয়ে এগিয়ে গেল দেবীকান্ত। মহলের দোতলায় মজলিসঘর থেকে গানের সঙ্গে সারেঙ্গি, তবলা আর ঘুঙুর শোনা যাচ্ছে। চোখ তুলে একবার তাকালো সেদিকে, তারপর সিংহদ্বার পেরিয়ে চলে এলো গড়ের বাইরে।

ফটকের চৌকি-পাহারা নিজেদের গল্পগুজবে মশগুল। সেদিন পাহারার কড়াকড়ি একেবারে নেই। অনেক লোকের আনা-গোনায় কারো দিকে নজর দেওয়ার অবসর তাদের নেই। গড়ের সিংহদ্বার পেরিয়ে সামনে একটা খাল, গঙ্গার ওধার থেকে কেটে আনা হয়েছে। গড়কে বেষ্টন করে এধার দিয়ে ঘুরে আবার গিয়ে পড়েছে গঙ্গায়।

খালের উপর দিয়ে একটি নাতিপ্রশস্ত সাঁকো। দেবীকান্ত সাঁকো পার হয়ে এলো। খালের ওপারে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ। একটি গাছও নেই সেখানে, সবই কেটে নির্মূল করা হয়েছে।

দেবীকান্ত আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো মাঠের মাঝখান দিয়ে।

উন্মুক্ত আকাশের নিচে সীমাহীন নির্জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তার খুব ভালো লাগলো। হু-হু করে হাওয়া বইছে চারদিকে। সে একটা বিপুল মুক্তির নতুন আনন্দের অনুভূতি পেলো উদ্দাম বাতাসে। এখানে আর গুমোট নয় গড়ের ভিতরের পুরু দেওয়াল-ঘেরা মহলের মতো। এখানে লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচি হট্টগোল নেই, আছে একটা আশ্চর্য স্তব্ধতা। আছে শুধু নির্ভাবনায় সামনের দিকে এগিয়ে চলার একটা আশ্চর্য স্বাধীনতা, খালি পায়ে ঘাস আর মাটির কোমল স্পর্শের একটা অনন্য সুখানুভূতি।

আরো কতোদিন এসেছে এখানে, কোনোদিন তো এতো ভালো লাগেনি!—দেবীকান্ত ভাবলো—আর তো একলা মনে হচ্ছে না নিজেকে।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলো দেবীকান্ত। তার ভালো লাগছে সব কিছু, খোলা হাওয়া, খোলা মাঠ, খোলা আকাশ, সব কিছুই। তাড়াতাড়ি পা ফেলে হাঁটতে লাগলো সে, হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল অনেকখানি পথ।

তারপর হঠাৎ দৌড়াতে ইচ্ছে করলো তার। দম নিয়ে খুব জোরে ছুটলো সে, ছুটতে ছুটতে সময়ের আর খেয়াল নেই। অনেকক্ষণ পরে একবার একটু থেমে পেছন ফিরে তাকালো। গড় নাসিমপুর পেছনে অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে উত্তরার পুতুল-ঘরের মতো।

দাঁড়িয়ে পড়লো দেবীকান্ত। ভাবলো একটুখানি। এবার কি ফিরে যেতে হবে? না, না, আর নয়, আর ওখানে নয়। ওখানে সে আর ফিরে যাবে না। ওই গড়ের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে মরতে চায় না সে। এই যে হঠাৎ মুক্তির একটা আনন্দ সে পেয়েছে, আর কোনো কিছুর বিনিময়ে এটা হারাতে রাজী নয়।

সে ঘুরে দাঁড়ালো। পিছন ফিরে তাকালো না একটিবারও, ছুটতে লাগলো প্রান্তরের শেষে অন্ধকার অরণ্যরেখা লক্ষ্য করে।

হঠাৎ একবার থামলো। মনে পড়লো উত্তরার কথা।

তাকে বলে এলে হোতো,—ভাবলো সে। মনটা টনটন করে উঠলো। কিন্তু না, ওখানে আর নয়। শুধু উত্তরাকে বলার জন্যে আর ফিরে যাওয়া যায় না।

উত্তরা ঠিক জানতে পারবে। তাদের তো কথা হয়ে গেছে। সে বুঝে নেবে দেবীকান্ত চলে গেছে রাজমহল কি আগ্রা। সেখানে গিয়ে বাদশাহর ফৌজে ভর্তি হবে। আজ না হোক, দুদিন পরে যখন বড়ো হবে, তখন। তারপর একদিন ফিরে আসবে, সঙ্গে

আসবে অনেক লোকজন, হাতি-ঘোড়া, সেপাই-লস্কর। প্রথমটা কেউ চিনতে পারবে না। তারপর উত্তরা হঠাৎ বলে উঠবে,—আরে, এযে আমাদের দেবীকান্ত গো।

তার কিশোর মনের উদ্দাম কল্পনা তার দৌড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চললো বেপরোয়া মেঠো হাওয়ার মতো। একমনে ছুটতে লাগলো দেবীকান্ত, মনে হোলো সে একলা হলেও নিঃসঙ্গ নয়। আকাশের চাঁদ আর তারাগুলিও ছুটছে তার সঙ্গে।

ছুটতে ছুটতে কখন সেই বিস্তৃত প্রান্তর শেষ হয়ে এলো, কখন নিবিড়তর হোলো সন্ধ্যার অন্ধকার। দূরের ছোটো গাছগুলো বড়ো হয়ে বড়ো হয়ে বড়ো হয়ে হঠাৎ যেন তার সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

আবার পেছন ফিরে তাকালো দেবীকান্ত।

অনেক, অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে গড় নাসিমপুর,—ছোট্টো, এই একটুখানি। মাঝে মাঝে অন্ধকারের বুক চিরে আকাশে দেখা যাচ্ছে তুবড়ি আর ফুলঝুরির সমারোহ।

কিন্তু আতশবাজির শব্দ আর কানে আসছে না এখানে। আসছে শুধু হাওয়ার শন শন শব্দ, আর অবিরাম পত্রমর্মর।

আকাশে চাঁদ, অজস্র তারা, কিন্তু চারদিকে শুধু জমাট অন্ধকার, সে যেন হাত বাড়িয়ে ছোয়া যায়।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দেবীকান্ত। একটু একটু হাঁফাতে লাগলো। তারপর বসে পড়লো একটা গাছের নিচে। খোলা মাঠে এতক্ষণ ভয় করেনি, কিন্তু এবার জঙ্গলের ধারে অন্ধকারের মধ্যে তার গা ছমছম করতে লাগলো।

ফিরে যাবো?—ভাবলো সে।—না, আর ফিরবো না।

মাঝে মাঝে এক একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে ডালপালার অন্ধকারে। ভয় ভয় করছে। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সে ভয় ও ক্লান্তিতে চোখ বুঁজলো।

আর চোখ বুঁজতে না বুঁজতেই ঘুম নেমে এলো হুচোখ ভরে।

যখন জাগলো,—প্রথমটা মনে পড়লো না কিছুই। চারদিকে অন্ধকার। চোখ রগড়ালো সে। তখন মনে পড়লো যে, সে জঙ্গলের ধারে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসেছিলো চোখ বুঁজে।

কিন্তু এতো গাছতলা নয়! চট করে উঠে বসলো সে।

দেখলো,—মাটিতে কিছু খড় বিছানো আছে, তারই উপর শুয়ে ছিলো সে। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো।

এ কি! সে এখানে এলো কোত্থেকে? এ তো একটা পোড়ো মন্দির, গহন অরণ্যের মধ্যে। মন্দিরের চাতালে সে শুয়েছিলো এতক্ষণ।

সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সামনের উঠোনে নেমে এলো।

সেখানে চাঁদের আলোয় বসে আছে চার পাঁচজন লোক। তাকে উঠে আসতে দেখে একজন লোক জিজ্ঞেস করলো, "এই ছেলে, কোথায় যাচ্ছো? জঙ্গলের ভিতর যেও না, হারিয়ে যাবে।"

কাছে একটি মশাল জ্বলছে। মশালের আলোয় তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেবীকান্ত শিউরে উঠলো। দৃঢ় পেশী-সংবদ্ধ তাদের সুগঠিত দেহ, মুখে রুক্ষ কাঠিন্য। কাদের হাতে এসে পড়লাম,—সে ভাবলো।

এদের সাড়া পেয়ে মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একজন।

দেবীকান্ত ফিরে তাকালো। দীর্ঘ তার দেহ, দেখে মনে হয় অতি শক্তিমান পুরুষ। কিন্তু মুখে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ পড়েছে। দীর্ঘ চুল, কিন্তু মুখ গুম্ফ-শ্মশ্রুবিহীন। পরিধানে রক্তবসন, গলায় হাতে বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা। চেহারা খুব সৌম্য। তীক্ষ্ণ চোখ দুটি মশালের আলোয় জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু মুখে একটা স্নিগ্ধ করুণা।

সেও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো দেবীকান্তর দিকে। তারপর কোমলকণ্ঠে ডাকলো, "এদিকে এসো।"

তাকে দেখে মনে একটু সাহস পেলো দেবীকান্ত। সে উঠে এলো ভাঙা সোপান বেয়ে, তার পর দুজনে চাতালের উপর বসলো মুখোমুখি।

"তোমায় গাছতলায় ঘুমিয়ে থাকতে দেখে এখানে তুলে নিয়ে এসেছি," বললো সে, "ওখানে পড়ে থাকা নিরাপদ হোতো না। গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলে কেন?"

"অনেকটা পথ ছুটে এসে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম," দেবীকান্ত উত্তর দিলো।

"তুমি বুঝি পথ হারিয়েছো?"

"না। এমনি ছুটছিলাম।"

"এমনি ছুটছিলে?" তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে লোকটি তাকালো দেবীকান্তর দিকে, "এই জঙ্গলের মধ্যে?"

দেবীকান্ত মুখ নিচু করে রইলো। কোনো উত্তর দিলো না।

"তুমি থাকো কোথায়?"

মাথা নাড়লো দেবীকান্ত। বললো, "ও কথা আমি কাউকে বলতে পারবো না।"

একটু চুপ করে রইলো সেই লোকটি, তারপর খুব স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললো, "আমাকে বলো। আমি কাউকে বলবো না।"

দেবীকান্ত তাকিয়ে দেখলো তার দিকে। মনে হোলো যেন একে বিশ্বাস করা যেতে পারে খুব নিশ্চিন্ত হয়ে।

"বলো, তুমি থাকো কোথায়?"

"গড় নাসিমপুরে।"

একটু বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালো লোকটি। জিজ্ঞেস করলো, "গড় নাসিমপুরে থাকো? তাহলে একা একা এত দূরে কোথায় যাচ্ছিলে?"

দেবীকান্তর মনে হোলো এর কাছে যেন মন খুলে কথা বলা যায়। লোকটিকে তার ভালো লাগছে। বললো, "আমি চলে যাচ্ছি গড় নাসিমপুর থেকে। ওখানে আর ফিরে যাবো না।"

"কেন ?"

"ওখানে আমার ভালো লাগে না।"

"ভালো লাগে না! তাই বলে তুমি কাউকে না বলে চলে যাবে ? এইটুকু ছেলে, কোথায় যাবে তুমি ?"

"আমি রাজমহল যাবো, কিংবা আগ্রায়।"

"পথ চেনো ?"

"না।"

"তা হলে যাবে কি করে ?'

"খুঁজে নেবো।"

একটু গম্ভীর হোলো লোকটি। দেবীকান্তর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো "বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছো ?"

"গড় নাসিমপুরে আমার বাড়ি নয়।"

"তাহলে ? কোথায় তোমার বাড়ি ?"

"আমার বাড়ি নেই।"

"বাড়ি নেই ? সে কি ! মানুষের বাড়ি তো একটা থাকে কোথাও।"

"আমারও ছিলো। এখন আর নেই।"

"ছিলো ? কোথায় ?"

"সুবর্ণগ্রামে।"

"সুবর্ণগ্রামে!" লোকটির ভুরু দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত হোলো, "তোমার নাম কি ?"

"দেবীকান্ত।"

"দেবীকান্ত, স্বুবর্ণগ্রাম আমার খুব পরিচিত। তুমি কাদের বাড়ির ছেলে ?"

"রায় বাড়ির।"

"রায় বাড়ির!" লোকটি একটু ঝুঁকে পড়লো তার দিকে, "তোমার বাবার নাম কি ?"

"ঈশ্বর উমাকান্ত রায়।"

"উ-মা-কা-ন্ত রা-য়!" লোকটি বিস্মিত কণ্ঠে বললো, "স্বুবর্ণ-গ্রামের জমিদার রায় রায়ান উমাকান্ত রায় ?"

"হ্যাঁ।"

"হুঁম!" লোকটি একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। অন্য লোকগুলিও তাদের কাছে এসে দাঁড়ালো। তাদেরও চোখে মুখে একটা বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

"আচ্ছা!" আস্তে আস্তে বললো সেই লোকটি, "তুমি রায় রায়ান উমাকান্ত রায়ের ছেলে!"

দেবীকান্ত চুপ করে রইলো।

"হ্যাঁ, রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তো তোমায় স্বুবর্ণগ্রাম থেকে গড় নাসিমপুরে নিয়ে এসেছিলো। তুমি চলে এলে কেন ?"

একটু একটু করে সব কথা জেনে নিলো সে। তারপর আনমনে কি যেন ভাবতে লাগলো।

অন্য লোকগুলো সব এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

"আমি আর গড় নাসিমপুরে ফিরে যাবো না," বলে উঠলো দেবীকান্ত।

লোকটি সস্নেহে তাকালো তার দিকে। "গড় নাসিমপুরে আর ফিরে যাবে না ?" একটু হাসলো সে। "তা বটে। কেনই বা যাবে ? ইন্দ্রনারায়ণ তোমার কে ? আচ্ছা দেবীকান্ত, ওখানে তো ফিরে যাবেনা, কিন্তু যাবে কোথায় ?"

"ওই যে বললাম, আমি রাজমহলে যাবো, কিংবা আগ্রায়—।"

"কেন ?"

"এদেশে আমি আর থাকবো না।"

"মনে খুব লেগেছে,—না ?" খুব নিচু গলায় বললো লোকটি।

দেবীকান্তর চোখে জল এলো, মুখ নিচু করলো সে। উত্তরা ছাড়া অনেকদিন কেউ তার সঙ্গে এতখানি সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলেনি।

"কোথায় যাবে এদেশ ছেড়ে ? কেনইবা যাবে ? এদেশের তোমার মতো ছেলের প্রয়োজন আছে, দেবীকান্ত।"

গম্ভীর শোনালো তার কণ্ঠস্বর, কিন্তু দেবীকান্ত ঠিক বুঝতে পারলো না সে কি বলছে। সে চুপ করে রইলো।

"আমার সঙ্গে যাবে ?" জিজ্ঞেস করলো লোকটি।

তাকে খুব ভলো লাগছিলো দেবীকান্তর। অসঙ্কোচে বলে উঠলো, "হ্যাঁ, যাবো।"

"বেশ, তাই চলো।"

অন্য লোকগুলি এতক্ষণ শুনছিলো চুপচাপ। একজন এবার বলে উঠলো, "ওকে আমাদের সঙ্গে কোথায় নিয়ে যাবেন, ভুজঙ্গ ঠাকুর ?"

ভুজঙ্গ ঠাকুর!

দেবীকান্ত চমকে উঠে লোকটির দিকে তাকালো। কে না শুনেছে ভুজঙ্গ ঠাকুরের নাম!—দেখলো, লোকটি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

এ লোকটিই ভুজঙ্গ হালদার ? রাজশাহী, মালদহ, বীরভূম, দিনাজপুর, বর্ধমানে তার নাম সর্বজনবিদিত। ভুজঙ্গ ঠাকুরের নাম শুনলে সবার বুক ভয়ে কেঁপে ওঠে।

শাহ শুজার আমল তখন। উত্তর বাংলা মোগলদের দাপটে বেশ শান্তিময় হলেও দক্ষিণে রীতিমতো অরাজক অবস্থা। সেখানে মগ ডাকাত, বোম্বেটে, হার্মাদ ও অন্যান্য জলদস্যুদের রাজত্ব। শাহ

শুজার মোগল নওয়ারা তাদের কোনো রকমে ঠেকিয়ে রাখতো মাত্র, নির্মূল করতে পারেনি। সুযোগ পেলেই দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় হানা দেয় জলদস্যুরা। তাদের নেতাদের নাম লোকের মুখে মুখে ফেরে।

তাদের মধ্যে সব চাইতে বেশী সুপরিচিত ছিলো ভুজঙ্গ হালদার। এরকম দুর্ধর্ষ ডাকাত তখন সুবা বাংলায় আর কেউ ছিলো না। অন্যান্য জলদস্যুরা নদীতীরবর্তী অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও যেতে সাহস করতো না। কিন্তু ভুজঙ্গ হালদারের দল হানা দিতো মালদহ দিনাজপুর অঞ্চলেও।

লোকে বলতো, ভুজঙ্গ হালদার নাকি সিদ্ধ তান্ত্রিক, তাকে ধরতে পারে এমন লোক জন্মায় নি। তার নাম শুনলে মূর্ছা যেতো জমিদার শেঠ সওদাগরেরা। সে ধারে কাছে আছে জানলে মোগল থানাদারেরা তটস্থ হয়ে উঠতো। তার উপস্থিতির সংবাদ পেলে সরে পড়তো দক্ষিণের মগ বোম্বেটে আর ফিরিঙ্গি হার্মাদেরা, কোনো হামলা করতে সাহস পেতো না।

তবে সাধারণ লোকে অতো ভয় পেতো না তাকে, কারণ গরীব চাষী গেরস্তের উপর কোনো হামলা করতো না সে। সে ছিলো নাকি শুধু ধনবান লোকের যম।

তার সম্বন্ধে নানা রোমাঞ্চকর গল্প শোনা যায় সবার মুখে। ফিরিঙ্গি হার্মাদ পেড্রো বিলাসপুরের কালীমন্দির লুঠ ও ধ্বংস করেছিলো বলে নাকি ভুজঙ্গ ঠাকুরের লোকেরা তাদের খুঁজে পেতে ধরে এনে, তাদেরই লাগিয়ে সেই মন্দির পুনর্নির্মাণ করিয়ে নেয়, তাদেরই টাকায়, তাদেরই শ্রমে। নসিপুর পরগণায় অজন্মার সময় সুবাদারের দেওয়ানের লোক জোর করে চাষীদের গোলার মজুত ধান বাকী খাজনা বাবদ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেল বলে, ভুজঙ্গ ঠাকুরের দল তাদের রাজমহল পর্যন্ত ধাওয়া করে সেই ধান ছিনিয়ে নেয়। মোগল নওয়ারার একশো ছিপ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেও

কিছু করতে পারেনি। মান্দারনের রাজপুত রাজা ভুজঙ্গ ঠাকুরের কালীপুজোর প্রণামী বাবদ টাকা দিতে চায়নি বলে রাতারাতি তার মহলে চড়াও হয়ে লাখ টাকার হীরে জহরৎ আর টাকাকড়ি লুঠ করে নিয়েছিলো।—এসব গল্প বিভিন্ন পরগণায় লোকের মুখে মুখে ফেরে।

তার গল্প দেবীকান্ত গড় নাসিমপুরে কতো শুনেছে। সন্ধ্যে হলে মায়েরা অশান্ত বালকদের ঘুম পাড়ায় তার নাম করে, চণ্ডীমণ্ডপে বুড়োরা করে তার দুঃসাহসিক কার্যাবলির আলোচনা। নানা রকম গল্প শুনে দেবীকান্ত মনে মনে কতোবার কল্পনা করেছে তার নৃশংস নির্দয় রূপ।

আজ এই নিথর রাত্রিতে নির্জন অরণ্যের মাঝখানে একটা জীর্ণ কালী মন্দিরে মশালের আলোয় তার করুণাময় মুখশ্রী দেখে দেবীকান্ত বিস্মিত হোলো।

ভুজঙ্গ ঠাকুর হেসে জিজ্ঞেস করলো, "কী হে! নাম শুনে ভয় ধরে গেল নাকি?"

দেবীকান্তও হাসলো, বললো, "না, আমি কাউকে ভয় পাইনা।"

ওর উত্তর শুনে ভুজঙ্গ ঠাকুর খুব হাসলো। তারপর বললো, "বাঃ, এই তো রায়-রায়ান উমাকান্ত রায়ের ছেলের মতো কথা।"

"আমার খিদে পেয়েছে," জানালো দেবীকান্ত।

"করালী!" হাঁক দিলো ভুজঙ্গ ঠাকুর।

একজন উঠে গিয়ে মন্দিরের ভেতর থেকে কিছু ফল এনে দিলো।

দেবীকান্তর খাওয়া শেষ হতে ভুজঙ্গ ঠাকুর বললো, "দেবীকান্ত, তুমি চলো আমার সঙ্গে। তোমাকে আমার প্রয়োজন।" তারপর অন্য সবার দিকে ফিরে বললো, "উমাকান্ত রায় আমার গুরু ভাই। আমরা কাশীতে একই গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলাম।"

গড় নাসিমপুরের পেছনদিকে খালের ওপারে জঙ্গলের অন্ধকারে গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে চোখ বুঁজে বসেছিলো দেবীকান্ত। আট নয় বছর আগেকার এসব পুরোনো কথা তার মনে পড়ছিলো এক এক করে।

কিছুক্ষণ পর সে চোখ খুলে তাকালো। দেখতে পেলো, ভুজঙ্গ ঠাকুর খালের পাড়ে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে গড় নাসিমপুরের দিকে।

সেই বছর নয়েক আগে দেবীকান্ত যখন প্রথম দেখেছিলো ভুজঙ্গ ঠাকুরকে, তখন পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি তার বয়েস। এখন প্রায় পঞ্চান্ন, কিন্তু শরীরে এতটুকু বার্ধক্যের ছাপ নেই।

একসময় বাংলার সুবাদারের ফৌজে মনসবদার ছিলো ভুজঙ্গ হালদার। খুব নামডাক ছিলো অসমসাহসী যোদ্ধা হিসেবে।

তারপর হঠাৎ কি হোলো কে জানে।—একদিন সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

আবার যখন নাম শোনা গেল অনেক বছর পরে, তখন সে এক সুপরিচিত দস্যুদলের সঞ্চালক।

তার এই পরিবর্তনের ইতিহাস ছিলো রহস্যময়। কেউ কিছু জানতো না, ভুজঙ্গ ঠাকুরকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করার সাহসও করতো না।

অনেকদিন পরে দেবীকান্ত একবার জিজ্ঞেস করেছিলো।

ওর প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলো ভুজঙ্গ হালদার।

"এই প্রসঙ্গ যদি অপ্রীতিকর হয়, তাহলে আমায় কিছু বলবেন না," বলেছিলো দেবীকান্ত, "আমি প্রশ্ন করে ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছি। আমাকে মার্জনা করবেন।"

"না, না, তুমি খুব সঙ্গত প্রশ্নই করেছো," উত্তর দিলো ভুজঙ্গ ঠাকুর, "ছিলাম শাহজাদার ফৌজে মনসবদার। যোগ্যতা ছিলো, সামর্থ্য ছিলো, অনেক দূর উঠতে পারতাম। জায়গির পেয়েছিলাম, উপাধিও পেয়ে যেতাম কিছুদিনের মধ্যে। ব্যক্তিগত সাফল্যের শেষ ধাপ পর্যন্ত যেতে পারতাম,—মোগল সরকারে একজন হিন্দু সৈনিক যতদূর যেতে পারে।"

"তারপর সব তুচ্ছ করে চলে গেলেন।"

"হ্যাঁ, সব আশা আকাঙ্খা কামনায় জলাঞ্জলি দিয়ে চলে এলাম মোগল ফৌজ ছেড়ে।"

"এমন একটা জীবন বেছে নিলেন, যেখানে জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই, ভবিষ্যতের কোনো নিশ্চয়তা নেই, আছে শুধু বিপদ আর ভয়," বললো দেবীকান্ত।

ভুজঙ্গ ঠাকুর হেসেছিলো দেবীকান্তর কথা শুনে, বলেছিলো, "আর আছে একটা অবাধ স্বাধীনতা যেটা মোগলের বান্দা হয়ে পাওয়া যায় না। এই জীবনের মধ্যে পেলাম একটা সার্থকতা। ওখানে কি পেতাম ?—শুধু অর্থ, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি। ব্যস, আর কিছু নয়। কারো জন্যে কিছু করার প্রবৃত্তিও ছিলো না, ক্ষমতাও ছিলো না। মন অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো। নিজের পদোন্নতি ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারতাম না। অর্থের বিনিময়ে নিজের বিবেক, নিজের চরিত্র, সব কিছুই ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছিলাম। প্রায় সব হিন্দু মনসবদারেরই ওই একই অবস্থা। আমার মতো সাধারণ মনসবদার থেকে শুরু করে অম্বরের মহারাজা জয় সিংহ, মাড়ওয়ারের মহারাজা জস্‌বন্ত সিংহ পর্যন্ত সবাই মোগল বাদশাহ্‌র ক্রীতদাস। রাজপুতদের মতো ক্ষত্রিয় বীরপুরুষদের পর্যন্ত কী অবস্থা হয়েছে দেখ। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচার, কোনো কিছুতেই পশ্চাদপদ নয়। জয়সিংহ দারার সঙ্গে কি রকম

বিশ্বাসঘাতকতা করলো, নিজের কানেই তো শুনতে পেলে।”

“হঠাৎ একদিন নিজের মনসব ত্যাগ করবার সংকল্প করলেন কেন?” দেবীকান্ত জিজ্ঞেস করলো।

একটু চুপ করে থেকে ভুজঙ্গ ঠাকুর উত্তর দিলো, “কারণ নিশ্চয়ই একটা ঘটেছিলো। সেটা খুব ব্যক্তিগত, কেউ না জানলেও ক্ষতি নেই। যাই হোক, আস্তে আস্তে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম যে, মোগল রাজত্বে সাধারণ রায়ত কারো কাছে কোনো সুবিচার প্রত্যাশা করতে পারে না। হিন্দু মুসলমান জমিদার আর রাজ-পুরুষেরা তো শাসকদের গোলাম। আমিও সুবা বাংলার নাজিমের গোলামি করেছি। কতো অবিচার অন্যায় হতে দেখেছি চোখের সামনে। মাঝে মাঝে যথাসাধ্য প্রতিবিধান করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমার ক্ষমতা তখন আর কতোটুকু, কিই বা করতে পারতাম। একদিন আর সহ্য হোলো না। রাজধানী ছেড়ে চলে এলাম। দেখলাম, এখন যা করছি, এছাড়া আর কোনো উপায় নেই—একে তোমরা দস্যুবৃত্তি বলো বা যাই বলো। দক্ষিণে মগ ও হার্মাদ, উত্তরে মোগল, এ দুয়ের মাঝখানে পড়ে সাধারণ রায়তের নাজেহাল অবস্থা। তাদের রক্ষা করতে হলে চাই অর্থ। লুণ্ঠন ছাড়া অর্থ সংগ্রহের আর কি উপায় আছে আজকালকার দিনে? মোগল শাসক যে ভাবে সাধারণ রায়তকে শোষণ করছে, তাও একরকম হৃদয়হীন লুণ্ঠন ছাড়া আর কি?”

“শুধু লুণ্ঠন আর ডাকাতি করলেই কি সব অন্যায়ের প্রতিকার করা যাবে?”

“না, ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সাধারণ রায়তদের একটা ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত করতে না পারলে সেটা সম্ভব নয়। আমরা যা করছি এতো শুধু একটা প্রারম্ভিক কাজ। আমরা শুধু একটা বিশাল রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে ছোটো ছোটো পরগণায় প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের শাসনশক্তির সঙ্গে ছোটো ছোটো দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হচ্ছি। এভাবেই

শুরু হয়। রাষ্ট্রের তাৎকালিক কানুনের পরিপন্থী বলে একে বলা হয় দস্যুবৃত্তি। জানিনা, পরে হয়তো এই দ্বন্দ্ব ব্যাপক ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ আকার ধারণ করবে। তখন একে বলা হবে বিদ্রোহ। আমি কতদূর পারবো জানিনা, ভারতবর্ষে আর কেউ এ অবস্থায় পারবে কিনা তাও জানিনা। মোগলেরা অত্যন্ত শক্তিশালী। তবে একজনের সংবাদ আমি পেয়েছি। মনে হচ্ছে, হয়তো সে পারবে। তোমরা তার নাম শোনো নি। আমি নানাসূত্রে তার কথা শুনেছি।"

"কে সে?" জিজ্ঞেস করলো দেবীকান্ত।

"দাক্ষিণাত্যে মোগল রাজ্যের প্রান্তদেশে বিজাপুর নামে একটি রাজ্য আছে। সেটাও মুসলমান রাজ্য। সেখানকার সুলতানের এক জায়গিরদার আছে। তার নাম শাহজী ভোঁসলে। তার পুত্র শিবাজী এরই মধ্যে মোগল ও বিজাপুরীদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছে। ওরা বলে শিবাজীর কার্যকলাপ একটা ব্যাপক দস্যুবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু আমি যদ্দুর শুনেছি, আমার মনে হয়, হয়তো শিবাজীর কর্মোদ্যমের মধ্যে আমাদের অনেক স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিতে পারে। তবে এখনো কি হবে বলা যায় না। শাহ্জাহানের পুত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে উঠেছে। এর ফলাফলের উপরই নির্ভর করছে ভারতবর্ষের ভবিষ্যত।"

"আমাদের জন্যে কি এটা একটা সুযোগ নয়?"

"হ্যাঁ, সুযোগ তো বটেই। তবে আমাদের লোকবল বেশী নয়। তাই ব্যাপকভাবে এখন কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারছি না। তবে উপস্থিত একটা ইচ্ছে আছে, যদি সম্ভব হয়—," বলতে বলতে ভুজঙ্গ ঠাকুর একটু থামলো।

"কি?" সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেছিলো দেবীকান্ত।

"ইচ্ছে আছে, যদি পারি দক্ষিণে জঙ্গল কেটে আবাদ করে একটা নতুন বসতি গড়ে তুলবো, যেখানে মোগলও আসবেনা, মগ হার্মাদও আসবে না। তবে আমার বয়েস হয়ে আসছে, আমি

তো একা পেরে উঠবো না। আমার একলার পক্ষে সম্ভবও নয়। আমার পরেও একাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, আমার এমন একজনের দরকার ছিলো। শুধু ওই টুকু গণ্ডির মধ্যে তো আমরা পরিতুষ্ট হয়ে থাকতে পারবো না, আমাদের বিস্তার লাভ করতে হবে। সে জন্যেই তো তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম আমার সঙ্গে। তোমাকে এত বছর ধরে সুশিক্ষিত করে তুলেছি, শুধু ওই একটি উদ্দেশ্যে।”

এই কথাগুলো হয়েছিলো বছর দেড়েক আগে,—ভুজঙ্গ ঠাকুরের সঙ্গে দেবীকান্তর যখন প্রথম দেখা হয় তার সাত আট বছর পরে। সেদিনই সে প্রথম আভাস পেয়েছিলো কোন উদ্দেশ্যে ভুজঙ্গ ঠাকুর তাকে এতদিন ধরে এভাবে তৈরী করেছে।

যেদিন রাত্রে ভুজঙ্গ ঠাকুরের সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়, সেদিন ভুজঙ্গ ঠাকুর গড় নাসিমপুরে গিয়েছিলো অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই।

গড় নাসিমপুরের পাশ দিয়ে গঙ্গা বেয়ে জঙ্গিপুর পরগণার রাজস্ব যাবে তার পরদিন সকালে। সেটা লুণ্ঠন করার যে আয়োজন হয়েছিলো, সেই উপলক্ষেই গড় নাসিমপুরের সন্নিকটস্থ জঙ্গলের মধ্যে ভুজঙ্গ ঠাকুরের উপস্থিতি।

পরদিন সকালে দিনের আলোয় গঙ্গার বুকে ফৌজদারের পাইক বরকন্দাজের পাহারা তুচ্ছ করে যে ডাকাতি করেছিলো ভুজঙ্গ হালদারের দল, একটি বজরায় ভুজঙ্গ হালদারের সঙ্গে বসে দূর থেকে সেটা পর্যবেক্ষণ করেছিলো কিশোর দেবীকান্ত।

একটা আশ্চর্য রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলো সেদিন।

চারদিকে শোরগোল, চিৎকার, বন্দুকের আওয়াজ। চোখের পলকে যেন লুণ্ঠন কার্য সমাধা করে বিদ্যুৎগতিতে দূরে নদীর বাঁকে উধাও হয়ে গেল ভুজঙ্গ ঠাকুরের দলের লোকের ছিপগুলো।

সেই দিকেই মন্থরগতিতে চলছিলো ভুজঙ্গ ঠাকুরের বজরা। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল মোগল নওয়ারার কয়েকটি ছিপ দ্রুত দাঁড় ফেলে বজরার দিকে এগিয়ে আসছে।

ছিপগুলো এসে বজরার গতি রোধ করলো। বজরায় দাঁড়িয়ে আছে ভোজপুরিয়া বন্দুকচি ও দক্ষিণী তীরন্দাজ। খোলা তলোয়ার হাতে কয়েকজন মুসলমান পিয়াদাও আছে তাদের সঙ্গে।

কিন্তু কে সন্দেহ করবে বজরার মধ্যে আছে সেই দস্যুদলের দলপতি, যারা কিছুক্ষণ আগে মোগলদের খাজনা লুঠ করেছে। ধনী জমিদারের বজরার মতো নানা আসবাব উপকরণে সুসজ্জিত ভুজঙ্গ ঠাকুরের বজরা। তার পোশাক জামা কাপড়ও বদলে গেছে। পরনের পট্টবস্ত্র, হাতের গলার রুদ্রাক্ষ আর নেই। সেকালের জমিদারদের মতো কাবা, চুড়িদার পাজামা আর কল্‌গি পরিশোভিত পাগ ভুজঙ্গ ঠাকুরের পরনে, অঙ্গে নানাবিধ রত্নাভরণ।

একজন মোগল মির-দহ্‌ বজরায় উঠে এসে খোঁজখবর করলো।

মাঝিরা বললে,—এটা রতনপুরের জমিদার নীলকমল সান্যালের বজরা।

মির-দহ্‌ উঁকি মেরে দেখে ভেতরে গালিচার উপর বসে জমিদার বাবু রুপোর তারের কাজ করা হাতির দাঁতের নলচেতে মহার্ঘ অম্বরী তামাক টানছে। পাশে বসে আছে মহার্ঘ বসনভূষণে সুসজ্জিত একটি সুদর্শন এগারো বারো বছরের কিশোর।

মির-দহ্‌ আর কিছু জিজ্ঞেস না করে বজরা থেকে নেমে নিজের ছিপে চলে গেল।

দেবীকান্তকে নিয়ে ভুজঙ্গ ঠাকুর ভেসে চলে গেল অনাগত ভবিষ্যতের উদ্দেশে।

সেদিন থেকেই শিক্ষাদীক্ষা শুরু হয়েছিলো ভুজঙ্গ ঠাকুরের কাছে।

গড় নাসিমপুরে দেবীকান্তর এদিকটা ছিলো সম্পূর্ণ অবহেলিত। ভুজঙ্গ ঠাকুর নিজে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আবার যুদ্ধবিদ্যায় ও অস্ত্রচালনায় সুশিক্ষিত।

সে বললো, "দেবীকান্ত, তুমি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, ভবিষ্যতে কোনো এক মহৎ কাজের দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করবো, এই সঙ্কল্প করেছি, সেভাবেই তোমাকে নিজেকে তৈরী করে নিতে হবে।"

দেবীকান্ত ভুজঙ্গ ঠাকুরে কাছে সংস্কৃত ও ফার্সি অধ্যয়ন করলো। বেদ উপনিষদ পুরাণ দর্শন নানা শাস্ত্রে সম্যক জ্ঞান আহরণ করলো। তা-ছাড়া রণনীতি, দণ্ডনীতি, শস্ত্রবিদ্যা, সম্ভ্রান্ত সমাজে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করার আদব-কায়দা, এসবও তাকে আয়ত্ত্ব করতে হোলো।

ভুজঙ্গ ঠাকুর নিজে সন্ন্যাসীর মতো থাকতো। ভোগ বিলাসে তার কোনো স্পৃহা ছিলো না। কিন্তু দেবীকান্তকে সে রাখতো রাজকীয় স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে। অথচ সে যাতে বিলাসী হয়ে না যায়, জীবনের কঠোরতা তাকে যাতে ম্রিয়মান না করে, এজন্যে ভুজঙ্গ ঠাকুরের সতর্কতার অন্ত ছিলো না। সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও তাকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পালন করতে হোতো।

"তুমি একদিন রাজ্য পরিচালনা করবে," ভুজঙ্গ ঠাকুর দেবীকান্তকে বলেছিলো একদিন, "তার শিক্ষা এখন থেকেই হওয়া দরকার।"

"আমি কিন্তু এত আরামের মধ্যে থাকতে চাইনা," উত্তর দিয়েছিলো দেবীকান্ত, "আপনাদের সঙ্গে আপনাদের মতোই

থাকতে চাই।"

একথা শুনে ভুজঙ্গ ঠাকুর হেসে বলেছিলো, "না দেবীকান্ত, হঠাৎ একদিন ঐশ্বর্যের মধ্যে গিয়ে পড়লে একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। তাই আমি চাই যে তুমি বৈভব ঐশ্বর্যের পরিবেশে থাকো এখন থেকেই, যাতে ভোগ বিলাসের প্রতি মোহ তোমার না থাকে। কিন্তু জীবনের কঠোরতার সঙ্গেও এখন থেকে পরিচিত হয়ে যাও, যাতে তুমি নির্বীর্য না হয়ে পড়ো। তোমার পরিবেশ হোক রাজরাজরার, তোমার মন হোক সন্ন্যাসীর।"

রাঢ় আর সুন্দরবন অঞ্চল জুড়ে ভুজঙ্গ ঠাকুরের বিরাট সংগঠন। পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় তার ঘাঁটি এক একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে। তার দলের বেশির ভাগ লোকেরই কোনো না কোনো একটা শান্তিময় বৃত্তি আছে,—কেউ চাষবাস ক্ষেতখামার করে, কেউ গোপালন করে, তাঁত চালায়, মাছ ধরে, খেয়া পারাপার করে, নানা জিনিসের বেসাতি করে নানা গঞ্জের হাটে। ফৌজদারের পাইক পিয়াদা সিলাহদারেরা টহল দিতে এলে দেখে, সরল গ্রাম্য লোকেরা যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত, চারদিকে একটা শান্ত পরিবেশ। মন্দিরে তরুণ পূজারী তার নিত্যকর্মে ব্যাপৃত। কিন্তু ডাক এলে এক মুহূর্তে এই নিরীহ শান্তিময় লোকগুলো সব কাজ ফেলে নিঃশব্দে মন্দিরে এসে জড়ো হয়। শৃঙ্খলার সঙ্গে গোপন স্থান থেকে বার করে আনে তলোয়ার, সড়কি, বল্লম, বন্দুক, তীর ধনুক। খাল বিলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে অসংখ্য ছিপ। রাতারাতি চলে যায় বহুদূর, আবার নিঃশব্দে ফিরে আসে শেষরাত্রে, ফিরে আসে তাদের গতানুগতিক দৈনন্দিন কর্মজীবনে। ফৌজদার কোতোয়ালেরা হদিশ পায় না, প্রেতপুরীর অধিবাসীদের মতো কোত্থেকে এরা আসে, আবার ভোজবাজির মতো কোথায় মিলিয়ে যায় আরব্ধ কাজের শেষে। তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও কেউ তাদের খোঁজ পায় না।

শুধু এ ধরনের দুঃসাহসিক কাজের মধ্যেই ভুজঙ্গ ঠাকুরের সংগঠনের সমস্ত উদ্যম পর্যবেশিত নয়। দক্ষিণের বিভিন্ন পল্লীগ্রামের মন্দিরগুলো ছিলো তাদের সেবাকেন্দ্র। তৎকালীন অরাজকতার দিনে প্রান্তীয় পল্লীবাসীদের সমস্ত বিপদআপদ থেকে তারাই রক্ষা করতো। তাদের ছোটোখাটো অভাব অভিযোগের প্রতিকার, তাদের নিরাপত্তা, সব কিছুর দায়িত্ব তারাই নিয়েছিলো। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তখন অনিশ্চিত, প্রান্তীয় শাসনব্যবস্থা বিকল হয়ে গেছে। প্রাদেশিক সুবেদার বাদশাহ্‌র সন্তান, সে আর তার প্রধান রাজপুরুষেরা জড়িয়ে পড়েছে সিংহাসনের উত্তরাধিকারের রাজনৈতিক সংঘর্ষে, দেশশাসনে মনোযোগ দেওয়ার সময় ও প্রবৃত্তি তাদের নেই। সর্বত্র মাৎস্যন্যায়ের করাল ছায়া, ছোটো বড়ো ভূস্বামী ও রাজপুরুষেরা যে যার স্বার্থসাধনে নিয়োজিত। এ অবস্থায় একদিকে যেরকম দেখা দিলো নানাধরনের সমাজদ্রোহিতা, অন্যদিকে গড়ে উঠলো তাদের ছোটোবড়ো প্রতিপক্ষ। দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে যখন অক্ষম শাসকের আইনকানুন দুর্বিনীত শোষকের হাতিয়ার হয়ে উঠলো, তখন এই সব ছোটোবড়ো দল আইনকানুনকে অস্বীকার ও অবহেলা করে গ্রহণ করলো অতি নিঃসহায় জনপদবাসীদের রক্ষকের দায়িত্ব।

তাদের সময় সব চাইতে বেশী শক্তিশালী সু-সংগঠিত ও সুপরিচিত ছিলো ভুজঙ্গ ঠাকুরের দল।

ভুজঙ্গ ঠাকুর দেবীকান্তকে সাধারণ ডাকাতি-লুণ্ঠনের মধ্যে নিয়ে যেতো না, বলতো, "এসব তোমার করতে হবে না। এর জন্যে অনেক লোক আছে। তোমার কাজ অন্য।"

দেবীকান্তকে সঙ্গে নিতো যখন কোথাও দরিদ্র গ্রামবাসীদের রক্ষা করার প্রয়োজন হোতো কোনো জমিদার কি রাজপুরুষের স্বৈরাচার থেকে, যখন কোনো প্রান্তীয় জনপদের প্রতিরক্ষার প্রয়োজন হোতো হার্মাদ কি মগ জলদস্যুর আক্রমণ থেকে। প্রথম

প্রথম তাকে শুধু সঙ্গে রাখতো, পরে পরে অনেক সময় নিজের তত্ত্বাবধানে তাকেই নেতৃত্ব করতে দিতো।

এমনি করে কেটে গেল এই কটি বছর।

এই কয়েক বছরে রাঢ় আর সুন্দরবন অঞ্চলের বহু জায়গা ঘুরেছে দেবীকান্ত, সমস্ত দেশকে দেখেছে, চিনেছে, সাধারণ লোকের নানা সুখত্বঃখের সঙ্গে জড়িত হয়ে তাদের ভালোবাসতে শিখেছে। মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে একটা আদর্শ, একটা স্বপ্ন। ভুজঙ্গ ঠাকুরের স্বপ্ন,—বন কেটে আবাদ করে একটা নতুন বসতি গড়ে তুলবে, যেখানে মোগল আসবে না, মগ আসবে না, হার্মাদ আসবে না। দেবীকান্তর স্বপ্ন আরো রঙীন, সে একরকম তুরাশা বললেই হয়।

যদি পারে কোনো একদিন এদেশ থেকে মোগলকে,—না, না, কাউকে বলার মতো কথা এটা নয়। স্বপ্ন সফল হবে কিনা কে জানে, কিন্তু স্বপ্ন দেখতে ক্ষতি কি। দক্ষিণে যে আবাদটি হবে সেটা বাড়তে বাড়তে যদি একটা ছোটো রাজত্বে পরিণত হয়, যদি আস্তে আস্তে নিজের আওতায় নিয়ে আসতে পারে দক্ষিণাঞ্চলকে, তারপর—

থাক আজ সন্ধ্যায় এসব ভাববার অবকাশ দেবীকান্তর নেই। আজ একটা অন্য দায়িত্ব তার সামনে।

খালের ওপারে গড় নাসিমপুর নিস্তব্ধ কালো ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেবীকান্ত সেদিকে তাকালো। ভাবলো,—কে জানতো যে, উত্তরার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

গত তু-তিন বছর ধনী জমিদারপুত্রের ছদ্মবেশে শুধু দক্ষিণ বাংলায় নয়, নানা কাজে তাকে ঢাকা, রাজমহল, পাটনা, এমন কি আগ্রা পর্যন্ত যেতে হয়েছে ভুজঙ্গ ঠাকুরের নির্দেশে। পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা। শাহ-ই-আলিজা দারা

শিকোর অন্যতম সমর্থক মনসবদার কিলিচ খাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়েছিলো তাকে। কিলিচ খাঁর পরিকল্পনা ছিলো দক্ষিণের ছোটো জমিদারদের সহায়তায় যদি শাহ্ শুজার রসদ সরবরাহ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করা যায়। তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার জন্যে একজন নির্ভরযোগ্য লোকের প্রয়োজন ছিলো দারা শিকোর। দেবীকান্ত আশ্বাস দিতে কার্পণ্য করেনি। কিন্তু দারা সমুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় সংবাদ শুনে আর আগ্রায় অপেক্ষা করেনি।

রাজমহলে পরিচয় হয়েছিলো শাহ শুজার বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি সয়িদ আলমের সঙ্গে। সে দেবীকান্তর আসল পরিচয় জানতে না পারলেও একথা জানতে পেরেছিলো 'যে রোসাঙের মগদের সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ আছে। তখন এমন একটা সময় যে, কার কি আসল পরিচয় তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, যে পরিচয় দেওয়া হয়, কোনো প্রশ্ন না করে মেনে নেওয়া হয় সেই পরিচয়, শুধু বিচার করে দেখা হয় কার থেকে কোন উপকার পাওয়া যাবে। সয়িদ আলম তাকে উপস্থিত করতে চেয়েছিলো শাহ শুজার কাছে, কিন্তু শাহজাদার অবসর ছিলোনা দক্ষিণের এক সাধারণ জমিদারপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার। কিন্তু রোসাঙের মগদের সঙ্গে যার যোগাযোগ আছে, সে লোককে কাজে লাগানোর সুযোগ ছাড়তে চাইলো না সয়িদ আলম। শাহ শুজার নির্দেশে সে দেবীকান্তকে পাঠাতে চাইলো চাটগাঁয়, মগ ও ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা করবার জন্যে। যদি যুদ্ধে বিপর্যয় হয়, আরাকানে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে আগের থেকেই। আলাপ আলোচনার মাঝখানেই শাহ শুজা রওনা হোলো পাটনার দিকে। দেবীকান্ত ফিরে এলো গৌড়ে ভুজঙ্গ ঠাকুরের কাছে।

দেবীকান্তর মনে কোনোদিন আক্ষেপ আসেনি পুরোনো দিনগুলির জন্যে। এই নতুন জীবনের এমন একটা নিজস্ব পরিপূর্ণতা

ছিলো যেটা তার মনকে দিয়েছিলো এক সার্থক ভবিষ্যতের আশ্বাস। পুরোনো দিনগুলো মনে করার অবকাশ তার ছিলো না।

ভুজঙ্গ ঠাকুর একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো, "দেবীকান্ত, গড় নাসিমপুরের রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তোমার পিতার মৃত্যুর পর প্রবঞ্চনা করে তোমাদের জমিদারি নিজের দখলে এনেছিলো। তুমি কি এখন তার প্রতিশোধ নিতে সক্ষম মনে করো নিজেকে ?"

কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলো দেবীকান্ত, তারপর একটু হেসে বললো, "হ্যাঁ, সক্ষম তো নিশ্চয়ই।"

"প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা কি আছে ?"

"কেন একথা জিজ্ঞেস করছেন ?" দেবীকান্ত প্রশ্ন করলো।

"যদি বলো, আমি তোমায় যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারি।"

দেবীকান্ত আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর উত্তর দিলো, "না।"

"কেন দেবীকান্ত ?"

"না, ভুজঙ্গ ঠাকুর, প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।"

"সে কি দেবীকান্ত ! সে তোমার সঙ্গে যে প্রবঞ্চনা করেছে, তার প্রতিশোধ নেবে না তুমি ?"

দেবীকান্ত আস্তে আস্তে বললো, "শুধু গড় নাসিমপুর নিয়ে কি করবো ভুজঙ্গ ঠাকুর ?"

একথা শুনে ভুজঙ্গ ঠাকুর হাসলো।

দেবীকান্ত বলে গেল, "গড় নাসিমপুর কি সুবর্ণগ্রামের জমিদারির জন্যে এখনকার জীবনের স্বাধীনতা আমি হারাতে রাজী নই।"

"তাহলে ? যে তোমায় তোমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, তাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবে ?"

দেবীকান্ত শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো, "না, ছেড়ে আমি দেবো না। তবে এখনো সময় আসেনি। অন্যায়ের প্রতিশোধ আমি অন্যায় ভাবে নিতে চাই না। যেদিন সুযোগ আসবে, সেদিন

তাঁকে আমার শক্তির পরিচয় দেবো, আমি যে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম, সেকথা বুঝিয়ে দেবো, কিন্তু প্রতিশোধ নেবো না।"

ভুজঙ্গ ঠাকুর মাথা নাড়লো আস্তে আস্তে। বললো, "হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের কথা।"

"আমার মনের কথা খুলে বলবো ভুজঙ্গ ঠাকুর?" বলে উঠলো দেবীকান্ত, "আমার বিরোধ রাজা ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে নয়। যেই শাসন-ব্যবস্থা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে আমায় বঞ্চনা করবার সুযোগ দিয়েছে, আমার বিরোধ তার সঙ্গে।"

একথা শুনে খুশী হয়েছিলো ভুজঙ্গ হালদার। বলেছিলো, "একথাই তোমার মুখে শুনতে চেয়েছিলাম, দেবীকান্ত। শক্তিমান তুমি হয়ছো, সেই সঙ্গে মহান হও, তা নইলে সমস্ত শক্তি আসুরিক বৃত্তিতেই সীমিত হয়ে থাকবে।"

মাঝে মাঝে পুরোনো দিনের কথা দেবীকান্তর মনে পড়তো, বিশেষ করে উত্তরার কথা।

এতদিনে উত্তরা নিশ্চয়ই বড়ো হয়েছে। হয়তো তার বিয়ে হয়ে গেছে।

তারও কি মনে পড়ে দেবীকান্তর কথা?

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হোতো, যদি দূর থেকে তাকে একবার দেখা যায়।

গড় নাসিমপুর ছেড়ে চলে আসবার পর প্রত্যেকদিনই মনে পড়তো উত্তরার কথা। সন্ধ্যের পর সব কাজ ভুলে সে উদাস হয়ে থাকতো, গড় নাসিমপুরে এসময়টা তাদের কাটতো একসঙ্গে। আকাশে তারা উঠতো। দুজনে ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তারা গুনতো একটি একটি করে। ঝির ঝির করে হাওয়া বইতো দক্ষিণ থেকে, এলোমেলো হয়ে যেতো উত্তরার ঝাঁকরা ঝাঁকরা চুল। মহলের ছাদ থেকে দেখা যেতো, অনেক দূরে মাঠের উপর দিয়ে

গরুর পাল তাড়িয়ে বাড়ি ফিরছে রাখাল ছেলেরা। চুপচাপ তাকিয়ে থাকতো দুজনে। দূর থেকে ভেসে আসতো মন্দিরের শাঁখ ও ঘণ্টার শব্দ। দুজনে ছাদ থেকে নেমে একসঙ্গে যেতো ঠাকুর দালানে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো আরতি শেষ হওয়া পর্যন্ত। তারপর প্রণাম করে প্রসাদী ফুল নিয়ে চলে আসতো মহলের ভিতর।

সেই কথাগুলো খুব মনে পড়তো দেবীকান্তর। কল্পনায় ভেসে চলে যেতো গড় নাসিমপুরের ভেতরের মহলের ছাদে। মনে হোতো যেন দেখতে পাচ্ছে উত্তরা একা দাঁড়িয়ে আছে ছাদের উপর। ঠিক তেমনি আঁধার নেমে আসছে চারদিকে, আকাশে তারা ফুটে উঠছে একটা একটা করে।

উত্তরা কি একলাই দাঁড়িয়ে তারা গুনছে? সেও কি ভাবছে, কোন অজানা শহরে নিরালায় বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে দেবীকান্ত!

তেমনি শঙ্খঘণ্টার আওয়াজ ভেসে আসছে, হয়তো মাঠের ওপারে গরুর পাল নিয়ে গাঁয়ের অভিমুখে ফিরে যাচ্ছে রাখাল ছেলেরা। দক্ষিণের হাওয়া অশান্ত হয়ে উঠছে থেকে থেকে।

উত্তরা কি তখন ঠাকুর প্রণাম করতে গেছে?

সে কি সত্যিই নিঃসঙ্গ? কিংবা হয়তো বাসুদেব হয়েছে তার খেলার সঙ্গী। বাসুদেবের কথা মনে পড়তেই কি রকম একটা দুর্বোধ্য জ্বালা ধরতো দেবীকান্তর গায়ে।

আজ যদি দেখা হয় বাসুদেবের সঙ্গে! সে কি সাহস করবে আগের মতো মারমুখো হয়ে তার দিকে তেড়ে আসতে? তাই যদি আসে তো একদিনে আগেকার সমস্ত দুর্ব্যবহারের শোধ তুলে নেবে দেবীকান্ত। ভাবতে ভাবতে তার হাসি পেত। বাসুদেব তো তারই বয়সী। এদ্দিনে সে নিশ্চয়ই আগের মতো অশান্ত নেই। এখন সে নিশ্চয়ই জমিদারির কাজকর্ম শিখেছে। হয়তো

কাজ করছে রাজা ইন্দ্রনারায়ণের কাছারিতে। হয়তো খুশীই হবে দেবীকান্তর সঙ্গে দেখা হলে।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণ কি খুশী হবে যদি দেবীকান্ত ফিরে যায়? নিশ্চয়ই খুশী হবে না, হয়তো ভাববে দেবীকান্ত একটা বোঝাপড়া করতে ফিরে এসেছে। রাজা ইন্দ্রনারায়ণের কথা মনে হতেই একটা বিতৃষ্ণায় বিরাগে দেবীকান্তর মন ভরে যেতো। রাজা ইন্দ্রনারায়ণ ও দেওয়ান শিবশঙ্কর সম্বন্ধে অনেক কথাই এই কবছরে তার কানে এসেছে। সেই সময়কার আর দশজন সাধারণ ভূস্বামীর মতোই আত্মপরায়ণ, মোগল সরকারের অনুগ্রহ আর বাৎসরিক খাজনা উসুল ছাড়া আর কিছুই ওরা বোঝে না, এবং নিজের স্বার্থে সাধারণ প্রজাদের উপর কোনোরকম অন্যায় করতেই বাধে না। তাদের সঙ্গে আর কখনো দেখা না হওয়াই ভালো।

শুধু দেখতে ইচ্ছে করতো উত্তরাকে।

কিন্তু দেখা যে কোনোদিন হবে, সে আশা দেবীকান্তর ছিলোনা। শুজার সৈন্যদের সঙ্গে মিরজুমলার মোগলবাহিনীর যুদ্ধ চলছে। এসব অঞ্চলে গঙ্গায় ও অন্যান্য খাল ও নদীতে মোগল নওয়ারার চলাচল খুব। নেহাত প্রয়োজন না হলে ভুজঙ্গ ঠাকুরের দল গঙ্গা নদী এড়িয়ে চলতো। গড় নাসিমপুরের ধারে কাছে যাওয়ার উপলক্ষ বড় একটা হোতো না।

আগে যে দু-একবার নাসিমপুরের জমিদারির সীমানার ধারে কাছে দেবীকান্ত যায় নি তা নয়। কিন্তু উত্তরার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না। সে রাজবাড়ির মেয়ে, গড়ের বাইরে আসার কথা তো নয়।

আর নাসিমপুরের গড়ের কাছাকাছি কোথাও পদার্পণ করার ইচ্ছে দেবীকান্তর একেবারেই ছিলো না। তার পক্ষে সেটা নিরাপদও নয়। মনে একটা বিরূপতাও ছিলো।

শুধু উত্তরার কথা সে মনে মনেই ভাবতো, কোনোদিন দেখা হওয়ার আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলো।

কিন্তু কে জানতো যে, আবার দেখা হবে!

হ্যাঁ, আবার দেখা হয়েছিলো উত্তরার সঙ্গে।

আগে কোনোদিন ভুজঙ্গ ঠাকুরকে বলেনি। কিন্তু কাল বলেছে।

বলতে হয়েছে তাকে। না বলে উপায় ছিলো না।

উত্তরার পরিচারিকা ললিতা তার কাছে সংকেত পাঠিয়ে লোক মারফত যোগাযোগ করেছে।

উত্তরা বিপন্না। সে আর তার পিতা রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী গড় নাসিমপুরে বন্দী।

দেওয়ান শিবশঙ্কর মজুমদারের পুত্র বাসুদেব তাদের বন্দী করে রেখেছে গড়ের ভিতর।

শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলো দেবীকান্ত। রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী জমিদার। তার ধনবল লোকবল কোনো কিছুরই অভাব নেই। তাকে বন্দী করা, তার নিজেরই গড়ের ভিতর, কি করে সম্ভব হোলো বাসুদেবের পক্ষে?

ক্রমে সমস্ত খবরই পেয়েছিলো দেবীকান্ত। কি করে দেওয়ান শিবশঙ্কর ও বাসুদেব রাজা ইন্দ্রনারায়ণের সমস্ত লোকজনকেই নিজের প্রভাবে আনতে পেরেছিলো, কি করে তাদের উপর নিরুপায় ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়েছিলো রাজা ইন্দ্রনারায়ণকে,—কিছুই তার জানতে বাকী ছিলো না।

এবং আরো জেনেছিলো যে মোগলদের সহায়তা পেয়েছিলো বাসুদেব। রাজা ইন্দ্রনারায়ণকে শাহ শুজার অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং অনুগত বলে জানতো সবাই। তাই বাসুদেব মিরজুমলার নিযুক্ত মালদহের ফৌজদার মহম্মদ কাসিম খাঁর সমর্থন পেয়েছে এই অন্যায় কাজে।

ভুজঙ্গ ঠাকুর একদিন দেবীকান্তকে জিজ্ঞেস করেছিলো, সে রাজা ইন্দ্রনারায়ণের উপর প্রতিশোধ নিতে চায় কিনা।

সে কথা আজ মনে পড়তে দেবীকান্তর হাসি পেলো। সে ভাবলো,—কে কার উপর প্রতিশোধ নেয়!

হয়তো বিধাতার বিচার এভাবেই আসে। যদি ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কোনোদিন ভাবতে পারতো যে, ভবিষ্যতে একদিন তার প্রতিও এমনি অবিচার হবে, হস্তান্তরিত হবে তার ধনসম্পদ ভূ-সম্পত্তি, সে নিজে কি করতে পারতো অনাথ দেবীকান্তের সঙ্গে সেই প্রবঞ্চনা?

দেবীকান্তের একটু দুঃখই হোলো ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর জন্যে।

না, ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর এই দুর্বিপাকে খুশী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার বিরোধ তো ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে নয়, তার বিরোধ সেই শাসনব্যবস্থার সঙ্গে, যার ফলে সম্ভব হয় এ ধরনের অবিচার, অন্যায়, বিশ্বাসঘাতকতা।

আজ তার মহৎ প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ এসেছে। ইন্দ্রনারায়ণের সহায়তায় যেতে হবে তাকে, উদ্ধার করতে হবে ইন্দ্রনায়ায়ণকে, উত্তরাকে। আজ এতদিনে সুযোগ এসেছে তার শক্তির পরিচয় দেওয়ার।

তার সঙ্গে একমত হয়েছিলো ভুজঙ্গ ঠাকুর। প্রবঞ্চনার প্রতিদান প্রবঞ্চনা নয়, অন্যায়ের বিচার নতুন অন্যায়ে নয়, একথাই সে চিরকাল শিখিয়ে এসেছে দেবীকান্তকে।

•

খালের ওপারে নিস্তব্ধ ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে গড় নাসিমপুর। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদ অস্ত গেছে এতক্ষণে। নিবিড় অন্ধকার আরো জমাট বেঁধে আসছে।

দেবীকান্ত তাকিয়ে দেখলো ছায়াময় গড় নাসিমপুরের দিকে।

ওখানে বন্দী হয়ে আছে উত্তরা আর ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

আর মহলের অন্য কোথাও বসে বিশ্রাম উপভোগ করছে দেওয়ান শিবশঙ্কর মজুমদার ও মালদহের ফৌজদার মহম্মদ কাসিম খাঁ।

বেশী লোকজন গড়ের মধ্যে নেই। ইন্দ্রনারায়ণের বরকন্দাজ-দের ধরে নিয়ে গেছে মোগলেরা। ওখানে আছে শুধু ভৃত্য ও পরিজনবর্গ, একদল মোগল চৌকি, আর দেওয়ান শিবশঙ্করের কিছু বিশ্বস্ত পাইক পিয়াদা।

ফৌজদার মহম্মদ কাসিম খাঁর সঙ্গে সঙ্গে আরো একজনের নাম দেবীকান্তর মনে পড়লো।

সে মহম্মদ কাসিম খাঁর কন্যা—সিতারা বানু।

আশ্চর্য সুন্দর তার চোখ,—দেবীকান্তের মনে পড়লো, একদা এক আকস্মিক পরিস্থিতিতে তার পরিচয় হয়েছিলো এই যবন কন্যার সঙ্গে।

আজ সেও আছে মহলের মধ্যে।

তার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সেই দিনটির কথা দেবীকান্তর স্মরণ-পথে উদিত হোলো, কিন্তু জোর করে সে মনোযোগ দিলো এখনকার সমস্যায়।

অতো ভাববার সময় নেই। মন উদ্বেগ ও আশঙ্কায় অশান্ত হয়ে উঠছে।

সময় বোধ হয় হয়ে এলো।

নির্দিষ্ট জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে ঘরের ভিতরের দুচারজনের ছায়া।

বেশ দূর এখান থেকে,—কিন্তু রাত্রির নিঃশব্দ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিভে যাবে জানলার আলো।

তারপর সঙ্কেত দেখা যাবে সেই জানলায়।

যাওয়ার সময় হবে তখন।

যেতেই হবে।—উত্তরা তাকে ডেকেছে, তার সাহায্য চেয়েছে। আজ রাত্রিতে একলা গড় নাসিমপুরে প্রবেশ করতে হবে দেবীকান্তকে,—অত্যন্ত গোপনে, নিদারুণ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে।

একটু একটু করে হাওয়া দিচ্ছে। মনে হোলো যেন মৃত্যুর মতো শীতল এই রাত্রি। দেবীকান্তর সমস্ত শরীর ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে আছে।

বিপদ জীবনে নতুন নয়, বিপদের সঙ্গেই তার দৈনন্দিন জীবনের মিতালি। কিন্তু আজ থেকে থেকে মনে আশঙ্কা জেগে উঠছে।

নিজের জন্যে ভাবনা নয়,—ভাবনা উত্তরার জন্যে।

ঃ তিন ঃ ঃ ভুজঙ্গ হালদার ঃ

কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির নিবিড় অন্ধকার আরো জমাট বেঁধে আসছে। এক নিঃসঙ্গ নিশাচর পাখির তীক্ষ্ণ ডাক ভেসে এলো অনেক দূর থেকে। ভাঁটার টান বাড়ছে নাসিমপুরের খালে। অশান্ত অস্পষ্ট কলরোলে কালো জল দ্রুত প্রবাহিত হচ্ছে গঙ্গার দিকে।

আলো জ্বলছে গড় নাসিমপুরের সেই নির্দিষ্ট জানলায়।

খালের পাড় ধরে নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে ভুজঙ্গ হালদার একটু থামলো। তাকিয়ে দেখলো সেই জানলার দিকে।

অন্য সবার হয়তো মনে হচ্ছিলো ভুজঙ্গ ঠাকুর ইতস্তত পদচারণা করে চারদিক পর্যবেক্ষণ করছে রণনীতিকুশল সেনাধ্যক্ষের মতো। কিন্তু আসলে তার মন আজ অত্যন্ত চঞ্চল। বাইরের থেকে দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই, ধীর, স্থির, প্রশান্ত। কিন্তু মনের ভিতর একটা আলোড়ন চলছে। সে কথা তার সঙ্গীরা কেউ জানলো না।

জীবনে বহু শঙ্কট, বহু অনিশ্চিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে ভুজঙ্গ হালদারকে, কিন্তু এতটা বিচলিতবোধ সে

কোনোদিনই করেনি। যদি দেবীকান্তর কোনো বিপদ হয়! যদি সে সফলকাম না হয়! যদি গড় নাসিমপুরের ভিতর প্রবেশ করে সে নিরাপদে ফিরে আসতে না পারে!

আজকের এত সব আশঙ্কা যদি সত্যি হয়, তাহলে তার এত দিনকার সমস্ত স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্খা সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনার সাফল্যের প্রায় সবটাই নির্ভর করছে দেবীকান্তর নিরাপত্তার উপর।

এতদিন সমস্ত কিছু চলে আসছিলো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী। কিন্তু আজকের পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিলোনা ভুজঙ্গ হালদার।

দেবীকান্তকে এই বিপদের মধ্যে আসতে দেওয়ার ইচ্ছে তার একটুও ছিলো না, যদি সম্ভব হোতো সে অনুমতি দিতো না তাকে। কিন্তু আজ আর মানা করবার উপায়ও ছিলো না। দেবীকান্ত এসে যখন তাকে সব জানালো, সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো কিছুক্ষণ। ইষ্টদেবীকে স্মরণ করে মনে মনে বলেছিলো,—মা, এ কি পরীক্ষায় ফেললে আমায়।

কিন্তু মনস্থির করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও তার বিলম্ব হয়নি। চিরকাল সে দেবীকান্তকে শিক্ষা দিয়ে এসেছে শরণাগতকে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, বীর্যবানের জীবনের মূলমন্ত্র। আজ যখন এক বিপন্না নারী সহায়তা চেয়েছে, তখন কি বলে তাকে নিষেধ করবে? ভুজঙ্গ ঠাকুরের পরমারাধ্যা ইষ্টদেবী স্বয়ং নারী, আজ এক অপরিচিতা নারীর পরিত্রাণের আমন্ত্রণে সে যেন তাঁরই আহ্বান শুনতে পেলো। এর জন্যে যদি তার প্রাণাধিক এবং পুত্রসম দেবীকান্তকে বিসর্জন দিতে হয়, তাহলেও তার পশ্চাদপদ হবার উপায় নেই।

দেবীকান্তকে সে সহজ মনেই অনুমতি দিয়েছে, সতর্ক করে দিয়েছে, বার বার যথা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছে। মনে মনে স্থির করেছে বেশীক্ষণ তাকে একলা থাকতে দেবে না গড়ের ভিতর,

তিনদণ্ডকাল সময়ের মধ্যে যদি দেবীকান্ত বেরিয়ে না আসে গড় থেকে, তাকে উদ্ধার করতে সে সদলবলে হানা দেবে গড় নাসিমপুরে,—তাতে যতো বিপদই থাকুকনা কেন।

সঙ্গে বেশী লোক সে আনে নি গঙ্গার ধারে। কিন্তু দলের বেশির ভাগ লোকই অপেক্ষা করছে একটু দূরে দূরে। সঙ্কেত পেলে সবাই চলে আসবে। শুধু আসবে না, গঙ্গার ধারে যারা ছিপ নিয়ে অপেক্ষা করছে। দেবীকান্ত উত্তরা ও রাজা ইন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে, কিংবা একলা যদি বেরিয়ে আসতে পারে, তাকে অনতিবিলম্বে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তাদের।

চারদিকে অন্ধকার। অসংখ্য তারার আলোয় সে অন্ধকার যেন তরঙ্গময় হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে।

খালের পাড় থেকে সরে এসে ভুজঙ্গ ঠাকুর একটি গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ালো।

অনেক দূরে শেয়াল ডাকছে।

ভুজঙ্গ হালদার অকুতোভয় দুঃসাহসী তন্ত্রসাধক, বহু অমাবস্যা-রজনী ভয়াবহ শ্মশানে একাকী কাটিয়েছে। কিন্তু আজ ওই সাধারণ শৃগালরব থেকে থেকে শিহরণ আনছে তার মনের ভিতর।

মনে মনে একটু জপ করে নিলো ভুজঙ্গ ঠাকুর।

বৃক্ষশাখার অন্তরাল থেকে একটি প্যাঁচা ডেকে উঠলো। ভুজঙ্গ ঠাকুর তাকিয়ে দেখলো উপর দিকে। তারপর গলার রুদ্রাক্ষের মালা হাতে চেপে ধরে গাছতলা থেকে সরে গিয়ে একটু ফাঁকায় এসে দাঁড়ালো।

দেবীকান্ত তাকালো তার দিকে। তাকালো অন্য দুজনও। কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই। রাত্রির স্তব্ধতা যেন তাদের মনও আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সবাই নিঃশব্দে বসে আছে একটি সঙ্কেতের প্রতীক্ষায়।

ভুজঙ্গ ঠাকুরের মুখটা ঘেমে উঠছে বার বার,—এই খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়েও। বসনের প্রান্তভাগ দিয়ে মুছে নিলো কপালটা। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখলো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে।

চারদিকে অন্ধকার, শুধু নিঝুম অন্ধকার।

সেই অন্ধকারে ছায়ার মধ্যে মিশে আছে অন্য তিনজন। কারো পক্ষে তাদের অবস্থান উপলব্ধি করা অসম্ভব। কিন্তু ভুজঙ্গ ঠাকুর বহুদিনকার অভ্যাসে দেখতে পায় অন্ধকারের ভিতর দিয়েও। পরিষ্কার বুঝতে পারলো, কে কোথায় কি ভাবে বসে আছে।

একটু এগিয়ে এসে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো। তারপর নিচু গলায় ডাকলো, "কালীকৃষ্ণ!"

"হ্যাঁ, ঠাকুর।"

"গাছতলায় পিপঁড়ে নেই তো?"

দেবীকান্তর একটু হাসি পেলো ভুজঙ্গ ঠাকুরের প্রশ্ন শুনে। কতোবার কতোরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে দুজনে খোলা হাতিয়ার নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, আজ কতো রকম অনিশ্চিত সম্ভাবনা তাদের সামনে,—কোনোদিন কোনোরকম বিচলিত ভাব দেখায়নি ভুজঙ্গ ঠাকুর, আজও কোনোরকম চিত্ত চাঞ্চল্যের আভাস নেই, তবু কিনা মনে হোলো, কালীকৃষ্ণ যেখানে বসেছে, সেই গাছতলায় পিপঁড়ে নেই তো। অসীম শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় মন দুলে উঠলো, এই একটি প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারলো, কতো স্নেহ, কতো ভাবনা ভুজঙ্গ ঠাকুরের মনে।

কালীকৃষ্ণ উত্তর দিলো, "আমি খুব আরামে বসে আছি। আপনিও একটু বিশ্রাম করুন।"

"আজ নয় কালীকৃষ্ণ।"

ভুজঙ্গ ঠাকুর সরে গেল সেখান থেকে। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে দেবীকান্ত। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে

তার দিকে তাকিয়ে দেখলো, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলো না। সরে অন্য দিকে চলে গেল।

দেবীকান্ত নিশ্চিন্ত, নিশ্চল। তার এই সংযম ভুজঙ্গ ঠাকুরের খুব ভালো লাগে। কোনো গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে দেবীকান্ত যেন ইস্পাতের মতো কঠিন ও শীতল হয়ে যায়। কিন্তু তার কঠিন আবরণের ভিতর দিয়ে তার মন যেন পরিষ্কার দেখতে পেলো ভুজঙ্গ ঠাকুর। তাকে সে যে নিজের হাতে গড়ে তুলেছে। তার প্রত্যেকটি ভঙ্গি থেকে তার মনের ভাব আঁচ করতে পারে।

আজ যেন মনে হোলো দেবীকান্তর মনেও ঝড় উঠেছে।

খুবই স্বাভাবিক। অন্য কোনো পরিস্থিতিতে দেবীকান্তর ব্যক্তিগত কোনো ভাবনা থাকতো না। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি স্বতন্ত্র। তার প্রিয়তমা শৈশবসঙ্গিনী, তার প্রণয়াস্পদা আজ বিপদাপন্না। তার মনের উত্তেজনা উপলব্ধি করতে পারলো ভুজঙ্গ ঠাকুর।

তার মন প্রথমটা সায় দেয়নি। যাকে সে নিজের হাতে মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে, তার জীবনে থাকবে একটি নারী! অনন্য-চিত্ত হয়ে যার নিজের ব্রতে আত্মনিয়োগ করার কথা, আজ তাকে ভাবনাগ্রস্ত হতে হবে এক সাধারণ নারীর জন্যে? তারপর মনে হয়েছিলো, একি চিত্ত বিকলন তন্ত্রসাধক ভুজঙ্গ ঠাকুরের? বিশ্বজননী থেকে আলাদা করে দেখছে কাকে! জীবনে এরকম ঝড় না এলে সেই পরমা মাতৃস্বরূপিনীর অন্তরতম রূপের উপলব্ধি কি করে করবে দেবীকান্ত?

সঙ্গে সঙ্গে মনের সমস্ত ভালোবাসা একটা বিপুল আশীর্বাদ হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে দেবীকান্তের চারদিকে। ভেবেছিলো, আসুক জীবনে ভাগ্যের এরকম দ্বন্দ্ব-আহ্বান। তারই মধ্যে দিয়ে হোক সার্থকতার উপলব্ধি।

এরকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তো যেতে হয়েছে ভুজঙ্গ

হালদারকেও। তা নইলে তো তার জীবনেও সার্থকতার পরিতৃপ্তি আসতো না।

ভুজঙ্গ হালদার একদিন তো নিজেও ভালোবাসতো একজনকে।

অনেক দিনের কথা,—। অনেক পুরোনো কথা—।

আজ গড় নাসিমপুরের খালের এপারে দাঁড়িয়ে সে সব অনেক কিছু একটি ছুটি করে তার মনে পড়লো। তাকালো আকাশের দিকে। মনে হোলো, আকাশের প্রত্যেকটি তারা যেন তার জীবনের এক একটি দিন।

আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা। তখন শাহজাহান সবে বাদশাহ্ হয়ে বসেছে আগ্রার তখ্‌ত্‌এ।

ভুজঙ্গ হালদার তখন ছিলো বিহারের নাইব-নাজিমের ফৌজে একজন সাধারণ মনসবদার।

ফৌজে রাজপুত ছাড়া অন্য হিন্দু মনসবদার খুবই কম। তাই ভুজঙ্গ হালদারের খাতির ছিলো খুব। তার বন্ধুবাৎসল্য, পরোপকারিতা ও অসম সাহসের জন্যে তাকে সবাই ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করতো।

কিন্তু যতোই তার উন্নতি হতে লাগলো, ততোই যেন তার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হতে লাগলো অন্যান্য মোগল আহাদী ও মনসবদারেরা। কোনো নতুন দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত হলেই চারদিক থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠতো, নাইব নাজিমের কাছে গিয়ে নালিশ জানাতো মোগলেরা। হিন্দুকে কি করে এত দায়িত্ব দেওয়া যায়! হিন্দু করবে মুন্সির কাজ, অন্যান্য আমিল্‌-এর কাজ। কিন্তু ফৌজে

পদোন্নতি হবে হিন্দু মনসবদারের! হ্যাঁ, রাজপুতদের কথা আলাদা, তাদের সঙ্গে আগ্রার বাদশাহ্‌দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক। কিন্তু অন্য হিন্দুদের কি বিশ্বাস করা যায়?

পদে পদে খুঁটিনাটি ব্যাপারে এভাবে অপদস্থ হতে হয়েছে মনসবদার ভুজঙ্গ হালদারকে।

চোখের সামনে দেখেছে কতোরকম অন্যায় অবিচার—।

মকবুল খাঁর সঙ্গে দাম নিয়ে কথাকাটাকাটি হয়েছিলো চক্‌-বাজারের এক হিন্দু দোকানদারের। মকবুল খাঁ ক্রোধে সংযম হারিয়ে একটা কুৎসিত কটূক্তি করলো তার গর্ভধারিণীর উদ্দেশ্যে। সে রাগ সামলাতে না পেরে মকবুল খাঁকে একটা চড় মেরে বসলো। হিন্দু দোকানদারের এই ঔদ্ধত্যের অপরাধে তলোয়ার দিয়ে তার হাত কেটে ফেলেছিলো মকবুল খাঁর ভাই। তাকে হাজির করা হয়েছিলো কাজির আদালতে, কিন্তু বিশেষ কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি, শুধু দোকানদারের ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু অর্থ জরিমানা করা হয়েছিলো।

তাকে ভুজঙ্গ হালদার বলেছিলো,—খাঁ সাহাব, আমি ওখানে উপস্থিত থাকলে তোমার শাস্তি অন্যরকম হোতো।

একথা শুনে মাহমুদ খাঁ অসি নিষ্কাশিত করলো। কিন্তু অন্য মনসবদারেরা মাঝে পড়ে থামিয়ে দিলো তাদের দুজনকে। নাইব-নাজিমের জিলওদারের কানে একথা উঠতে ভুজঙ্গ হালদারকে ডাকিয়ে এনে ভর্ৎসনা করলো।

পরে ভুজঙ্গ হালদার সেই হস্তবিহীন দোকানদারকে পাটনার পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে দেখেছে।

সাহিবগঞ্জের এক হিন্দু ধোবানীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে-ছিলো এক মোগল আহাদী। তার দিক থেকে সাড়া না পেয়ে সেই আহাদী একটু জবরদস্তি প্রকাশের উপক্রম করলো। ভয় পেয়ে ছুটে পালালো সেই হিন্দু ধোবানী। মোগল আহাদীও তাড়া

করলো পেছন পেছন, আর এমন সময় পড়ে গেল ভুজঙ্গ হালদারের সামনে।

সেই ধোবানীর ইজ্জত রক্ষা করবার জন্যে ভুজঙ্গ হালদারকে তলোয়ার বার করে রুখে দাঁড়াতে হয়েছিলো সেদিন। সে নাম করা যোদ্ধা। তার মোকাবিলা করবার সাহস সেই আহাদীর হোলো না। সে চুপচাপ সরে পড়লো সেখান থেকে।

এই ব্যাপারে শহরের কোতোয়াল মোগল আহাদীর পক্ষ নিয়ে ভর্ৎসনা করতে এলো ভুজঙ্গ হালদারকে। শাহী ফৌজের লোকদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করা কানুনবিরোধী।

কোতোয়ালের সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়ে গেল। ভুজঙ্গ হালদার নালিশ করলো নাইব-নাজিমের দরবারে। ভুজঙ্গ হালদার নাইব নাজিমের প্রিয়পাত্র। তবু নাইব-নাজিম কোতোয়ালকে কিছু বললো না। কৌশলে এড়িয়ে গেল ব্যাপারটা।

এরকম আরো কতো খুঁটিনাটি অবিচার দেখেছে ভুজঙ্গ হালদার।

ইনায়েত-উল্লা সিদ্দিকি তিন বছর রাজস্ব বাকী ফেলেছিলো। তাকে ডেকে দিওয়ান মৃদু ভর্ৎসনা করলো। ইনায়েত-উল্লা এক বছরের রাজস্বের পরিমান অর্থ গোপনে উৎকোচ দিলো দিওয়ানকে। তারপর আর্জি পেশ করলো নাইব-নাজিমের দরবারে। নাইব নাজিমের সুপারিস নিয়ে সে আর্জি চলে গেল আগ্রায় বাদশাহ্‌র কাছে। তিন বছরের খাজনা মকুব করে দেওয়া হোলো।

সেই ইনায়েত-উল্লা সিদ্দিকির জমিতে রায়ত ছিলো আলি মনসুর। সে ছিলো সঙ্গতিপন্ন লোক। কিন্তু সেবছর সেই অঞ্চলে অজন্মা হয়েছিলো বলে সে খাজনা দিতে ছ-মাস দেরি করেছিলো। ইনায়েত উল্লা সিদ্দিকি কাজির কাছে নালিশ করলো। ছ-মাস কয়েদ থাকতে হোলো আলি মনসুরকে। তার বৌ গয়নাপত্র সোনাদানা বেচে খাজনা মিটিয়ে নাইব-নাজিমকে নজরানা দিয়ে তবে স্বামীর মুক্তির পরোয়ানা পায়।

পাটনায় নাইব-দিওয়ান ছিলো আগ্রার লালা ধরমচাঁদের ছেলে কিসনচন্দ। অল্প বয়েস তার, এই বয়েসে এরকম গুরুত্বপূর্ণ পদ পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু লালা ধরমচাঁদ উজীর আসফ খাঁর পরমমিত্র। উজীর আসফ খাঁ মমতাজমহলের পিতা, নুরজাহানের ভ্রাতা। যে কোনো সময় যে কোনো প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করে লালা ধরমচাঁদের কাছে। পারিবারিক কারণে লালা ধরমচাঁদ কনিষ্ঠ পুত্র কিসনচন্দকে পাঠিয়ে দিতে চাইলো আগ্রার বাইরে। আসফ খাঁর তদ্বিরে সে হয়ে গেল পাটনার নাইব-দিওয়ান।

আর তারই দফ্‌তরে অভিজ্ঞ মুন্সি ছিলো গোপালদাসজী। অনেক বয়েস তার, টোডরমলজীর আমলের লোক।

একদিন সামান্য ভুলের অজুহাতে নাইব-দিওয়ান কিসনচন্দ গোপালদাসজীকে একটা চড় মেরে বসলো। কেউ কিছু বললো না নাইব-দিওয়ানকে। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে মমতাজমহলের পিতা উজীর আসফ খাঁর মিত্র লালা ধরমচাঁদের কনিষ্ঠপুত্রকে কিছু বলবে।

ভুজঙ্গ হালদার শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো। বলেছিলো,—আচ্ছা, একদিন সুযোগ হোক, আমি নাইব-দিওয়ানকে বুঝিয়ে দেবো যে আমি কি রকম বাপের বাচ্চা। তারপর দেখি আমাকে কে কি বলে, সে খুদ উজীরই হোক আর যেই হোক।

কথাটা উঠেছিলো নাইব-নাজিমের কানে। ভুজঙ্গ হালদারকে নিভৃতে ডাকিয়ে নিয়ে বলেছিলো—তুমি আমায় কথা দাও যে তুমি নিজের থেকে কারো সঙ্গে বিবাদ বাধাবে না। আমি তোমার হিতৈষী, তোমাকে আমি অত্যন্ত প্রীতির চোখে দেখি। আমার একথা তোমার রাখতেই হবে।

নাইব-নাজিমের অনুরোধে ভুজঙ্গ হালদারকে চুপ করে থাকতে হয়েছিলো।

সামান্য একটা ছুতো উপলক্ষ করে বাঁকিপুরের ফৌজদার লোক

লাগিয়ে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলো বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের একটা ছোটো মঠ। ভুজঙ্গ হালদার নিজে গিয়ে ধরে পড়েছিলো নাইব-নাজিমকে। কিছু করতে পারে নি। অন্যান্য রাজপুত মনসবদারদের সহায়তা যদি পেতো তাহলে হয়তো চাপ দেওয়া যেতো নাইব-নাজিমের উপর। কিন্তু ওরা নিজেদের আত্মকলহে এত ব্যস্ত যে, এসব দিকে মন দেওয়ার ফুরসত নেই।

বছরের পর বছর চাপা বিদ্বেষ বৈরিতা চলছিলো এসব ছোটো-খাটো সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

তারপর একদিন এলো একটা বড়ো উপলক্ষ।

কাজিপুরের জমিদার ছিলো বিষ্ণুরাম ত্রিবেদী। তার বাপ-পিতামহ মোগল সরকারের বিশ্বস্ত ভূস্বামী সেই আকবর বাদশাহ্‌র আমল থেকে। এজন্যে নাইব-নাজিমের দরবারে বিষ্ণুরাম ত্রিবেদীর খাতির খুব।

তার একমাত্র কন্যা সুভদ্রার রূপের খুব নামডাক। বিহারের অভিজাত ব্রাহ্মণ জমিদারেরা সুভদ্রাকে নিজেদের পরিবারে কুলবধূ করে নিয়ে আসবার জন্যে লালায়িত।

নাইব-নাজিমের কোনো একটা দরকারে কাজিপুরে গিয়েছিলো মনসবদার মকবুল খাঁ। একদিন ঘোড়া হাঁকিয়ে যাচ্ছিলো পশুপতিনাথজীর মন্দিরের পাশ দিয়ে। সুভদ্রা সেখানে এসেছিলো পূজো দিতে। মকবুল খাঁ দূর থেকে দেখতে পেলো তাকে। নিজের কাজে যাওয়া আর হোলো না। ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো যতক্ষণ না সুভদ্রা পূজো শেষ করে পালকিতে এসে ওঠে।

আশপাশের লোকেদের কাছে খবর নিলো মকবুল খাঁ। জানতে পেলো এই অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী বিষ্ণুরাম ত্রিবেদীর কন্যা।

মকবুল প্রথম দর্শনেই তার প্রতি আসক্ত হয়েছিলো। সুভদ্রা প্রত্যেকদিন আসতো পশুপতিনাথজীর মন্দিরে পূজো দিতে।

মকবুল খাঁ ঠিক সেই সময় আসতে শুরু করলো মন্দিরের সামনে। সুভদ্রা টের পেয়ে মন্দিরে পূজো দিতে আসা বন্ধ করলো। তিনচার দিন অপেক্ষা করে তাকে দেখতে না পেয়ে মকবুল শেষ পর্যন্ত চলে এলো বিষ্ণুরাম ত্রিবেদীর কাছে। তাদের মধ্যে নিভৃতে কি কথা হোলো কে জানে। দেখা গেল, বিষ্ণুরাম ত্রিবেদীর ছেলেরা মকবুল খাঁকে তাড়া করে তাদের জমিদারির সীমানা পার করে দিয়ে এলো।

দরবারে মকবুল খাঁর প্রভাব খুব। তারপর থেকেই দেখা গেল নানারকম ভাবে উত্যক্ত করা হতে লাগলো বিষ্ণুরাম ত্রিবেদীকে। খাজনার হিসেব নিয়ে গোলমাল বাধালো নাইব-নাজিমের দেওয়ান। ছোটো খাটো ঘটনা উপলক্ষ করে কাজি-পুরের কোতোয়াল কাজিপুরের রায়তদের উপর হামলা করতে শুরু করলো।

নানা রকম কথা এলো ভুজঙ্গ হালদারের কানে। সে বুঝতে পারলো যে সুভদ্রা কাজিপুরে নিরাপদ নয়। বিষ্ণুরামকে অপদস্থ করবার জন্যে একটা মতলব আঁটছে মকবুল খাঁর অনুচরেরা।

বিষ্ণুরাম ত্রিবেদী ও তার ছেলেদের সঙ্গে ভুজঙ্গ হালদারের সখ্যতা ছিলো। সে সোজাসুজি উপস্থিত হোলো বিষ্ণুরাম ত্রিবেদীর কাছে, সহজ ভাষায় তার কাছে পাড়লো কন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব। ভুজঙ্গ হালদার একজন প্রতিপত্তিশালী মনসবদার। তার সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ হলে গোলমাল সৃষ্টি করতে সাহস করবে না মকবুল খাঁর অনুচরেরা।

সে নিশ্চিত ছিলো যে তার প্রস্তাব বিষ্ণুরাম ত্রিবেদী প্রত্যাখ্যান করবে না। কিন্তু সে বিষ্ণুরামের উত্তর শুনে স্তম্ভিত হোলো।

বিপদ আসুক বা যাই আসুক,—পরিষ্কার বলে দিলো বিষ্ণুরাম ত্রিবেদী,—বাংলা দেশের ব্রাহ্মণকে সে কন্যাদান করতে পারেনা।

দুনিয়াকে চিনতে আমার অনেক বাকী আছে,—ভাবলো ভুজঙ্গ

হালদার। সে চলে আসছিলো কাজিপুর থেকে। কিন্তু বিষ্ণুরাম ত্রিবেদীর কন্যা সুভদ্রা নিজের বিশ্বস্ত ধাত্রীকে পাঠিয়ে ভুজঙ্গ হালদারকে গোপনে ডেকে নিলো মহলের মধ্যে।

সুভদ্রার কথাগুলো আজো ভুজঙ্গ হালদারের মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি হয়ে ফেরে।

—আমি জানতে পেরেছি আপনি কেন আমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। আমার পিতার যতোই অসম্মতি থাক, আমার সম্মতি আছে। আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন আপনার সঙ্গে ?

ভুজঙ্গ হালদার বিস্মিত হয়ে তাকিয়েছিলো সুভদ্রার দিকে। মহলের ঘরগুলো ছোটো ছোটো, অত্যন্ত নিচু, একপাশে ছোটো দরজা, একটিও জানলা নেই। দিনের বেলাও আলো আসে খুব কম। সেই আবছায়া আধো অন্ধকারে সুভদ্রার চোখ দুটো অঙ্গারের মতো জ্বলছিলো।

—আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন আপনার সঙ্গে ?

ভুজঙ্গ হালদার জিজ্ঞেস করলো,—তোমার পিতা আমাকে পাত্র হিসেবে বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। সে কথা জেনেও তুমি আসবে আমার সঙ্গে ?

—আমার পিতা যাই মনে করুন, আমি যে মুহূর্তে জেনেছি আপনি এখানে এসেছেন আমাকে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাতে, সে মুহূর্তে আমার মন আপনাকে বরণ করে নিয়েছে। এত হিন্দু জমিদার জায়গিরদার মনসবদার আছে, কই আর তো কেউ আমাদের এই বিপদে আমাদের হয়ে একটি কথা বলছেন না।

ভুজঙ্গ হালদার নানা কথা ভাবছিলো।

সুভদ্রা বলে গেল,—আমার সামনে এখন দুটি পথ খোলা আছে। হয় আমাকে জহর খেতে হবে, নয়তো আপনার সঙ্গে চলে যেতে হবে। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমার আর কোনো উপায়

নেই জহর খাওয়া ছাড়া। এমন সময় বিধাতার অভয়বাণী হয়ে আপনি এসে উপস্থিত হলেন। এখন আপনি জানেন আর ঈশ্বর জানে।

—জহর খাওয়ার কথাও ভাবতে হচ্ছে তোমায়? কেন?

—আপনি জানেন না। আমার পিতা ভেঙে পড়েছেন।

—সে কি!

—হ্যাঁ। দিওয়ান সাহেবের নানা রকম চাপ উনি আর সহ্য করতে পারছেন না। কি উদ্দেশ্যে এসব করা হচ্ছে সে তো আমাদের কারো অজানা নেই।

—উনি কি করবেন স্থির করেছেন?

সুভদ্রা মুখ ফিরিয়ে নিলো, হয়তো উদগত অশ্রু সংবরণ করতে। তারপর উত্তর দিলো,—মকবুল খাঁর সঙ্গে ওঁর একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল।

—বোঝাপড়া হয়ে গেছে! কি বোঝাপড়া?

—শুনলে আপনার মাথা নিচু হয়ে যাবে লজ্জায়। সামনের অমাবস্যার আগে আমার পিতা পাটনা যাবেন কোনো একটা উপলক্ষ করে। ভায়েরাও এখানে থাকবে না। তারপর একদল ডাকাত নিশুতি রাতে মহলের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকবে। ওরা হরণ করে নিয়ে যাবে আমায়। পথে মকবুল খাঁ এবং তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে এই ডাকাতদের। মকবুল খাঁ আমাকে উদ্ধার করবে তাদের হাত থেকে। পাটনায় খবর যাবে। আমার পিতা তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। মকবুল খাঁ ওঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে অনুরোধ করবে আমাকে পুনরায় গ্রহণ করতে। জানাবে যে, মকবুল খাঁর হারেমে আমাকে খুব সম্মানের সঙ্গেই রাখা হয়েছিলো, আমার কোনো বেইজ্জতি হয় নি।

—বুঝলাম,—ভুজঙ্গ হালদার বললো। রাগে ওর শরীর জ্বলতে শুরু করেছে তখন।—তোমার পিতা সমাজচ্যুতির ভয়ে তোমাকে

গ্রহণ করতে পারবেন না। তখন মকবুল তোমাকে সসম্মানে বিবাহ করবে। এই তো?

দাঁতে দাঁত ঘসে সুভদ্রা উত্তর দিলো,—হ্যাঁ ঠিক তাই। এবং এর কিছুদিন পরে সুবা বাংলার নাজিম আমার পিতাকে রাজা উপাধি দেওয়ার জন্যে সুপারিস করবেন আগ্রায় বাদশাহ্‌র কাছে।

—না সুভদ্রা, এ আমি হতে দেবো না।

—মকবুল আমায় চেনে না,—সুভদ্রা বলে গেল,—যেদিন আমার পিতা পাটনা রওনা হবেন, সেদিনই আমি জহর খাবো।

—তোমায় জহর খেতে হবে না সুভদ্রা। তুমি যাবে আমার সঙ্গে। কন্যাহরণ যদি করতেই হয়, তবে অন্যে কেন, আমিই করবো।

—আমি প্রস্তুত।

—বেশ এখনই চলো আমার সঙ্গে। যতোক্ষণ আমার হাতে তলোয়ার আছে, দেখি কে আমাকে আটকায়।

—না, না, অতো ঝুঁকি আপনাকে আমি নিতে দেবো না,—সুভদ্রা ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলো,—চারদিকে অনেক পাইক পিয়াদা আছে। আপনি একেবারে একা।

—প্রাণের ভয় আমি করি না সুভদ্রা।

—আপনি ভয় না করতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে এখন আপনার প্রাণের দাম অনেক।

—তাহলে অন্য কি উপায় করা যায় বলো।

—উপায় আমি করবো।

—বেশ, তুমিই বলো তাহলে।

—আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরে পশুপতিনাথজীর মন্দিরের পেছনে বড়ো পিপুল গাছটির নিচে আপনি অপেক্ষা করবেন।

যেমনি গোপনে মহলের ভিতর এসেছিলো, তেমনি গোপনে বেরিয়ে গেল ভুজঙ্গ হালদার।

কেউ জানতে পেলো না।

সেদিন রাত্রিকালে সুভদ্রা গৃহত্যাগ করলো ভুজঙ্গ হালদারের সঙ্গে। সে সুভদ্রাকে গোপনে নিয়ে এলো পাটনায়।

কিন্তু কি করে যেন টের পেয়ে গেল বিষ্ণুরাম ত্রিবেদী ও মকবুল খাঁ। নাইব নাজিমের কাছে ফরিয়াদ পেশ করা হোলো যে, মনসবদার ভুজঙ্গ হালদার এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশের কন্যা হরণ করেছে। নাইব-নাজিম কোতোয়ালকে পাঠালো না, খোদ মির বকশিকে পাঠিয়ে দিলো ভুজঙ্গ হালদারকে গ্রেপ্তার করতে। মির বকশি উপস্থিত হোলো একদল সিলাহ্‌দার নিয়ে। ভুজঙ্গ হালদার নাইব-নাজিমের পরোয়ানার প্রতি অসম্মান দেখাতে পারে না, কোনো আপত্তি না করেই তাকে যেতে হোলো। তার বিশ্বাস ছিলো, নাইব-নাজিমকে সে বোঝাতে পারবে। তার বিবাহিতা পত্নীকে কোনো অসম্মানের সম্মুখীন হতে দেবে না নাইব-নাজিম।

কিন্তু নাইব-নাজিম সেদিনই শিকার করতে চলে গেল পাটনার বাইরে। তিনদিন কেল্লায় কয়েদ ছিলো ভুজঙ্গ হালদার। তিনদিন পরে নাইব-নাজিম ইত্তলা দিলো। খাস মজলিসে উপস্থিত হয়ে সব কথা খুলে বললো ভুজঙ্গ হালদার।

বিশেষ কোনো কথা বললো না নাইব-নাজিম, তার মুখ খুব বিষণ্ণ। শুধু বললো, "এ তোমার হঠকারিতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাকে না জানিয়ে এরকম করা অন্যায় হয়েছে তোমার পক্ষে। যাই হোক, সে তোমার বিবাহিতা পত্নী, তুমি বিধিমতো বিবাহ করেছো তাকে। সুতরাং তোমাকে কাজির আদালতে পাঠালাম না। তুমি মুক্ত।"

অবিলম্বে গৃহে প্রত্যাগমন করেছিলো ভুজঙ্গ হালদার।

কিন্তু গৃহ শূন্য।

সংবাদটা পেলো ভৃত্যদের কাছে।—বিষ্ণুরাম ত্রিবেদী নিজে এসে জোর করে মেয়েকে পালকিতে তুলে নিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু পিত্রালয়ে আর পা দিতে হয়নি সুভদ্রাকে।

পালকি এনে নামিয়ে রাখতে যখন কাউকে বেরোতে দেখা গেল না, পাওয়া গেল না কোনো সাড়াশব্দ, পরিচারিকারা এসে পালকির দরজা সরিয়ে দেখে পালকির ভিতর পড়ে আছে সুভদ্রার সংজ্ঞাহীন দেহ।

তাকে আর বাঁচানো গেল না। সে বিষ খেয়েছে।

সংবাদ পেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো ভুজঙ্গ হালদার। সারাদিন, সারারাত। পরদিন নাইব-নাজিমের দরবারে হাজিরা দেওয়ার কথা। তাও গেল না। কেটে গেল সারাদিন।

তারপর দিন থেকে আর দেখা গেল না ভুজঙ্গ হালদারকে। কেউ জানতে পারলো না সে গেল কোথায়।

একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সে।—কেটে গেল অনেকগুলি বছর।

দু-চার দিনের জন্যে এক স্বর্গের সন্ধান পেয়েছিলো ভুজঙ্গ হালদার। সেটা হারালো, কিন্তু তার আর দুঃখ নেই। দীর্ঘকাল সাধনার পর সে এক নতুন আনন্দলোকের সন্ধান পেয়েছে।

তবু মাঝে মাঝে অনেক স্মৃতির ওপার থেকে সুভদ্রার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে তার কানে। মনে হয় সেই সুভদ্রা যেন আজো বন্দিনী হয়ে আছে কোথাও, আকাশে বাতাসে দেশের মাটিতে সাধারণ মানুষের হাহাকারে ভুজঙ্গ ঠাকুর শুনতে পায় তার অস্ফুট ক্রন্দন। তার মুক্তির উপায় করবার জন্যেই ভুজঙ্গ হালদারের শক্তি সাধনা। এই দীর্ঘ সাধনার পর তার চোখে আজ সুভদ্রা আর অখ্যাত জনপদের অভুক্ত কৃষকবধূ সব একাকার হয়ে গেছে।

তার এই সাধনা রাষ্ট্রদ্রোহী কিন্তু সমাজবিমুখ নয়। সে যে শক্তি সঞ্চয় করেছে, তা যদি সাধারণ মানুষের কাজে লাগাতে না পারে, তাহলে কি সার্থকতা এই সাধনার। সাধারণ লোক বিচারের জন্যে হাহাকার করে মরে, যাকে খাজনা দেয়, তার কাছ থেকে

প্রত্যাশা করে রক্ষণাবেক্ষণের, নিরাপত্তার, যাতে সে নিশ্চিন্ত হয়ে তার সামান্য একটু জমিতে কিছু ফসল ফলিয়ে সারাবছর খেয়ে পরে জীবনধারণ করতে পারে।

কিন্তু তার কাছ থেকে রাজস্ব নেওয়ার মালিক আছে, তার রক্ষণাবেক্ষণের গরজ কারো নেই। তাকে একধার থেকে শোষণ করে নিচ্ছে সবাই,—মোগল শাসক, হিন্দু জমিদার, ফিরিঙ্গি হার্মাদ, মগ বোম্বেটে। কেউ নেই যে তার হয়ে লাঠি ধরে দাঁড়ায়, তাকে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয়।

সে ফসল ঘরে তুলতে পারে না। লক্ষ লক্ষ সুভদ্রার দীর্ঘ-নিঃশ্বাস নিয়ে বাতাস হাহাকার করে সকাল দুপুর সন্ধ্যা।

তাই দল গড়লো ভুজঙ্গ ঠাকুর। স্বপ্ন দেখলো দক্ষিণে জঙ্গল কেটে নতুন আবাদ বসাবার।

কিন্তু সে সন্ন্যাসী, তাকে দিয়ে রাজ্য পরিচালনা হয় না। তার জন্যে চাই রাজধর্মে দীক্ষিত ক্ষত্রিয়বৃত্তিতে সুশিক্ষিত এক শক্তিমান তরুণ। দেবীকান্তকে পেয়ে সে আশা মিটেছিলো।

অনেকদিন ধরে চেষ্টাচরিত্র করবার পর আবাদ বসানোর প্রাথমিক কাজগুলো শুরু করে দিয়েছিলো।

কিন্তু কাল সন্ধ্যেবেলা দেবীকান্ত এসে বললো,—রাজা ইন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরীর কন্যা তার শরণ নিয়েছে, সে বিপদাপন্না, তাকে বাঁচাতে হবে।

শুনে প্রথমটা স্তম্ভিত হোলো ভুজঙ্গ ঠাকুর।

"উত্তরা! রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মেয়ে?"

"হ্যাঁ।"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো ভুজঙ্গ ঠাকুর। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "সে তোমার খোঁজ পেলো কোথায়?"

"উত্তরা তার পরিচারিকা ললিতার মারফত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।"

"কিন্তু তোমার সন্ধান পেলো কি করে ?"

"অষ্টভূজার মন্দিরে গিয়ে মুরলীধরকে নিয়ে, তার সঙ্গে আমার কাছে এসেছিলো।"

ভুজঙ্গ ঠাকুর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো দেবীকান্তর দিকে। চুপ করে রইলো দুজনেই। তারপর ভুজঙ্গ ঠাকুর জিজ্ঞেস করলো, "অষ্টভূজার মন্দিরের মুরলীধরকে সে জানলো কি করে ?"

দেবীকান্ত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

"আমার কাছে কিছু গোপন কোরো না দেবীকান্ত। সব কথা খুলে বলো আমায়।"

দেবীকান্ত আস্তে আস্তে মাথা তুললো। তারপর স্থিরকণ্ঠে বললো, "উত্তরা আমার বাগদত্তা।"

হঠাৎ মনে একটা ধাক্কা খেলো ভুজঙ্গ ঠাকুর। কিছুক্ষণ মুখে কোনো কথা এলো না।

অনেকক্ষণ পর ভুজঙ্গ ঠাকুর বললো, "দেবীকান্ত।"

"বলুন।"

"তোমায় আমি চিরকাল বলে এসেছি, মন্ত্রসাধনের জন্যে চাই নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য।"

"আমি সে কথা মনে প্রাণে মেনে এসেছি।"

"কিন্তু নারীর জন্যে মনে আসক্তি জাগলেও এই ব্রহ্মচর্য নষ্ট হয়ে যায়।"

"আমায় ভুল বুঝবেন না। উত্তরার প্রতি আমার কোনো হীন আসক্তি নেই। আপনিই সব সময় বলতেন, নারী শক্তিস্বরূপিণী, নারীই সেই সচ্চিদানন্দময়ীর তনুময়ী প্রতিমা। উত্তরাকে আমি সেভাবেই আমার জীবনে গ্রহণ করেছি ভুজঙ্গ ঠাকুর।"

ভুজঙ্গ ঠাকুরের কণ্ঠস্বর একটু বিমর্ষ শোনালো। বললো, "দেবীকান্ত, আমি যে চিরকাল অন্য একটা স্বপ্ন দেখেছি। দক্ষিণে গড়ে তুলবো একটা নতুন রাজ্য। সে রাজ্যে শাসন করবে তুমি।

যতক্ষণ না এ স্বপ্ন সার্থক হচ্ছে ততক্ষণ সংসার করার কোনো চিন্তাই তুমি করবে না। যখন বংশরক্ষা করার জন্যে প্রয়োজন হবে, তখন আমি নিজেই দেখেশুনে এক সুলক্ষণা পাত্রীর সন্ধান করে নেবো তোমার জন্যে।"

দেবীকান্ত উত্তর দিলো, "শুধু বংশরক্ষা করার জন্যেই স্ত্রী, একথাই কি আপনি বলতে চান আমাকে ?"

ভুজঙ্গ ঠাকুর কোনো উত্তর দিতে পারলো না একথার। একটু পরে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কি এই ধারণা যে উত্তরা তোমার আরব্ধ কাজের বাধা হয়ে দাঁড়াবে না ?"

"না। ওর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে অনেকবার। আমার স্বপ্ন তারও স্বপ্ন। আজ সেই আমার শক্তি, আমার প্রেরণা।"

"সেই তোমার শক্তি, তোমার প্রেরণা!" ক্ষীণ হয়ে এলো ভুজঙ্গ ঠাকুরের কণ্ঠস্বর। ভাবলো, একটি সাধারণ নারী এসে দেবীকান্তর মনের সবটুকুই অধিকার করে বসলো ? তাকে যে এতদিন লালন পালন করলো ভুজঙ্গ ঠাকুর, তাকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে মানুষ করে গড়ে তুললো,—সে তার জীবনে কিছু নয় ? উত্তরাই তার শক্তি, উত্তরাই তার প্রেরণা,—আর ভুজঙ্গ ঠাকুর যে এতদিন ধরে সব পরিকল্পনা করে আরব্ধ কর্ম সফল করার আয়োজন সমাপ্ত করলো, সেই ভুজঙ্গ ঠাকুর কিছু নয় ?

কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে বসে রইলো। চারদিকে হাওয়া দিচ্ছে, শাখায় শাখায় মর্মরিত হয়ে উঠছে গাছের পাতা। হঠাৎ যেন অনেক যুগের ওপার থেকে ভেসে এলো সুভদ্রার কান্না। সুভদ্রা গড় নাসিমপুরে বন্দিনী হয়ে আছে, তার ডাক এসেছে ভুজঙ্গ ঠাকুরের কাছে। না, না, তাকে যেতে হবে।

অন্তরের নিভৃত মন্দির থেকে যেন কোন এক চিন্ময়ী বলে উঠলো,—ওরে মূঢ়, তুই আমার থেকে আলাদা করে দেখছিস কোন নারীকে ?

আস্তে আস্তে চোখ খুললো ভুজঙ্গ ঠাকুর।

"দেবীকান্ত!"

"বলুন।"

"উত্তরার সঙ্গে তোমার সাম্প্রতিক কালে সাক্ষাত হয়েছে?"

"হ্যাঁ, ভুজঙ্গ ঠাকুর।"

"কবে?"

"মাসাধিককাল পূর্বে।"

"কোথায় দেখা হয়েছে?"

"অষ্টভূজার মন্দিরের কাছে, গঙ্গার ধারে।"

"এর আগেও দেখা হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"রাজমহলে।"

"কবে?"

"এবার যখন রাজমহলে গিয়েছিলাম।"

মনে মনে সময়ের একটা হিসেব করলো ভুজঙ্গ ঠাকুর। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "ললিতা নামে এই পরিচারিকাকে কি সম্পুর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায়?"

"কেন?"

"তুমি কি করে জানো যে উত্তরাই পাঠিয়েছে ললিতাকে? কি করে জানো যে তোমাকে বন্দী করবার একটা ষড়যন্ত্র এটা নয়? তোমাকে কিংবা আমাকে ধরবার জন্যে চেষ্টা করছে এই অঞ্চলের জমিদারেরা, একথা তো তুমি জানো।"

একটি পান্নার অঙ্গুরীয় দেখালো দেবীকান্ত। ভুজঙ্গ ঠাকুর চিনতে পারলো এই অঙ্গুরীয়। দেবীকান্তর হাতে আগে দেখেছে।

"এটা আমি নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছিলাম উত্তরাকে।"

"ললিতা নিয়ে এসেছে এই অঙ্গুরীয়?"

"হ্যাঁ।"

"মুরলীধরের কথাও কি উত্তরাকে তুমি বলেছিলে ?"

"হ্যাঁ। ওকে বলেছিলাম, যদি আমার কাছে কোনোদিন কোনো সংবাদ পাঠানোর প্রয়োজন হয়, এই আংটি দিয়ে বিশ্বাসী কাউকে যেন পাঠিয়ে দেয় অষ্টভূজার মন্দিরে মুরলীধরের কাছে।"

"ললিতা কোথায় ?"

"গড় নাসিমপুরে ফিরে গেছে, ওর অপেক্ষা করবার সময় ছিলো না।"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো ভুজঙ্গ ঠাকুর। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আমায় আগে কোনোদিন বলোনি কেন ?"

দেবীকান্ত কোনো উত্তর দিলো না।

"আগে বললে ভালো করতে।"

"সাহস করিনি।"

"কেন ?"

"হয়তো আপনি রাগ করতেন।"

একটু চুপ করে থেকে ভুজঙ্গ ঠাকুর বললো, "না, রাগ করতাম না। মনের দিগন্ত প্রসারিত হওয়ার জন্যে জীবনে এই ভালোবাসা প্রয়োজন। জানিনা, আমার চিন্ময়ী মা মহাশক্তি সাধারণ মানুষের জীবনে হয়তো এভাবেই তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন।"

মনে হোলো যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে ভুজঙ্গ ঠাকুরের কথাগুলো, সে আনমনে বলে গেল, "এই আলোর স্ফুরণ একদিন আমার জীবনেও হয়েছিলো। সেই প্রথম পথ দেখ্‌তে পেয়েছিলাম।"

দেবীকান্ত অবাক হয়ে তাকালো ভুজঙ্গ ঠাকুরের দিকে।

ভুজঙ্গ ঠাকুর সামলে নিলো। তারপর বললো, "হ্যাঁ, যেতে তো তোমায় হবেই। আমি হলেও যেতাম। কিন্তু একটা কথা ভাবছি।"

"বলুন।"

"মোগলেরা তো আমাদের ধরবার চেষ্টা করছে অনেকদিন থেকে। এটা কোনো একটা ফাঁদ নয় তো ?"

"না, আমি সে কথা বিশ্বাস করি না," দেবীকান্ত উত্তর দিলো।

"কেন ?"

"উত্তরা প্রাণ গেলেও এই আংটি আর কাউকে দেবে না।"

"বেশ, মানছি সে কথা। কিন্তু মনে করো, কেউ জানতে পেরেছে তার সঙ্গে তোমার গোপন সংযোগের কথা। জানতে পেরেছে যে, এই অঙ্গুরীয় তুমিই দিয়েছো তাকে। মনে করো, যদি আমার প্রতি বৈরীভাবাপন্ন কারো সংবাদদাতা হয় উত্তরার এই পরিচারিকা ললিতা।—মেনে নিচ্ছি উত্তরা ও ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী গড় নাসিমপুরে বন্দী। যারা তাদের বন্দী করেছে, যদি এমন হয় যে তারা কোনো রকমে এই অঙ্গুরীয় হস্তগত করে এখন তোমাকে গড়ের ভিতর নিয়ে আটকে ফেলবার পরিকল্পনা করেছে ? তোমাকে ধরতে পারলে, আমাকেও সহজে ধরতে পারবে বলে হয়তো আশা করে তারা।"

"কিন্তু আমি কে সেকথা উত্তরা ছাড়া আর কেউ জানে না।"

"মনে করো যদি জেনে গিয়ে থাকে।"

"বড়ো জোর একথা জানতে পারে যে আমি দেবীকান্ত। কিন্তু আমি যে ভুজঙ্গ ঠাকুরের দলের অন্যতম অধিনায়ক, যাকে সাধারণ লোকে রাজাবাবু বলে জানে, একথা আর কেউ জানবে কি করে ? আমার আসল নাম আমাদের দলের লোকেরা ছাড়া আর কেউ জানেনা।"

"দেবীকান্ত, আমি এসব কথা তর্ক করে সম্ভব প্রমাণ করতে চাইছি। শুধু অনুমান করে নিতে বলছি। মনে করো যদি তাই হয়, তা হলে ? সমস্ত সম্ভাবনা সম্বন্ধেই প্রস্তুত থাকতে হবে তো ?"

দেবীকান্ত বললো, "এসব অনুমান তো যাচাই করে নেওয়ার কোনো উপায় নেই। যাই হোক, আমাকে যেতে হবে। এবং

যেতে যখন হবে, তখন এরকম বিপজ্জনক কাজের যেসব ঝুঁকি, তাও নিতে হবে।

ভুজঙ্গ ঠাকুর হাসলো। বললো, তোমার মুখে আমি একথাই শুনতে চাইছিলাম। হ্যাঁ যেতে তোমাকে হবে। তাকে উদ্ধার করা তোমার কর্তব্য।"

"তাহলে রওয়ানা হওয়ার আয়োজন করি।"

"হ্যাঁ, অবিলম্বে। তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।"

"আপনি ?"

"হ্যাঁ। তোমাকে বিপদের মুখে পাঠিয়ে আমি কি করে এখানে চুপ করে বসে থাকি ?"

"না, ভুজঙ্গ ঠাকুর, আপনাকে কোনো ঝুঁকি আমি নিতে দেবো না। যদি আপনার কোনো বিপদ হয় ?"

"বিপদ যাই হোক, তুমি আর আমি একসঙ্গে তার মুখোমুখি হবো।"

"কিন্তু গড়ের ভিতর আমি একাই ঢুকবো। তাই বলে দেওয়া হয়েছে আমাকে।"

ভুজঙ্গ ঠাকুর হেসে বললো, "গড়ের ভিতর একলা ঢোকা খুব সহজ কাজ। কিন্তু বেরিয়ে এসে নিরাপদে পালিয়ে আসা খুব সহজ নয়। সেখানে আমাদের সবার সহায়তা তোমার প্রয়োজন হবে।"

খালের পাড়ে সেই অন্ধকারে একলা দাঁড়িয়ে ভুজঙ্গ ঠাকুর চুপচাপ তাকিয়ে ছিলো গড় নাসিমপুরের দিকে।

তাকিয়ে তাকিয়ে পুরোনো দিনের এসব অনেক কথা একটি একটি করে মনে পড়ে গেল।

সময় বোধ হয় হয়ে এলো। ওই জানলাটি দেখিয়ে দিয়েছিলো দেবীকান্ত।

সেখানে আলো জ্বলছে। কয়েকটি ছায়া দুএকবার চলে গেল জানলার পাশ দিয়ে।

একটু পরেই বোধ হয় সঙ্কেত আসবে।

: চার : : উত্তরা :

পালকির অন্ধকারে চুপ করে হেলান দিয়ে বসেছিলো রাজা ইন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর কন্যা উত্তরা। তার হাত মুখ বন্ধ, টুশব্দ করার উপায় ছিলো না। পালকির দরজা বন্ধ। বাইরের কিছুই দেখবার উপায় নেই।

এটুকু বুঝতে পারছিলো যে রাত হয়েছে। কতো রাত কিছুই বুঝবার উপায় নেই। কতোক্ষণ ধরে পালকি চলছে তাও আঁচ করতে পারেনি সে। মনে হোলো যেন অনন্তকাল ধরে এক অন্ত-হীন পথ বেয়ে চলেছে এই পালকি। এখন মাঝরাতও হতে পারে, রাত্রির প্রথম প্রহরও হতে পারে।

হেলতে দুলতে দুলতে পালকি চলেছে। বাহকদেরও কোনো সাড়াশব্দ নেই। চারদিক নিসাড় নিস্তব্ধ, শুধু শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ডাক। কখনো বা ধারে কাছে, কখনো বা দূরে শেয়াল ডেকে উঠছে, গাছের ডালপালার অন্ধকারে পাখা ঝাপটাচ্ছে জেগে ওঠা পাখি।

উত্তরা জানতেই পারেনি এরা কারা, তাকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়।

পালকি বাহকেরা অন্ধকার পথে হোঁচট খাচ্ছে বার বার, থেকে

থেকে ঝাঁকুনি লাগছে পালকিতে। কখনো কখনো নিচু ডালপালা পালকির গায়ে লেগে খসখস করে উঠছে।

উত্তরার মনে হোলো তাকে হয়তো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোনো জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো, মনে হোলো না ধারে কাছে কোনো লোকালয় আছে। একটি বন-বেড়ালের ডাক শোনা গেল শুধু।

এক নাগাড়ে এতক্ষণ বসে তার সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। একটু নড়ে চড়ে বসবার চেষ্টা করলো। সঙ্গে সঙ্গে ব্যথায় টনটন করে উঠলো সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

চোখ বুঁজলো উত্তরা। এই জমাট অন্ধকারে চোখ খোলা রাখা না রাখা একই কথা। চোখে ঘুম নেই, দুর্ভাবনায় দুর্ভাবনায় মন অসাড় হয়ে গেছে। আর ভাবনা করতে ভালো লাগে না। ভাগ্যের পায়ে নিরুপায় ভাবে নিজেকে সমর্পন করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। কিছু অনুমান করার চেষ্টা করেও কোনো লাভ নেই। যেখানে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত কিছুই জানা যাবে না।

চোখ খুললো উত্তরা। চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার। চোখ বুঁজলো, তখনও সেই অন্ধকার। উত্তরার জীবনটাই যেন অন্ধকার হয়ে আছে।

এক মাত্র ভরসা দেবীকান্ত। কিন্তু কে জানে সে এখন কোথায়! কি করে উত্তরার সন্ধান পাবে সে।

সকাল থেকেই মন ভালো ছিলো না। এমনিতেই মন আজকাল ভালো থাকে না কোনোদিনই, কিন্তু আজ যেন বিষণ্ণতা আরো বেশী।

বার বার বাবার কথা মনে পড়ছিলো, আর মনে পড়ছিলো দেবীকান্তর কথা। ভাবতে ভাবতে পেছন দিকে অনেক বছরের ওপারে ফিরে গেল উত্তরা।

পরিষ্কার মনে পড়লো অনেকদিন আগেকার সেই রাত।

সেদিন নববর্ষের উৎসবের ধুম, চারদিকে হৈ-চৈ হট্টগোল, আকাশে আতশবাজির সমারোহ।

সবাই আতশবাজি দেখছে মহলের পেছন দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। দেবীকান্তকে দেখা গেল না কোথাও, তাকে খুঁজতে খুঁজতে উত্তরা উঠে এলো ছাদের উপর। দেখলো, দেবীকান্ত মুখ বিষণ্ণ করে একলা এককোণে দাঁড়িয়ে আছে।

"তুই এখানে একলা বসে আছিস কেন?" জিজ্ঞেস করেছিলো উত্তরা।

"এমনি," উত্তর দিয়েছিলো দেবীকান্ত।

"সবাই পেছন দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আতশবাজি দেখছে, তুই দেখবি না?"

"না।"

"কেন রে?"

"আমার মন ভালো নেই।"

আজো উত্তরার পরিষ্কার মনে আছে সেই রাত্রির প্রত্যেকটা কথা। উত্তরা দেবীকান্তর কাছে এসে তার কাঁধে একটি হাত রেখে জিজ্ঞেস করেছিলো, "কি হয়েছে আমায় বলবি না?"

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দেবীকান্ত খুব মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলো, "বাবার কথা মনে পড়ছে।"

একথা শুনে খুব কষ্ট হয়েছিলো কিশোরী উত্তরার মনেও। সে জোর করে দেবীকান্তর হাত ধরে টেনে নিচে নিয়ে আসছিলো। পথে সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল উত্তরার পিতার সঙ্গে।

"কি খবর তোমাদের? কোথায় যাওয়া হচ্ছে?" রাজা ইন্দ্র নারায়ণের সেই হাসি হাসি মুখ উত্তরার মনে পড়ে এখনো।

উত্তরা জানিয়ে দিলো, দেবীকান্তর মন খারাপ, তাই ওকে আতশবাজি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে।

"মন খারাপ! কেন?"

ইন্দ্রনারায়ণের এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরা বলেছিলো, "ওর বাবার কথা মনে পড়ছে।"

কি অন্যায় কথা বলেছিলো, আজো উত্তরা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। শুধু মনে আছে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় রাজা ইন্দ্রনারায়ণ তীব্র ভৎর্সনা করেছিলো দেবীকান্তকে।

"মন যদি খারাপ করতে হয়, গড়ের বাইরে ফাঁকা মাঠ আছে, সেখানে গিয়ে মন খারাপ করো। এখানে আমার মহলের ভিতর বসে মন খারাপ করে চৌধুরীবাড়ির অকল্যাণ করতে হবে না।"

ভৎর্সনা শুনে উত্তরার চোখে জল এসে গিয়েছিলো। প্রত্যেকটি কথা তার মনের উপর যেন চাবুকের আঘাত হেনেছিলো। তাকাতেই পারছিলো না দেবীকান্তর দিকে।

ভৎর্সনা করে চলে গেল ইন্দ্রনারায়ণ। দেবীকান্ত সিঁড়ি ধরে নামতে লাগলো আস্তে আস্তে।

"আতশবাজি দেখবি না?"

"না। আমার ভালো লাগছে না। তুই ছাখ গে যা।"

"তুই কোথায় যাচ্ছিস?"

"এমনি একটু বেড়িয়ে আসি গড়ের পাঁচিলের ওধারে।"

• "চল আমিও যাবো।"

"না, তোকে আসতে হবে না।"

দেবীকান্ত চলে যাচ্ছিলো। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে ডাকলো, "উত্তরা!"

"কি ভাই—?"

"আচ্ছা, আমি যদি কোনোদিন চলে যাই এখান থেকে?"

দেবীকান্তর মন ঠিক বোঝেনি উত্তরা। কিশোর বয়েসের আর দশটা কথার মতো সহজ ভাবে নিয়ে, এখান থেকে চলে গেলে কি হয়, অনেক বছর পরে আবার ফিরে এলে কি মজা হয়, তাই জল্পনা কল্পনা করেছিলো দুজনে মিলে। তারপর বলেছিলো, "আয় না ভাই, সবাই মিলে আতশবাজি দেখবো—।"

"না।"

"আসবি না?"

"না।"

উত্তরার রাগ হয়েছিলো। বলেছিলো, "যা তোর যেখানে খুশী। এত সাধলাম, ওঁর রাগ পড়ে না কিছুতেই। অনেক সেধেছি, আর পারি না বাবা।"

রাগ করে দুমদাম করে চলে গিয়েছিলো উত্তরা। ভেবেছিলো তার মান ভাঙাতে দেবীকান্তই ফিরে আসবে।

শান্তিতে আতশবাজি দেখতে পারে নি উত্তরা। চোখ দুটি ব্যাকুল হয়ে দেবীকান্তকে খুঁজেছে। অনেকক্ষণ ধরে যখন দেখা নেই, তখন বাইরে একবার খুঁজতে গিয়েছিলো তাকে। কোথাও খুঁজে পেলো না। অনেককে জিজ্ঞেস করলো,—দেবীকান্তকে দেখেছো? কেউ কিছু বলতে পারলো না। এক সময় দেওয়ান শিবশঙ্কর মজুমদারের সামনে পড়ে গেল।

"তুমি এখানে কি করছো উত্তরা?"

"দেবীকান্তকে খুঁজছি। ওকে দেখেছেন দেওয়ান কাকা?"

শিবশঙ্কর একটু বিরক্ত হোলো। এত অতিথি অভ্যাগতের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তদারক করতে হচ্ছে তাকে, একটি ছোটো মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলার কি অবকাশ আছে। বললো, "ও নিশ্চয়ই ওদিকে ভোজবাজি দেখছে কিংবা যাত্রা শুনছে। তুমি বাইরে কেন? যাও, মহলের ভিতরে যাও। ছোটো ছেলেমেয়েরা এদিকে আসে না।"

মহলের ভিতর ফিরে গেল উত্তরা। দেবীকান্তর উপর রাগ হোলো খুব। স্থির করলো পরদিন আর কথা বলবে না তার সঙ্গে।

সেই যে উধাও হোলো দেবীকান্ত, তারপর আর কোনো খবর নেই।

সে রাত্তিরে খোঁজ হয়নি। অতো লোকজন হৈ-চৈ' এর মধ্যে কোন বাচ্চা ছেলে কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছে, তা নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় নি। কিন্তু সকালবেলাও যখন কোথাও পাওয়া গেল না দেবীকান্তকে, তখন চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হোলো।

উত্তরা বার বার গিয়ে খোঁজ করতে লাগলো ইন্দ্রনারায়ণের কাছে। ইন্দ্রনারায়ণও ব্যাকুল হয়ে উঠলো। অন্ন ত্যাগ করলো শিবশঙ্করের দিদি সুরেশ্বরী। দুর্ভাবনা হোলো দেওয়ান শিবশঙ্করেরও। এমন কি বাসুদেবও মুখ চূণ করে বসে রইলো বারান্দার এক প্রান্তে।

ইন্দ্রনারায়ণ মুখে যাই বলুক, হয়তো মনে মনে স্নেহ করতো দেবীকান্তকে। কিংবা হয়তো বিবেকের দংশন আরো তীব্র হয়ে উঠলো দেবীকান্ত নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর। ইন্দ্রনারায়ণের নির্দেশে লোক লাগিয়ে দেওয়া হোলো দেবীকান্তর সন্ধানে, পাইক পাঠানো হোলো চারদিকে।

ইন্দ্রনারায়ণ নিজে ছটফট করে পায়চারি করতে লাগলো মহলের বারান্দায়।

আস্তে আস্তে বেলা বেড়ে গেল, কেউ কোনো খবর দিতে পারলো না। শুধু একজন বললো, সে আগের দিন সন্ধ্যার পর দেবীকান্তকে গড়ের সামনের খাল পেরিয়ে মাঠের দিকে যেতে দেখেছে।

মধ্যাহ্ন অতীত হোলো। এক সময় শোনা গেল গঙ্গার বুকে একটা বড় রকমের ডাকাতি হয়ে গেছে। সরকারের খাজনা লুঠ

করেছে ভুজঙ্গ ঠাকুরের দল। শুনে সবার মনে ভয় ধরে গেল। কড়া পাহারার ব্যবস্থা হোলো গড় নাসিমপুরে।

বেলা গড়িয়ে গেল। অপরাহ্ণ পার হয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। ছাদের উপর উঠে এলো উত্তরা। মনে পড়লো আগের দিন সন্ধ্যে বেলা সে এখানে দাঁড়িয়ে গল্প করেছিলো দেবীকান্তর সঙ্গে।

ভাবতে ভাবতে মনে পড়লো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেবীকান্ত হঠাৎ বলেছিলো,—আচ্ছা উত্তরা, আমি যদি এখান থেকে চলে যাই?

উত্তরার কেমন যেন মনে হোলো দেবীকান্ত আর ফিরবে না। সে হারিয়ে যায়নি, ইচ্ছে করে চলে গেছে গড় নাসিমপুর থেকে। একলা ছাদে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো উত্তরা। কেউ দেখলো না তার কান্না। শুধু দখিনের হাওয়া তার চুলে হাত বুলিয়ে গেল। আকাশে ফুটে উঠলো রাশি রাশি তারা। একটি একটি করে তারা গুনলো উত্তরা। মনে হোলো,—দেবীকান্ত যেখানেই থাক, আজ সন্ধ্যেবেলা নিশ্চয়ই সে ভাবছে তার কথা, আর তারা গুনছে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

দিনের পর দিন কেটে গেল, মাসের পর মাস পার হয়ে বছর ঘুরে এলো,—দেবীকান্তের আর কোনো সন্ধান নেই। সবাই ওর আশা ছেড়ে দিলো।

আস্তে আস্তে ভুলেও গেল সবাই।

সবাই ভুলে গেল, কিন্তু উত্তরা একদিনের জন্যেও ভুললো না।

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা সে কিছুক্ষণের জন্যে উঠে আসতো মহলের ছাদে। আকাশের তারা দেখলেই মনে পড়তো দেবীকান্তর কথা।

সন্ধ্যেবেলা আকাশের তারা গোনা ছিলো তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। বার বার মনের মধ্যে একটা ছবি ফুটে উঠতো,—কোথায়

কোন নির্জন মাঠের ধারে পথের দিশা হারিয়ে ম্লান মুখে বসে আছে এক ক্লান্ত বালক, সারাদিন খাওয়া হয়েছে কি হয়নি, কে জানে!

ভাবতে ভাবতে উত্তরার চোখ সজল হয়ে উঠতো।

বাসুদেবের সঙ্গে খেলাধুলোও সেদিন থেকে বন্ধ। দেবীকান্ত নিখোঁজ হবার পর একদিন সে একটু বিষণ্ণ ছিলো, কিন্তু তারপরও যখন আর ওর খোঁজ পাওয়া গেল না তখন সে থেকে থেকে যা বক্রোক্তি করছিলো সে সব গিয়ে বিঁধছিলো উত্তরার বুকে। বাসুদেবের দাম্ভিক স্বভাবের জন্যে সে এমনিতেই অপছন্দ করতো তাকে, কিন্তু সেদিন থেকে যেন দূরত্ব গড়ে উঠলো মনের মধ্যে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা ছাদে একা দাঁড়িয়েছিলো উত্তরা, হঠাৎ বাসুদেব এসে উপস্থিত হোলো সেখানে। তাকে দেখে উত্তরা চুপ করে রইলো, কোনো কথা বললো না।

"তুই এখানে একলা দাঁড়িয়ে কি করছিস?" বাসুদেব জিজ্ঞেস করলো।

"এমনি দাঁড়িয়ে আছি," উত্তরা উত্তর দিলো।

"আজকাল আর আমার সঙ্গে খেলতে আসিস না কেন?"

একটু চুপ করে রইলো উত্তরা। তারপর বললো, "খেলতে ভালো লাগে না।"

"দেবীকান্ত নেই, সেজন্যে?"

উত্তরা কোনো উত্তর দিলো না।

"দেবীকান্তর কথা তোর বুঝি মনে পড়ে সব সময়?"

"মাঝে মাঝে মনে পড়ে," উত্তরা নীরস কণ্ঠে বললো, "মাঝে মাঝে মনে পড়ে না।"

"ওর কথা ভেবে কি হবে। ও আর আসবে না।"

"কে বললে," চটে গেল উত্তরা, "আমার মনে হয় ও একদিন ফিরে আসবে।"

"কেন আসবে ? এখানে ওর কি ?"

"কেন আসবে না ? নিজের বাড়িতে ফিরে আসবে না সে ?"

"নিজের বাড়ি !" বাসুদেব হেসে খুন।

উত্তরা বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছিলো। শুনলো বাসুদেব বলছে, "আপদ বিদেয় হয়েছে। ছিলো সুখে। মা-বাপ নেই বলে তোমার বাবা দয়া করে আশ্রয় দিয়েছিলো। কিন্তু সে সুখ ওর কপালে সইবে কেন ? এখন যখন গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষে করে খেতে হবে তখন মজা বুঝবে।"

"ভিক্ষে করে খেতে হবে কেন ?" উত্তরা ফিরে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলো।

"কে ওকে এরকম রাজার হালে রাখবে ?"

"দেবীকান্ত আর যাই করুক, ও কোনদিন ভিক্ষে করে খাবে না।"

"তা হলে আর কি করবে। না হয় চুরি করবে—।"

"ওর সম্বন্ধে ওরকম বলবি না বলে দিচ্ছি।"

"বেশ, না হয় বলবো না। কিন্তু দেখে নিস তুই। নে, রাগ করিসনা, চল ঠাকুর দালানে গিয়ে আরতি দেখি।"

"তোমার সঙ্গে আমি আরতি দেখব না," বলে চলে গেল উত্তরা।

সেদিন থেকে ও বাসুদেবকে এড়িয়ে চলতে লাগলো। এক বাড়িতে থাকে, দেখা হলে নেহাত কথা না বলে পারা যায় না, অন্তত ওর কথার উত্তর দিতে হয়। কিন্তু যতোটা সম্ভব দূরে দূরে থাকতো উত্তরা। এবং অন্যান্য বাড়ির ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বাসুদেব খেলাধূলো করতো বলে, সে সব ছেলেমেয়েদের থেকেও একটু তফাতে থাকতে লাগলো সে।

আস্তে আস্তে একটা গাম্ভীর্য দেখা দিলো উত্তরার মধ্যে। কৈশোর চপলতা কেটে গেল। একটা পরিবর্তন এলো তার ব্যক্তিত্বে।

এই পরিবর্তন লক্ষ্য করলো সুরেশ্বরী। ভাবলো, মেয়ে বড়ো হচ্ছে এবার। একে ধীরে সুস্থে শেখাতে হবে সংসারের কাজ, গড়ে তুলতে হবে সম্ভ্রান্ত বংশের কুলবধূর উপযুক্ত করে। যে পরিবারেই তার বিয়ে হোক, সে যেন সেই পরিবারের আদর্শ বধূ হয়।

সুবর্ণগ্রাম থেকে চলে আসবার পর গড় নাসিমপুরেও সুরেশ্বরী পেয়েছিলো বিপত্নীক ইন্দ্রনারায়ণের অন্দরমহলের কর্তৃত্ব ভার। ইন্দ্রনারায়ণও তাকে ভগ্নীর মতোই শ্রদ্ধা সম্মান করতো। সুরেশ্বরী একদিন ইন্দ্রনারায়ণের কাছে প্রসঙ্গটা তুললো।

"দাদা, উত্তরার দিকে আপনি কি তাকিয়ে দেখেন না?"

"কেন দিদি?"

"মেয়ে যে বড়ো হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, তা তো হবে," রাজা ইন্দ্রনারায়ণ হাসি মুখে উত্তর দিলো, "আমরাও তো বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।"

"এবার মেয়ের জন্যে পাত্র সন্ধান করতে হবে তো।"

"পাত্র!" ইন্দ্রনারায়ণ আকাশ থেকে পড়লো।

"বাঃ, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না?"

একটু গম্ভীর হয়ে গেল রাজা ইন্দ্রনারায়ণ।

উত্তরা ছিলো পাশের ঘরে। এরা জানতে পারলো না যে, সব কথা তার কানে যাচ্ছে। উত্তরা শুনলো ইন্দ্রনারায়ণ আস্তে আস্তে বলছে, "হ্যাঁ, বিয়ে তো দিতে হবে। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"মেয়েকে পরের বাড়ি পাঠাতে পারবো না।"

"তা হলে?"

"আমি চাই আমার জামাই আমার এখানে থাকবে।"

"ঘর জামাই?"

"হ্যাঁ। আমার বিষয় সম্পত্তি ভোগ করবার জন্যে ওই একটি মেয়ে। আমি থাকতে এই ব্যবস্থা করতে চাই, আমার অবর্তমানে

যেন জমিদারি সরকারে বাজেয়াপ্ত না হয়, বাদশাহ্‌র কাছ থেকে ফরমান আদায় করা যায় যে, সম্পত্তির মালিক হবে মেয়ে জামাই।”

সুরেশ্বরী বলেছিলো, “সে যাই হোক, ছেলের সন্ধান তো করতে হবে এখন থেকে।”

ইন্দ্রনারায়ণ একটু আনমনা হয়ে গেল। তারপর বললো, “ছেলে তো বাড়িতে এনে মানুষ করছিলাম মনের মতো করে। কিন্তু বরাত খারাপ, কি আর করবো।”

?”

“হ্যাঁ। কেন যে চলে গেল কে জানে। না হয় সেদিন ভর্ৎসনা করেছিলাম। কিন্তু আমি তার পিতৃতুল্য, ভর্ৎসনা করবার অধিকার কি আমার নেই? উপযুক্ত ছেলে ছিলো, বংশমর্যাদায় আমাদেরই পালটি ঘর। ওর সঙ্গে উত্তরার বিয়ে দিলে, উমাকান্তর আত্মা শান্তি পেতো। লোকে জানে দেবীকান্তকে বঞ্চিত করে আমি ওর পিতার জমিদারি নিজে দখল করেছি। কিন্তু একথা কে বুঝবে যে, ওর সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হোতোই। তাই তো কানুন। না হয় আমি রাজমহলে তদ্বির করে সেটা নিজে দখল করবার ফরমান যোগাড় করেছি। কিন্তু করেছি কার জন্যে? দেবীকান্তর জন্যেই তো।”

সুরেশ্বরীর চোখে জল এলো। বললো, “দেবীকান্তর খোঁজ কি আর পাওয়া যাবে? ছেলেটা বেঁচে আছে কিনা কে জানে!”

“মাঝে মাঝে ভাবি, যদি ফিরে আসে ছেলেটা—।”

“ফিরে এলে তো ভালোই, কিন্তু ওর আশায় বসে থেকে কি আর মেয়ের বিয়ে দেবে না?”

“না, তা নয়,” ইন্দ্রনারায়ণ বললো, “বোধ হয় ভগবানের ইচ্ছা নয় যে, ওর সঙ্গে উত্তরার বিয়ে হোক। ওর ভাগ্য খারাপ, আমি আর কি করবো। যাই হোক, বিষয়টা ভেবে দেখতে হবে।”

দু একদিন ভাবলো ইন্দ্রনারায়ণ, তারপর একদিন দেওয়ান

শিবশঙ্করকে বললো, "শিবশঙ্কর, একটা ভালো ছেলের সন্ধান করো।"

"ভালো ছেলে? কেন?"

"উত্তরাকে তো পাত্রস্থ করতে হবে—।"

"ও—" বলে একটু চুপ করে গেল শিবশঙ্কর।

ইন্দ্রনারায়ণ বলে গেল, "ছেলেটি যেন ভালো বংশের হয়। দরিদ্র হোক কোনো ক্ষতি নেই। তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ে ছেলেকে আমার কাছে রেখেই শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করতে চাই।"

শিবশঙ্করের উপর ভার দিয়েই নিশ্চিন্তবোধ করলো ইন্দ্রনারায়ণ। সে যেখান থেকে হোক উপযুক্ত ছেলের সন্ধান করতে পারবে। কিন্তু কাজের বেলা দেখা গেল ঠিক মতো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। যারই খোঁজ আনা হয়, তারই কোনো না কোনো খুঁত বেরিয়ে পড়ে, কোনো না কোনো কারণে অপছন্দ হয় ইন্দ্রনারায়ণের কিংবা সুরেশ্বরীর।

"কী ব্যাপার শিবশঙ্কর," ইন্দ্রনারায়ণ জিজ্ঞেস করলো একদিন, "দেশে কি সুপাত্রের এতই অভাব?"

"রাজা ইন্দ্রনারায়ণের একমাত্র কন্যার জন্যে সুপাত্রের অভাব হওয়ার কথা নয়," শিবশঙ্কর উত্তর দিলো, "কিন্তু ঘর জামাই হয়ে থাকতে রাজী হবে এরকম সুপাত্রের সন্ধান পাওয়া খুব সহজ নয়।"

"সে যাই হোক, তোমার উপর যখন ভার দিয়েছি, তখন তুমি যেখান থেকেই হোক কোনো না কোনো সুপাত্রের সন্ধান আনতে পারবে এ বিশ্বাস আমার আছে।"

একটু ইতস্তত করে শিবশঙ্কর বললো, "যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি—।"

"বলো কি বলছো।"

"অতো খোঁজাখুঁজি করার কী প্রয়োজন। সুপাত্র তো আমাদের বাড়িতেই আছে।"

."তাই নাকি ? কে সে ?" বিস্মিত হয়ে ইন্দ্রনারায়ণ জিজ্ঞেস করলো।

"কেন, আমার ছেলে বাসুদেব—।"

"বাসুদেব! শিবশঙ্করের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লো ইন্দ্রনারায়ণ। তারপর গম্ভীর হয়ে বললো, "না, সে কি করে হয়।"

"কেন ?"

"দেখ শিবশঙ্কর, বাসুদেব আর উত্তরা ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গেই বড়ো হয়েছে। ওদের সম্পর্ক ভাইবোনের মতো। ওদের পরস্পরের সঙ্গে বিয়ে আমি ভাবতেই পারি না।"

খুব হালকা ভাবে কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো ইন্দ্রনারায়ণ। শিবশঙ্কর আর কথা বাড়ালো না। মনে মনে ভাবলো,—দেবীকান্ত আর উত্তরাও তো একসঙ্গেই বড়ো হয়েছে। কই, তাদের তো ভাইবোন ভাবেন নি রাজা মহাশয়। দেবীকান্তর সম্বন্ধে ইন্দ্রনারায়ণ কি আশা পোষণ করতো সেকথা শিবশঙ্কর যে একেবারে আঁচ করতে পারেনি, তা নয়।

ইন্দ্রনারায়ণের মনের ভাব শিবশঙ্কর বুঝলো। বংশমর্যাদায় শিবশঙ্কর মজুমদার চৌধুরীদের সমতুল্য নয়। তা-ছাড়া শিবশঙ্কর ইন্দ্রনারায়ণের বেতনভোগী। সুতরাং ইন্দ্রনারায়ণ কৌশলে প্রস্তাবটা এড়িয়ে গেল।

শিবশঙ্করও এ প্রস্তাব আর উত্থাপন করলো না কোনোদিন, একেবারে চেপে গেল। এ নিয়ে যে দ্বিতীয়বার কোনো কথা সে ভেবেছে, এমন কোনো আভাসও সে দিলো না।

কিন্তু মনের মধ্যে একটা জিদ চেপে গেল সেদিন থেকে। বাসুদেব ভদ্দিনে বড়ো হয়েছে। তাকে পাঠিয়ে দিলো রাজমহলে। সেখানে আছে শিবশঙ্করের এক পূর্ব পরিচিত বন্ধু, সে সুবাদারের মির বকশির মুনসি। তার কাছে বছর খানেক থেকে বাসুদেব

ফারসি শিখে দেওয়ানের দফ্তরে চাকরি নিলো পেশ্-দস্ত হিসেবে। তারপর কয়েক বছরের মধ্যে যোগ্যতা দেখিয়ে হিসাব বিভাগের নাইব্ হোলো।

ইন্দ্রনারায়ণ যে বাসুদেবের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব আরম্ভেই প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন একথা উত্তরা শুনেছিলো এক পরিচারিকার মুখে। শুনে খুশীই হয়েছিলো সে।

মাঝে মাঝে পুজো পার্বণ উপলক্ষে বাসুদেব গড় নাসিমপুরে আসতো। উত্তরা তখন যৌবনসন্ধিতে পড়েছে। বাসুদেবের সঙ্গে বেশী দেখা হোতো না, তাকে এড়িয়েই চলতো উত্তরা।

সেবার বোধ হয় জন্মাষ্টমীর সময়, বাড়িতে খুব ধুমধাম। বাসুদেবও এসেছে রাজমহল থেকে।

একদিন সকাল বেলা অন্দর মহলের পেছন দিকের বাগানে পুজার ফুল তুলছিলো উত্তরা। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ তার নাম ধরে ডাকলো।

উত্তরা ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলো বাসুদেবকে।

বাসুদেব অল্পবয়েস থেকেই এবাড়িতে বড়ো হয়েছে, তার পিসী অন্দর মহলের কর্ত্রী। সুতরাং বাড়ির ছেলের মতোই মহলের ভিতর তার অবাধ গতিবিধি। কিন্তু এরকম সময় তাকে বাগানের ভিতর দেখে উত্তরা বিস্মিত হোলো। উত্তরা রাজা ইন্দ্রনারায়ণের কন্যা। ছোট বড়ো সবাই তার সামাজিক মর্যাদার যথাযোগ্য সম্মান করে চলে। সে যখন বাগানে একলা, তখন একজন অনাত্মীয় পুরুষের পক্ষে বাগানের ভিতর এসে তার সঙ্গে বাক্যালাপ করার প্রচেষ্টাকে সে অশোভন বলেই মনে করলো।

"উত্তরা!" বাসুদেব কাছে এসে ডাকলো।

মুখ না ফিরিয়েই উত্তরা শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ফুল তুলতে তুলতে, "এই সকাল বেলা এখানে কি মনে করে?"

"অন্য সময় তোমাকে নিরিবিলি পাওয়া যায় না, বেশী কথা

বলার সুযোগও হয়না। তাই এখানেই এলাম। জানি এসময় তুমি এখানে একলাই থাকো।”

উত্তরা একটু ভ্রূকুটি করলো, “আমার সঙ্গে কি তোমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে ?”

“হ্যাঁ, তা প্রয়োজন একটু আছে বইকি,” হেসে উত্তর দিলো বাসুদেব, “তোমার জন্যে একটা উপহার এনেছি রাজমহল থেকে।”

“উপহার !” উত্তরা মনে মনে একটু বিরক্ত হোলো।

“এটা পছন্দ হয় কিনা দেখ তো।”

“ওটা কি ?” এবারও মুখ ফেরালো না উত্তরা।

“হাতির দাঁতের কৌটো। তোমার জন্যে এনেছি রাজমহল থেকে।”

উত্তরা নিরস কণ্ঠে বললো, “হাতির দাঁতের কৌটো পেলে পিসীমা খুবই খুশী হবেন।”

“কিন্তু এনেছি তো তোমার জন্যে।”

“আমি তো বাবার কাছ থেকে ছাড়া আর কারো কাছ থেকে কিছু নিই না, ওটা তুমি পিসীমাকেই দিও।”

একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো বাসুদেব, তারপর জিজ্ঞেস করলো, “এটা তুমি নেবে না ?”

“না।”

“উত্তরা,” বাসুদেব বললো, “আমরা ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে বড়ো হয়েছি। তাই খুব সরল মনে তোমার জন্যে এটা এনেছিলাম।”

“আমিও খুব সরল মনেই তোমায় বলছি,—আমি বাবার কাছ থেকে ছাড়া আর কারো কাছ থেকে কিছু নিই না।”

বাসুদেব আস্তে আস্তে চলে গেল সেখান থেকে।

ওর একটি কথা উত্তরার মনে খচখচ করে বিঁধছিলো।—অন্য সময় তোমায় নিরিবিলি পাওয়া যায় না উত্তরা, বেশী কথা বলার সুযোগও হয় না। তাই এখানেই এলাম।—কেন ? তাকে

নিরিবিলিতে কি দরকার? বেশী কথা বলার সুযোগই বা প্রয়োজন কেন? সে তো তার সঙ্গে বেশী বাক্যালাপ করা ছেড়ে দিয়েছে গত কয়েক বছর ধরে। ওরা পরস্পরের কাছ থেকে একটা দূরত্বই বজায় রাখতো এই ক-বছর। আজ আবার নতুন করে মাখামাখি করার দরকারটা কিসের।

ভাবতে ভাবতে উত্তরা যে টের পেলো না তাও নয়। বাসুদেব ইদানীং যেন তার প্রতি একটু বেশী আগ্রহ প্রকাশ করছে। অনেকবার লক্ষ্য করেছে, দূর থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বাসুদেব। চোখে চোখ পড়লে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কাছাকাছি থাকলে লুকিয়ে তাকাচ্ছে আড়চোখে, হয়ে পড়ছে বড় বেশী রকম আত্ম-সচেতন। তার একটা ছুটো কথাতেই পুলকের শিহরণ জাগে বাসুদেবের মনে, নবযৌবনোস্তিন্না হলেও তার নারীর মন নিয়ে বেশ বুঝতে পারে উত্তরা। লক্ষ্য করে সে, বাসুদেবের চোখ ছুটো একটা কামনার অনুভূতিতে ঝিকমিক করছে।

কিছুদিনের মধ্যে বাসুদেবের ভাবভঙ্গি দেখে উত্তরার বুঝতে বিলম্ব হোলো না যে, সে তার প্রতি অনুরক্ত। তাকে এড়িয়েই চলতে লাগলো উত্তরা। মনে মনে প্রীতই হোলো একথা ভেবে যে, বাসুদেব গড় নাসিমপুরে আজকাল বেশী থাকে না।

তবু একজন পুরুষ যে তার সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করছে, এতে একটা নতুন আনন্দ অনুভব করতে শিখলো উত্তরা,—সেই আগ্রহ সে অনুমোদন করুক বা নাই করুক। নিজের একটা নতুন সত্তার উপলব্ধি এলো তার মনে। মাঝে মাঝে দর্পণে তাকিয়ে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতো আজ দেবীকান্ত এখানে থাকলে, সেও কি এভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতো উত্তরার সম্বন্ধে? তার মনেও কি আসতো এই রহস্যময় চাঞ্চল্যের ঢেউ? দেবীকান্তর সম্ভাব্য ব্যবহার মনে মনে কল্পনা করতো উত্তরা। মনে হোতো,—না, সে এভাবে নিরিবিলিতে সুজোগ খুঁজতে আসতো না অন্দর

মহলের বাগানে, দূর থেকে ওভাবে শালীনতাবিহীন দৃষ্টি হানতো না, কাছে এসে তাকাতো না আড় চোখে।

কিংবা কি জানি, হয়তো এরকমই করতো। মনে দুর্বলতা এলে হয়তো এরকম বিচারবুদ্ধি হীন হয়ে যায় সব পুরুষই। না, দেবীকান্তর ও রকম হোতো না,—ভাবতো উত্তরা। কেন? না,—প্রয়োজন হোতো না দূর থেকে তাকানোর। যা কিছু দেখার সামনে থেকেই দেখতে পেতো সে।

ভাবতে ভাবতে আরক্ত হোতো উত্তরার মুখমণ্ডল।

উত্তরা বড়ো হয়ে গেল, কিন্তু বিয়ের ঠিক হয়নি এখনো। ইন্দ্রনারায়ণ খোঁজ খবর করছেন, কিন্তু ছেলে পছন্দ হচ্ছে না কোথাও। একথা কানে এলে উত্তরা খুশী হোতো।

মাঝে মাঝে ভাবতো,—দেবীকান্ত কি কোনোদিন ফিরে আসবে?

না, তার আর খোঁজ পাওয়া যাবে না কোনোদিন। ফিরে আসবার হলে সে এদ্দিনে নিশ্চয়ই ফিরে আসতো।

মাঝে মাঝে মনে পড়তো খুব ছেলেবেলাকার একটা কথা। দেবীকান্তর বাবা উমাকান্ত রায়কে একটু একটু মনে পড়ে। উনি বলতেন ইন্দ্রনারায়ণকে, এরা বড়ো হলে এদের বিয়ে দেবো। ইন্দ্রনারায়ণ হাসতো একথা শুনে।—কথাগুলো মনের মধ্যে শুনতে পেতো মাঝে মাঝে, আর কানদুটো রাঙা হয়ে উঠতো।

দেবীকান্ত যেদিন থেকে নিখোঁজ হোলো, সেই সন্ধ্যায় সে উত্তরাকে বলেছিলো,—আচ্ছা উত্তরা, যদি আমি চলে যাই এখান থেকে?

উত্তরা হেসে বলেছিলো খুব উৎসাহের সঙ্গে,—হ্যাঁ, চলে যা, বেশ ভালো হয় তাহলে। যখন ফিরে আসবি খুব মজা হবে তখন। তোর সঙ্গে থাকবে অনেক লোকজন, অনেক হাতি ঘোড়া। সবাই চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করবে,—কে ইনি? কোথাকার

রাজপুত্তুর ? আমি বলবো,—আরে, এ যে আমাদের দেবীকান্ত গো। সবাই চিনতে পারবে তখন। বাবা বলে উঠবে,—দেবীকান্ত ? এসো বাবা। কোথায় ছিলে এই ক-বছর ?—তখন সবাই তোমায় যে কী খাতির করবে বলার নয়।

কথাগুলো মনে পড়লে মুখে হাসি আসে, কিন্তু ব্যথায় উদ্বেল হয়ে ওঠে মনের ভিতরটা। সত্যিই কি একদিন ফিরে আসবে দেবীকান্ত ? সঙ্গে থাকবে হাতি ঘোড়া লোকলস্কর ?

মনে মনে ভাবে,—না, হাতি ঘোড়া লোকলস্করে কাজ নেই। সে একলাই ফিরুক, ভিখারী হয়ে আসুক সন্ন্যাসী হয়ে আসুক কোন ক্ষতি নেই, তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেবে উত্তরা।

কিন্তু সে কি আসবে ? উত্তরা ভাবতো,—এ শুধু মিথ্যে কল্পনা। সে আর ফিরবে না, তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাবে না কোনোদিন।

ভাবতে ভাবতে মনের ভিতরটা হু-হু করে উঠতো নিদাঘ মধ্যাহ্নের মতো। তাকিয়ে দেখতো আকাশের দিকে। যদি দেখতে পেতো যে তারাগুলো ফুটছে দুটো চারটে করে, অমনি গুনতে শুরু করে দিতো।—যেখানে থাক দেবীকান্ত, নিশ্চয়ই আজ সন্ধ্যেবেলা তারা গুনছে উত্তরার কথা মনে করে।

না কি ভুলে গেছে সে ? বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে !

উত্তরার চোখে জল এসে যেতো এক এক সময়।

বাসুদেব পূজোপার্বণ উপলক্ষে গড় নাসিমপুরে আসতো, দু-চারদিন থেকে আবার চলে যেতো। বাসুদেবের নজর দৃষ্টিতে সে বিব্রত বোধ করতো, তবু এ নিয়ে কোনো উৎকণ্ঠা বোধ করার কারণ তার ছিলো না।

কিন্তু একদিনকার ঘটনার পর সে একটু একটু ভয় পেতে শুরু করলো বাসুদেবকে।

কালীপূজোর তিন চারদিন পরের কথা, একদিন মহলের ছাদে একলা দাঁড়িয়ে অনেক দূরে মাঠের দিকে তাকিয়েছিলো উত্তরা। হঠাৎ দেখে বাসুদেব কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

উত্তরা একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলো। সে দেখতে পেলো না যে বাসুদেবের মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছে।

"উত্তরা!" ডাকলো বাসুদেব।

"পেছনে দাঁড়িয়ে কেন, এদিকে এসে দাঁড়াও," সহজ কণ্ঠে বললো উত্তরা।

বাসুদেব সামনের দিকে সরে এলো।

"কি করছো এখানে একলা দাড়িয়ে?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"আকাশের তারা গুনছি," উত্তরা একটু হেসে বললো।

"আমরা খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে যাচ্ছি, না? দেখতে দেখতে কতো বছর কেটে গেল গড় নাসিমপুরে।"

"তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেলে বাঁচি," উত্তরা উত্তর দিলো।

"কেন উত্তরা?"

"তখন কেউ আর ঘাঁটায় না।"

"বাসুদেব হাসলো, কোনো কথা বললো না।" উত্তরাও চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর একেবারে চুপচাপ থাকা ভালো দেখায় না বলে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি রাজমহলে ফিরে যাচ্ছো কবে?"

বাসুদেব একটু অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে দেখলো উত্তরার দিকে, তার পর জিজ্ঞেস করলো, "আমি চলে গেলে তুমি খুব সুখী হও,—না?"

উত্তরা মনে মনে একটু বিরক্ত হোলো। কিন্তু মুখে সেভাব প্রকাশ না করে সহজ কণ্ঠে বললো, "সুখ অসুখের কথা হচ্ছে না। তুমি কাজ থেকে ছুটি নিয়ে আসছো, ছুটির শেষে চলে যাচ্ছো, এতো প্রায়ই হচ্ছে। এমনি জানতে চাইছিলাম, তুমি কবে যাচ্ছো।"

"কাল্ সকালে যাচ্ছি। জোয়ার শুরু হচ্ছে প্রথম প্রহরেই, তখনই রওনা হবো।"

"বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"আজ সন্ধ্যার পর ওঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবো।"

"আবার কবে আসবে?"

"পৌষ পার্বণের সময় নিশ্চয়ই আসবো। তার আগে আর হয়ে উঠবে না।"

এমনি মামুলী কথা বেশ কিছুক্ষণ ধরে বলে চললো দুজনে।

কিছুক্ষণ পর উত্তরা বললো, "সন্ধ্যা হয়ে আসছে। চলো, এবার নিচে যাই।"

উত্তরা চলে আসছিলো।

বাসুদেব গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "উত্তরা, যেওনা, দাঁড়াও।"

উত্তরা থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

"কেন?" বিস্ময়ের ভান করে জিজ্ঞেস করলো সে।

"তোমায় একটা কথা বলবো ভাবছিলাম।"

"কি কথা?"

বাসুদেবের মুখে কোনো কথা এলো না। একটু ইতস্তত করলো সে। ঘাম দেখা দিলো সারা মুখে।

"কি বলবে বলো," অধৈর্য হয়ে বললো উত্তরা।

"বলছি। এখানে একটু থাকো না আরো কিছুক্ষণ।"

"না, আর থাকতে পারবো না। আরতির সময় হয়ে এলো। পিসীমা বলে দিয়েছেন, ওঁর সঙ্গে আরতি দেখতে যাবো।"

"উত্তরা—!" কি যেন বলতে শুরু করলো বাসুদেব। তারপর আবার থেমে গেল।

"বলো কি বলছো।"

"উত্তরা, তুমি একবার রাজমহলে বেড়াতে এসো রাজামশায়ের সঙ্গে।"

মনে মনে একটু হাসলো উত্তরা। মুখে গাম্ভীর্যের ভাব বজায় রেখে বললো, "হ্যাঁ, যেতে পারি একবার। বাবাতো অনেক বার ওঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছেন।"

"হ্যাঁ, এসো একবার। ভারী সুন্দর শহর। কতো বড়ো বড়ো ইমারত দালান মহল। আর কতো লোক, বাজার, দোকানপাট, আগ্রা দিল্লী ছাড়া হিন্দুস্তানে একরকম সুন্দর শহর খুব কমই আছে।"

উত্তরা হাসলো। বললো, "আমি কি আর পুরুষদের মতো পথে পথে ঘুরে শহর দেখবো? মেয়ে মানুষের জন্যে গড় নাসিম-পুর আর রাজমহলের মধ্যে কোনো তফাত নেই।"

বাসুদেব গলা নামিয়ে বললো. "উত্তরা, আমি কি শুধু শহর দেখবার জন্যেই তোমাকে রাজমহলে আসতে বলছি?"

"তাহলে? আর কি আছে আমার দেখবার মতো?"

"আছে উত্তরা। আমি চাই তুমি রাজমহলে এসে দেখে যাও আমার কতো খাতির সেখানে। এরকম অল্প বয়েসে আমার মতো পদোন্নতি খুব কম লোকেরই হয়েছে।"

"তোমার মুখে শুনেই বেশ বুঝতে পারছি," উত্তরা নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দিলো, "রাজমহলে গিয়ে আর বেশী কী জানবো?"

বাসুদেবের পদোন্নতির পেছনে যে শিবশঙ্করের তদ্বির এবং উৎকোচ উভয়েরই প্রভাব আছে একথা বলাবলি করতো গড় নাসিমপুরের লোকেরা। তবে বাসুদেবের কর্মদক্ষতা ও কূটবুদ্ধির কথাও কারো অজানা ছিলো না।

বাসুদেব বলে গেল, "সুবা বাংলার বড়ো বড়ো জমিদারেরা আমায় যে কি রকম খোসামোদ করে, তুমি ভাবতে পারবে না। নাইব-দিওয়ান আমার পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করেন না।"

"তাই নাকি?" উত্তরা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ। একদিন নাইব-দিওয়ান আমাকে শাহ শুজার দরবারে নিয়ে গিয়েছিলেন। শুনছি আগামী বছর নওরোজ উপলক্ষে আমাকে একটি ছোটো মনসব আর জায়গির দেওয়া হবে।"

"সে তো খুবই ভালো কথা।"

"এই শুরু উত্তরা।"

উত্তরা হেসে জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় শেষ? তোমায় বাংলার সুবাদার করবে?"

এ প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ অনুভব করতে পারলো বাসুদেব। তার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। কিন্তু প্রশান্ত মুখে বললো, "যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতাম, তাহলে বাদশাহ্‌র উজীর হওয়ার কথাও চিন্তা করতে পারতাম।"

উত্তরা হাসলো, কোনো উত্তর দিলো না।

বাসুদেব বলে গেল, "তবে মোগল রিয়াসতে একজন হিন্দু যতোদূর যেতে পারে, আমিও যে ততোদূর উন্নতি নিশ্চয়ই করতে পারবো, একথা তোমায় জোর গলায় বলতে পারি।"

"ভালোই তো। তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারলে আমরা খুশীই হবো।"

"সত্যিই?"

"নিশ্চয়ই। গড় নাসিমপুর গর্ববোধ করবে তোমার জন্যে।"

"তুমি?"

"আমি কি?"

"তুমিও কি গর্ববোধ করবে আমার জন্যে?"

উত্তরা একটু বিস্মিত হয়ে বাসুদেবের দিকে তাকালো, তারপর হঠাৎ বলে উঠলো, "আরে আমার খেয়ালই নেই। পিসীমা আমায় বলে দিয়েছিলেন ওঁর পূজোর ঘরে আলপনা করে দেওয়ার জন্যে। তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে ভুলেই গেছি সে কথা।"

উত্তরা তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিলো, কিন্তু বাসুদেব তার সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো, "যেও না উত্তরা, শোনো।"

"কি?"

"একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

"বাসুদেব, তোমার আজকাল কি হয়েছে বলো তো?" উত্তরা ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করলো।

"কি হয়েছে সে যদি বুঝিয়ে বলতে পারতাম—," বলে বাসুদেব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

"সরো, আমাকে যেতে দাও," বললো উত্তরা।

"না।"

উত্তরা একটু বিরক্ত হয়ে তাকালো বাসুদেবের দিকে।

"উত্তরা!"

"কি?"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?"

"কি কথা?"

"তুমি রাগ করবে না?"

"তোমার কথায় রাগ করতে যাবো কেন বাসুদেব?" উত্তরা প্রশান্ত মুখ করে বললো।

"উত্তরা—।"

"বলো না কি বলছো।"

"উত্তরা, আমি তোমায় ভালোবাসি।"

"ও।"

"অনেকদিন থেকে, সেই ছেলেবেলা থেকে।"

উত্তরা চুপ করে রইলো একটুখানি, তারপর বললো, "সরো, আমি এবার যাই, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

"তুমি তো কিছু বললে না আমায়—।"

"আমি আর কী বলবো?"

"তুমি জানোনা উত্তরা, তুমি আমার সমস্ত মন ছেয়ে আছো। আমি আজ কাল কোনো কাজে মন দিতে পারি না. দিনরাত শুধু তোমার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারি না। এমন কি স্বপ্নেও আমি—"

"আমায় এসব কথা বলে কী লাভ!"

"তুমি কি আমায় একটুও—"

"থাক বাসুদেব, আর বোলো না। অনেক হয়েছে।"

বাসুদেবের মুখের ভাব একটু কঠিন হোলো। তারপর বললো, "উত্তরা, আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই।"

ওর আস্পর্ধায় উত্তরার মুখ একটু রাঙা হোলো, কিন্তু সংযত কণ্ঠে বললো, "আমায় বলে কি হবে? বাবাকে গিয়ে বলো।"

"রাজা মশায়কে?"

"হ্যাঁ। উনি যা স্থির করবেন, তাই হবে।"

"তুমি যদি রাজী হও—তাহলে তোমার বাবাকে বলার জোর পাই উত্তরা।"

"আমি কিছু বলতে পারবো না।"

বাসুদেব চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর বললো, "তোমার বাবাকে আমি কোনাদিন বলতে পারবো না। আমি কারো কাছে কোনোদিন কিছু চাই না। আজ তোমারই কাছে শুধু তোমায় চেয়েছি। যা আমার চাই তা অর্জন করে নেওয়াই আমার ধাত।"

উত্তরার ঠোঁটের প্রান্ত হাসিতে একটু বাঁকা হোলো, কোন উত্তর দিলো না।

বাসুদেব বলে গেল, "তোমার বাবার কাছে আমার বাবা যে একদিন কথা তোলেননি তা নয়। কিন্তু তিনি রাজা, গড় নাসিম-পুরের জমিদার, আর আমার বাবা তাঁর দেওয়ান। এ পার্থক্য তিনি ভুলতে পারলেন না। অবশ্যি তাঁর উন্নতির মূলে দেওয়ান শিব শঙ্কর মজুমদার,—কিন্তু এই কৃতজ্ঞতা কে মনে রাখে। দেওয়ানকে

তো মাইনে দেওয়া হয়। তাতেই হয়তো শোধ হয়ে যায় কৃতজ্ঞতার ঋণ।"

রাগে উত্তরার মুখ লাল হয়ে গেল। বললো, "ওঁরা দুজনেই আমাদের গুরুজন। তাঁদের নিয়ে এসব কথাবার্তা বলা উচিত নয়।"

"সত্যি কথা বলছি, শুনতে তোমার খারাপ লাগছে? একদিন ওকথা শুনে আমারও খারাপ লেগেছিলো উত্তরা। আজ তোমায় শুধু একটি কথা বলে যাচ্ছি,—তোমায় আমি চেয়ে পেলাম না, এবার নিজের যোগ্যতায় অর্জন করে নেবো। তখন আর আমায় কেউ ফিরিয়ে দিতে সাহস করবে না, তুমিও না, তোমার বাবাও না।"

কথা শেষ করে বাসুদেব আর দাঁড়ালো না। গট গট করে চলে গেল।

কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো উত্তরা। তারপর বাড়ির ভিতরে চলে গেল। যাওয়ার আগে চোখে পড়লো, দূরে সামনের মহলের পেছন দিকের জানলায় দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ান শিবশঙ্কর। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে, এদিকে।

উত্তরার সেদিন মনে হয়েছিলো,—যদি এসময় দেবীকান্ত এখানে থাকতো!

তারপর মনে হোলো,—সে থাকলে কিই বা আর হোতো, বাসুদেব ধরে প্রহার করতো তাকে। উত্তরার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিলো, মনে পড়লো ছেলেবেলায় দেবীকান্তকে ধরে কী ঠ্যাঙাতো বাসুদেব। কেউ তাকে কিছু বলতো না। উত্তরা ছাড়া তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার আর কেউ ছিলো না।

রাজমহলে ফিরে যাওয়ার আগে একবার ভিতরের মহলে এসেছিল বাসুদেব।

উত্তরা আর সুরেশ্বরী দুজনের সঙ্গে দেখা করতে এলো সে,—

প্রত্যেকবার যাওয়ার আগে যেমনি দেখা করতে আসে। সুরেশ্বরীর সামনে সে উত্তরার সঙ্গে কথা বললো খুব সহজ ভাবেই, যেন কিছুই হয়নি। উত্তরাও সহজ ভাবে তার কথার উত্তর দিলো।

কথায় কথায় এক সময় জিজ্ঞেস করলো উত্তরা, "আচ্ছা বাসুদেব, তোমার কাছে তো নানা পরগণা থেকে লোক আসে। কোনোদিন কারো কাছে দেবীকান্তর কোনো খবর পাও না?"

বাসুদেব স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললো, "ওকে তোমার এখনো মনে আছে?"

উত্তরা কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই সুরেশ্বরী বলে উঠলো, "ও কি কথা বাবা? মনে থাকবে না কেন? তোমরা সবাই ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলাধূলো করেছো, তাকে তোমরা ভুলে যাবে, এ কেমন কথা?"

"বাসুদেব ভুলে গেছে বোধ হয়," উত্তরা ঠোঁট চেপে হেসে বললো।

একটু চুপ করে থেকে বাসুদেব উত্তর দিলো, "না, আমিও ভুলে যাইনি। তবে সে নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। তা নইলে এদ্দিনে কোনো না কোনো একটা খবর পেতাম।"

সুরেশ্বরী আঁচলে চোখ মুছে বললো, "নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে অন্তত আমাকে দেখতে সে নিশ্চয়ই একবার না একবার ফিরে আসতো।"

বাসুদেব আর কোনো কথা না বলে সুরেশ্বরীকে প্রণাম করে চলে গেল।

মাঝে মাঝে উত্তরারও মনে হোতো একথা।

কিন্তু মন সায় দিতে চাইতো না কিছুতেই। মনে হোতো, কি জানি, হয় তো বেঁচে আছে সে, ভালো ভাবেই বেঁচে আছে। জীবন সংগ্রামে হার মানবার ছেলে সে নয়।

আর বেঁচে যদি থাকে, একদিন না একদিন দেখা হবে নিশ্চয়ই।

সে যেরকম ভুলতে পারেনি দেবীকান্তকে, দেবীকান্তও কি ভুলতে পেরেছে উত্তরাকে?—আকাশে যদ্দিন তারা ফুটবে সন্ধ্যার পর, ওরা কেউ কাউকে ভুলতে পারবে না।

কি জানি কেন, এ বিশ্বাস উত্তরার ছিলো যে, দেবীকান্তর সঙ্গে একদিন না একদিন দেখা হবেই।

ঝাঁকুনি লাগছে। পালকি চলতে শুরু করেছে আরো দ্রুত। ব্যথায় টন টন করে উঠছে উত্তরার গা হাত পা।

এতক্ষণ পরে চারদিকের অসহ্য স্তব্ধতার মধ্যে একজনের গলা শোনা গেল।

"—তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে। বেশী রাত হওয়ার আগেই গড় নাসিমপুরে পৌঁছতে হবে।"

বেশী রাত তাহলে হয়নি,—পালকির ভিতর উত্তরা ভাবলো। মনে হচ্ছে কতো যুগ যেন কেটে গেছে এই অন্ধকারের ভিতর বসে। এবার আলো চাই, একটু খানি আলো।

আজ দেবীকান্ত কোথায়!—ভাবলো উত্তরা।

দেবীকান্তর কথা আজ যেন বেশী করে মনে পড়ছে। অল্প বয়েসেই মাতৃহারা হয়েছে উত্তরা। শৈশব থেকেই সে এত লোকজনের মধ্যেও নিঃসঙ্গ। তাই নিজের একটা কল্পনার জগত তৈরী করে নিয়েছিলো। কল্পনার জগত জনহীন থাকলে চলে না, সেখানে চাই একজন অন্তরতম।

উত্তরার অজান্তে সে স্থান কখন অধিকার করে নিয়েছিলো দেবীকান্তর কল্পনার রূপ। উত্তরার যতো নালিশ, যতো অনুযোগ,

যতো মনের কথা জানানো, সব সেই কল্পনার দেবীকান্তর কাছে। মন সায় না দিলেও সে একরকম ধরেই নিয়েছিলো,—দেবীকান্ত চিরদিনের মতোই চলে গেছে তাদের জীবন থেকে।

তার সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে না।

কিন্তু জীবনে অনেক অভাবনীয় ব্যাপার হয়। উত্তরার সঙ্গে দেবীকান্তর দেখা হোলো।

ছু-বছর আগেকার কথা। ষোলো শো সাতান্ন সালের শেষ দিক। আগ্রার কেল্লায় অসুস্থ হয়ে আছে বাদশাহ্ শাহ্জাহান। সারা হিন্দুস্তান জুড়ে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। শাহজাদাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা। আওরংজেব বিজাপুরের যুদ্ধ স্থগিত করে ফিরে এসেছে আওরঙ্গাবাদে। শিগগিরই নাকি সসৈন্যে রওনা হবে আগ্রার উদ্দেশে। সন্ধি হয়েছে মুরাদ আর আওরংজেবের মধ্যে। মহম্মদ মুরাদ বক্স্ গুজরাটে নরুওয়াজ-উদ্দিন নাম নিয়ে নিজেকে বাদশাহ্ ঘোষণা করেছে। এদিকে রাজমহলে নিজেকে বাদশাহ্ বলে ঘোষণা করেছে শাহজাদা মহম্মদ শুজা, নাম নিয়েছে আবুল ফৌজ নাসির-উদ্দিন মহম্মদ তৈমুর সিকান্দার শাহ্ শুজা গাজি।

শাহ্ শুজাও যুদ্ধে রওনা হওয়ার তোড়জোড় করছে। সৈন্য সংগ্রহ করছে চারদিক থেকে। বাসুদেব হিসেব দফ্তরের কাজে ইস্তফা দিয়ে ফৌজে যোগ দিয়েছে। শুজা পাটনা যাবে শিগগিরই। শুজার অনুগত জমিদারেরা সবাই এসময় রাজমহল যাওয়া আসা করছে, শুজাকে যে যেরকম ভাবে পারে সহায়তা করার জন্যে।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী আর দেওয়ান শিবশঙ্করও রাজমহলে এসে উপস্থিত হোলো। ইন্দ্রনারায়ণ পাঁচ হাজার আশরফি নজরানা দেবে শাহ শুজাকে। এর বিনিময়ে পাওয়া যাবে গড় নাসিমপুরে আরো পাঁচটি তোপ রাখবার ফরমান আর বিস্তৃত জায়গির।

দেওয়ান শিবশঙ্করও এসেছিলো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। দু-হাজার আশরফি সেও সঙ্গে এনেছিলো শাহ শুজাকে নজরানা দেওয়ার জন্যে। বাসুদেব একটা ছোটো মনসব ও জায়গির পেয়েছে ইতিমধ্যে। গড় নাসিমপুরের কাছে আছে পীরপুর পরগণা। তার উপর নজর আছে শিবশঙ্করের, যদি জায়গির হিসেবে এই পরগণার সত্ত্ব পাওয়ার ফরমান আদায় করা যায় শাহ শুজার কাছ থেকে। আগ্রার বাদশাহ্‌র ফরমান আর দরকার নেই। কে বাদশাহ্ কে জানে! আপাতত শাহ শুজার ফরমানই যথেষ্ট। একবার দখল হাসিল করে নিতে পারলে পরে আর ভাবনা বিশেষ নেই। যেই বাদশাহ্‌র তখ্‌ত্‌এ কায়েম হোক, যথাযথ স্থানে উৎকোচ দিলে পরে ফরমান বার করে নেওয়া যাবে।

শিবশঙ্করের এই পরিকল্পনার কথা ইন্দ্রনারায়ণ জানতো না। সে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলো যে, তার হয়ে প্রয়োজন মতো তত্ত্ব-তদ্বির করছে শিবশঙ্কর।

কাজের উপলক্ষে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে রাজমহলে। তাই সুরেশ্বরী আর উত্তরাও সঙ্গে এসেছিলো। আর এসেছিলো উত্তরার পরিচারিকা ললিতা।

শহরের প্রান্তে গঙ্গার ধারে লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দির।

প্রত্যেকদিন সকালে সেখানে পূজো দিতে আর গঙ্গাস্নান করতে আসতো উত্তরা। ললিতা আসতো সঙ্গে।

সেদিনও এসেছিলো। তখন অগ্রহায়ণের শেষ। সবে শীত

পড়তে শুরু করেছে। নির্মল আকাশ থেকে স্নিগ্ধ রোদ নেমে এসেছে চারদিকে।

পালকিবাহক আর পিয়াদাদের বাইরে রেখে শুধু ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে উত্তরা গেল মন্দিরের পেছন দিকে গঙ্গার ঘাটে। তখন সেখানে আর কেউ ছিলো না।

গঙ্গায় তখন ভরা জোয়ার। অনেক দূরে দূরে পানসি নৌকো ছিপ ভেসে যাচ্ছে। এখানে সেখানে জলের বুকে ভাসছে অভিজাত বর্গের বজরা।

স্নান করতে করতে হঠাৎ পা পিছলে গভীর জলে গিয়ে পড়লো উত্তরা।

আর সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের টান তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

ললিতা চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু এসময় মন্দিরে লোকজন বিশেষ কেউ নেই। কারো সাড়া পাওয়া গেল না।

ললিতা সাঁতার জানেনা। সুতরাং সে নিজে কোনোরকম সাহায্য করতে অক্ষম। তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে পড়ে ছুটে গিয়ে পিয়াদাদের আর অন্যান্য লোকজন ডেকে আনলো।

কিন্তু ততক্ষণে উত্তরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জলের বুকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না তাকে।

ঘাটের উপর বসে ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করলো ললিতা।

কিন্তু উত্তরা জলে ডোবেনি। সে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শুয়ে ছিলো একটি বজরার ভিতর।

উত্তরার জ্ঞান ফিরে এলো প্রায় দু-দণ্ডকাল পরে।

আস্তে আস্তে চোখ মেলে চেয়ে দেখলো সে। সুন্দর সুসজ্জিত একটি নিচু কক্ষ। মনে হোলো ঘরটি একটু দুলছে। সে শুয়ে আছে নরম গালিচার উপর।

রুপোর বাটি হাতে সামনে দাঁড়িয়েছিলো একজন পরিচারক।

পাশে বসেছিলো আরেকজন। উত্তরাকে চোখ খুলে তাকাতে দেখে সে বললো, "এই দুধটুকু খেয়ে ফেল। তাহলে অনেক সুস্থ বোধ করবে।"

উত্তরা সচকিত হয়ে ফিরে তাকালো। কে বললো এই কথাগুলো। ভারী গলা, অচেনা,—তবুও যেন অচেনা নয়। কথা বলার ভঙ্গিতে একটা চেনা ধরন আছে। আগে কোথায় শুনেছে এরকম কথা বলার ভঙ্গি ?

তাকিয়ে দেখলো ভালো করে।—

দেখলো, একপাশে বসে আছে এক সুপুরুষ তরুণ। দীর্ঘপেশী-বহুল কান্তি, ঠোঁটের উপরে সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা, পরনে ধনী অভিজাত বংশীয়ের মহার্ঘ রেশমী জামাহ্ আর চুড়িদার পায়জামা।

অচেনা মুখ। কিন্তু—কিন্তু চোখ দুটি যেন খুবই চেনা। কোথায় —এর আগে কোথায় দেখেছে ওই কৌতুক-উদ্ভাসিত বিকচ নয়ন ? স্মৃতির পর্দা উঠতে লাগলো আস্তে আস্তে।

হঠাৎ উঠে বসলো উত্তরা।

"—তুমি !"

"হ্যাঁ, আমি।" সে একটু হাসলো।

"আমি কোথায় ?"

"আমার বজরায়।"

"আমি ঘাটে স্নান করবার সময় গভীর জলে গিয়ে পড়েছিলাম। তাই না ?"

"হ্যাঁ। ডুবে যেতে আরেকটু হলে।"

"তুমি—তুমি আমায় বাঁচিয়েছো ?"

"হ্যাঁ। তোমায় জলে হাবু-ডুবু খেতে দেখে আমিই তোমায় সাহায্য করতে বজরা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। তখন কি আর জানতাম তুমি ? বজরায় তুলে নিয়ে আসবার পর চিনতে পারলাম।"

উত্তরা চোখ বুঁজলো। ভাবলো,—স্বপ্ন দেখছি না তো! আবার চোখ খুললো। দেখলো, পাশে বসে হাসছে দেবীকান্ত।

"সত্যি সত্যি তুমি?"

"চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না?" দেবীকান্ত হাসলো।

"আমি স্বপ্ন দেখছি না, সত্যি বলো?"

দেবীকান্ত খুব জোরে হেসে উঠলো।

না, স্বপ্ন নয়। ঢেউয়ের কোলে বজরা একটু একটু দুলছে। ছোটো জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নদীর জল, আর একটু দূরে পাড়ের ওধারে বিভিন্ন মহল, মঞ্জিল, অট্টালিকা।

"দুধটা খেয়ে ফেল।"

দুধের বাটি হাতে নিয়ে এক চুমুকে সবটা খেয়ে ফেললো। তার পর জিজ্ঞেস করলো, "সত্যি দেবীকান্ত, তুমিই তো? আমি ভাবতেই পারিনি যে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।"

"সে আশা আমারও ছিলো না উত্তরা। দেখা যে এভাবেই হবে কে জানতো!"

"কিন্তু দেবীকান্ত, তুমি এখানে এলে কি করে?"

দেবীকান্ত হাসলো। বললো, "তোমার আয়ুর জোর আছে। সুতরাং আমার না এসে উপায় ছিলোনা।"

"দেবীকান্ত!"

"কি?"

"আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো না বলে স্থির করে রেখেছি অনেকদিন থেকেই।"

উত্তরার চোখে জল এসে গেল। দেবীকান্ত মুখ ফিরিয়ে নিলো অন্যদিকে। একটু বিষণ্ণ দেখালো তার হাসিটি।

"কোথায় ছিলে এদ্দিন?" ধরা গলায় বলে গেল উত্তরা, "ওরকম চলে গিয়েছিলে কেন কাউকে না বলে? তোমায় কতো খোঁজাখুজি করেছে সবাই। আমাদের মনে কষ্ট হয়নি বুঝি? ফিরে

আসোনি কেন? একটা খবরও তো দিতে পারতে? গড় নাসিমপুরকে একেবারে ভুলে গেছ? কি করছো এখন? নিবাস কোথায় তোমার? খুব সুখে সংসার করছো বুঝি?"

উত্তরা একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো, কিন্তু তাকে থামিয়ে দেবীকান্ত বললো, "অতো উত্তেজিত হোয়োনা। একটু শুয়ে থাকো। ইতিমধ্যে তোমার ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করি।"

"ও, আমায় বিদেয় করবার বুঝি তর সইছে না? ব্যস, তারপর আবার তুমি নিখোঁজ হবে, এই তো?" উত্তরার অধর স্ফুরিত হোলো।

"আমি নিখোঁজ হলে কার কি আসে যায়?" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দেবীকান্ত বললো, "আমার কে আছে?"

"কেন, তুমি সংসার করো নি?"

"না।"

"সে কি? তুমি আজো আগেরই মতো একা?"

দেবীকান্ত হেসে বললো, "সত্যি, এসংসারে আমার আপনজন বলতে কেউ নেই।"

একটু চুপ করে রইলো উত্তরা, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কেন, আমি নেই?"

"তুমি!"

"আমি তোমার কেউ নই?"

দুজনেই চুপ করে রইলো।

কখন দুজনের হাত একসঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে কারো খেয়াল নেই।

"উত্তরা!"

সে তাকালো দেবীকান্তর দিকে।

দেবীকান্ত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, মনে হোলো যেন সামলে নিলো নিজেকে। তারপর খুব সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করলো, "কাকামশায় ভালো আছেন?"

"হ্যাঁ। ওঁর খুব আশা ছিলো তুমি ফিরে আসবে। এখন অবশ্যি আর আশা করেন না। তবে তোমার কথা বলেন মাঝে মাঝে।"

দেবীকান্ত এক একজন করে কুশল প্রশ্ন করলো সবারই,—সুরেশ্বরীর, শিবশঙ্করের, বাসুদেবের। পুরোনো ভৃত্য কর্মচারী যাদের যাদের নাম মনে ছিলো তাদের প্রত্যেকের কথা জিজ্ঞেস করলো।

সবারই সংবাদ জানালো উত্তরা।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো দুজনে। দেবীকান্ত কিছু একটা যেন ভাবছিলো, হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা উত্তরা, তোমার বিয়ে হয়নি কেন এতদিন?"

উত্তরা একটু হাসলো। বললো, "আমরা দুজনেই বড়ো হয়ে গেছি না?"

"হ্যাঁ, বেশ কয়েক বছরতো কেটে গেছে।"

আমার যে কি ভাবে কেটেছে তুমি যদি বুঝতে।—উত্তরা ভাবলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, আমি তো বড়ো হয়ে গেছি, তুমি আমায় চিনতে পারলে কি করে?"

"তুমি আমায় যেভাবে চিনতে পারলে, ঠিক সেভাবে।"

"আমি তোমার হাসি দেখে চিনেছি," বললো উত্তরা।

"আমি চিনেছি তোমার চোখ দুটো দেখে।"

"চোখ দুটো তো বুঁজে ছিলাম।"

"তোমার মুখের চেহারা বিশেষ কিছু বদলায়নি উত্তরা। তোমার ডান চোখের উপরে ওই বড়ো তিল তো ভুলে যাওয়ার কথা নয়। ছেলেবেলায় কতো ঠাট্টা করতাম তোমায়।"

"তাই বলো। আমার চেহারা বদলায়নি। কিন্তু তোমার চেহারা অনেক বদলে গেছে।"

"উত্তরা, তুমি কিন্তু আমার কথার কোনো উত্তর দিলে না।"

"কি কথা ?"

"তোমার আজো বিয়ে হয়নি কেন ?"

উত্তরা একটু লজ্জা পেলো একথা শুনে। লাজুক মেয়ে সে নয়, কিন্তু দেবীকান্তর মুখে এ প্রশ্ন শুনে কেন সে লজ্জা পেলো নিজেই বুঝে উঠতে পারলোনা। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে হাসতে হাসতে বললো, "জানো, বাসুদেব আমাকে বিয়ে করবে বলে শাসিয়েছে।"

"শাসিয়েছে ?" দেবীকান্তর চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে উঠলো।

"কেন, ওকে ভয় করে না তোমার ? ছেলেবেলায় তো তোমায় ধরে খুব ঠ্যাঙাতো।"

"ভয় ওকে আমার কোনো কালেই করে না। তবে এখন তো আমরা কেউ ছোটো নই, আমাদের সে-দিনও আর নেই। দেবীকান্ত রায়ের উপর চোটপাট করতে পারে, কি তাকে চোখ রাঙাতে পারে এমন লোক এদেশে আর নেই।"

"তোমার এখন খুব ক্ষমতা,—না ?"

"হ্যাঁ, কিছু ক্ষমতা আমার আছে বইকি।"

"আচ্ছা বলো তো, তোমার এখনকার পরিচয়টা কি ?"

বাইরে একজনের গলা শোনা গেল।

"নৌকো এসে গেছে রাজাবাবু।"

দেবীকান্তকে দলের লোকেরা রাজাবাবু বলেই সম্বোধন করতো। সাধারণ লোকের কাছেও এই ছিলো তার পরিচয়।

"রাজাবাবু।" উত্তরা চক্ষু বিস্ফারিত করে তাকালো দেবীকান্তর দিকে, "তুমি কোথাকার রাজা গো ?"

দেবীকান্ত শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলো, 'যাদের রাজা নেই, আমি তাদের রাজা। যখন যেখানে যাই সেখানেই আমার রাজত্ব।"

উত্তরা কি বুঝলো কে জানে। বলে উঠলো, "কেমন, আমি তোমায় আগে বলিনি ?"

"কি বলেছিলে ?"

"বলেছিলাম, তুমি যেদিন ফিরে আসবে, তোমার সঙ্গে থাকবে হাতি ঘোড়া লোক লস্কর পাইক পিয়াদা। সবাই জিজ্ঞেস করবে, ইনি কে? কোথাকার রাজপুত্তুর? আমি বলবো,—আরে, চিনতে পারছো না ? এ যে আমাদের দেবীকান্তগো। সবাই কী খুশী হবে তখন। দেবীকান্ত, তুমি ফিরে চলো গড় নাসিমপুরে। হাতি ঘোড়া লোকলস্কর নিয়ে তুমি বিজয় গর্বে গড়ের তোরণ পেরিয়ে চলে আসবে মহলের মধ্যে। আমি প্রাণ ভরে দেখবো। ভাববো,—আমি যা বলেছিলাম তা—সত্যি হয়েছে।"

বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে চুপ করে রইলো দেবীকান্ত।

বজরার ভিতর থেকে সাড়া না পেয়ে বাইরের লোকটি আবার ডেকে বললো, "রাজাবাবু নৌকো এসে গেছে।"

দেবীকান্ত জিজ্ঞেস করলো, "ওদিকে খবর নিয়েছিস ?"

"হ্যাঁ। ওনার লোকজনেরা সব মন্দিরে অপেক্ষা করছে। ওনাদের খবর পাঠিয়েছি, আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি মা-ঠাকরুণকে নিয়ে।"

দেবীকান্ত উত্তরাকে বললো, "তোমাকে এবার ফিরে যেতে হবে উত্তরা।"

উত্তরা করুণ চোখ মেলে দেবীকান্তর দিকে তাকালো। বললো, "এক্ষুনি ?"

"হ্যাঁ। বেশী দেরি হলে ওরা সবাই ভাববে।"

"তুমিও চলো আমার সঙ্গে।"

"না, উত্তরা, আমাকে সঙ্গে যেতে বোলোনা।"

"কেন ?"

"আমি যাবো না।"

"কেন যাবে না তুমি ? বাবা, দেওয়ানকাকা, পিসীমা, সবাই তোমায় দেখলে খুশী হবে।"

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো দেবীকান্ত।

"না উত্তরা, আমার পক্ষে আর ওঁদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়।"

"কেন?" উত্তরা বিস্মিত হোলো দেবীকান্তর কথা শুনে।

"কারণ আছে। শোনো, তুমি কথা দাও আমায়, তুমি কাউকে কোনোদিন জানাবেনা যে, আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে।"

"তুমি সত্যিই আসবে না আমার সঙ্গে? তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না?"

দেবীকান্ত চুপ করে রইলো।

বাইরে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে কলস্বরে। ঢেউয়ের দোলায় বজরা দুলছে অল্প অল্প। নির্মেঘ আকাশে উড়ে গেল এক ঝাঁক পাখি। তাদের তীক্ষ্ণ কলস্বর পরিষ্কার শোনা গেল বজরার ভিতর থেকে।

সমস্ত পৃথিবী যেন স্তব্ধ হয়ে আছে এদের দুপাশে।

উত্তরার মুখ অন্ধকার হয়ে গেছে। চোখে পুঞ্জীভূত বেদনা, কিন্তু অশ্রু নেই এক ফোঁটাও।

দেবীকান্তর কানে ভেসে এলো উত্তরার কথাগুলো।

"তাহলে এই একবারের জন্যে আমাদের দেখা হওয়ার কি দরকার ছিলো? না হয় জলে ডুবেই মরতাম।"

"উত্তরা!"

উত্তরা কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়ালো, বললো, "হ্যাঁ, আমায় তো যেতে হবে এবার। অনেক দেরি হয়ে গেছে। সবাই ভাববে।"

"উত্তরা।"

"যাক, অনেকদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুশীই হয়েছি। তুমি সুখে আছো দেখে সত্যিই আনন্দ হচ্ছে। এর পর আর কোনোদিন তোমার কথা মনে পড়লে মনে কষ্ট হবে না। আগে সত্যিই ভাবতাম, কি জানি কোথায় কি অবস্থায় আছে

[illegible], কিভাবে দিন কাটছে তার। এখন তো আর সেকথা মনে হবে না।"

"উত্তরা!"

"কি?"

"তুমি একটা কথা জানো না। আমি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা আকাশের তারা গুনি, আজও।"

উত্তরা অন্যদিকে মুখ ফেরালো। তারপর বললো, "আজ থেকে আর গুনবার দরকার নেই দেবীকান্ত।"

"উত্তরা, শোনো—।"

"কি শুনবো? কি হবে শুনে?"

"তোমরা আর কদিন রাজমহলে আছো?"

"কেন?"

"আমি জানতে চাইছি।"

উত্তরা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর বললো, "আমরা চলে যাচ্ছি পূর্ণিমার পরদিন।"

"সে তো এখনো সাত আট দিন বাকী। আমার চলে যাওয়ার কথা কাল বিকেলে।"

"বেশ তো। যাওনা।"

"কিন্তু আমি যাচ্ছি না।"

"কেন?"

"তুমি যদ্দিন রাজমহলে আছো আমিও আছি।"

উত্তরা কোনো উত্তর দিলো না।

দেবীকান্ত বললো, "কাল সন্ধ্যেবেলা এসো লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দিরে। সেখানে দেখা হবে।"

বজরা থেকে নেমে উত্তরা নৌকোয় চাপলো। নৌকো এগিয়ে চললো মন্দিরের ঘাটের দিকে। বজরা ভেসে চললো অন্যদিকে।

উত্তরা একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো, দেবীকান্ত বজরার ভিতর থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

ইন্দ্রনারায়ণ, শিবশঙ্কর, সুরেশ্বরী সবাই বিচলিত হয়েছিলো উত্তরার দুর্ঘটনার খবর শুনে। এখবরও তাদের কাছে পৌঁছেছিলো যে নদীর মাঝখান দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলো কোনো এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির বজরা। বজরার মালিক উত্তরাকে জলে হাবুডুবু খেতে দেখে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করে নৌকোর ব্যবস্থা করে মন্দিরের ঘাটে পৌঁছে দিয়েছে।

"তিনি কোথায়?" ইন্দ্রনারায়ণ এসে জিজ্ঞেস করলো ললিতাকে।

"উনি তো আর আসেন নি। উত্তরা দিদি বজরা থেকে নেমে নৌকোয় উঠতে, ওঁর বজরা নিজের পথে চলে গেল।"

"কিন্তু কে উনি? নৌকোর মাঝিদের ওঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলে না?"

"ওরা বলতে পারলো না। বজরা থেকে একজন লোক গিয়ে নৌকো ডেকে এনেছিলো।"

"একা নৌকোয় পাঠিয়ে দিলো উত্তরাকে।"

"না, একজন লোক ছিলো সঙ্গে। নৌকো ঘাটে ভিড়বার পর নেমেও ছিলো নৌকো থেকে, কিন্তু পরে যে কোথায় গেল জানি না। ওই হৈ-চৈ হট্টগোলে ওর কথা আর কারো মনে ছিলো না।"

ইন্দ্রনারায়ণ প্রীত হোলো না একথা শুনে। বললো, "ওই অজ্ঞাত ব্যক্তির পরিচয় জেনে আসা উচিত ছিলো তোমাদের।"

উত্তরা শুয়ে ছিলো। ইন্দ্রনারায়ণ এসে জিজ্ঞেস করলো, "কে সেই সদাশয় ব্যক্তি, যিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমায় উদ্ধার করলেন? তিনি এলেন না কেন আমার কাছে? তাঁর কাছে যে আমার ঋণ কোনোদিনই শেষ হবার নয়।"

"ওঁকে বলেছিলাম," উত্তরা চোখ নামিয়ে বললো, "কিন্তু তিনি তোমায় ওঁর প্রণাম জানিয়ে বললেন, তাঁর অবসর নেই, তুমি যেন তাঁকে মার্জনা করো।"

"ওঁর নিবাস কোথায় ?

"সে কথা জিজ্ঞেস করিনি। আমি খুব অসুস্থ বোধ করছিলাম।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতো বটেই। সে অবস্থায় তোমার পক্ষে তো সম্ভব ছিলো না ওঁকে বেশী প্রশ্ন করা। কিন্তু লোকজন যারা গিয়েছিলো তোমার সঙ্গে, ওদের তো বুদ্ধি করে তাঁর পরিচয়, নিবাস ইত্যাদি বৃত্তান্ত জানবার চেষ্টা করা উচিত ছিলো। যাই হোক, এই অজ্ঞাত মহাশয় ব্যক্তির কথা আমাদের চিরকাল মনে থাকবে। ভগবান ওঁর মঙ্গল করুন।"

সংবাদ পেয়ে বাসুদেবও ছুটে এলো। একজন অপরিচিত পুরুষ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে উত্তরাকে বাঁচিয়েছে এখবর শুনে সে সুখী হয় নি। উত্তরার কাছে যাওয়ার আগে ললিতাকে ডেকে ভৎর্সনা করলো। বললো, "কেন ওকে সাবধান করে দাওনি আগের থেকে ? তোমাদের জানা উচিত ছিলো ঘাট যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে জল খুব গভীর।"

তারপর উত্তরার কাছে এসে প্রথমেই বললো, "একা একা গঙ্গাস্নানে যাওয়ার কী দরকার ছিলো ?"

উত্তরা বিরক্ত হোলো ওর কথার ধরনে। গম্ভীরভাবে উত্তর দিলো, "সে কৈফিয়ত তো আমি তোমাকে দেবো না।"

"রাগ করছো কেন," বাসুদেব গলার স্বর কোমল করে বললো, "তোমার জন্যে খুব ভাবনা হয়েছিলো বলেই তো একথা বলছি। যদি সত্যি সত্যি জলে ডুবে যেতে তো কি হোতো ? কাল থেকে আর গঙ্গা স্নানে যেতে হবে না।"

"সে আমি বুঝবো।"

উত্তরার গাম্ভীর্য গায়ে মাখলো না বাসুদেব। জিজ্ঞেস করলো, "যিনি তোমায় জল থেকে উদ্ধার করলেন তাঁর নাম কি?"

"তিনি আমায় তাঁর কোনো পরিচয় জানান নি।"

"পরে যদি কোনোদিন সাক্ষাৎ হয় নিশ্চয়ই তাঁর পরিচয় জেনে নেবে।"

"সাক্ষাৎ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকার কথা তো নয়।"

"যাই হোক,—আচ্ছা, উনি তরুণ বয়স্ক না পরিণত বয়স্ক?"

উত্তরা বিরক্তিভরে তাকালো বাসুদেবের দিকে। তারপর বললো, "বয়েস প্রায় তোমারই মতো।"

"নিশ্চয়ই খুব ধনবান ব্যক্তি?"

"দেখে তো তাই মনে হোলো।"

"উনি কি বজরায় একাই ছিলেন, না তাঁর পরিবারের অন্য মহিলারা ছিলো?"

উত্তরার রাগও হোলো, হাসিও পেলো। বললো, "আর কাউকে দেখিনি।"

বাসুদেব গম্ভীরবদনে বললো, "যদি ওঁর বজরায় অন্য কোনো স্ত্রীলোক না থাকে, তাহলে তোমাকে বজরায় তুলে নেওয়া ঠিক হয় নি।"

ব্যঙ্গের হাসি হেসে উত্তরা জিজ্ঞেস করলো, "জলে হাবুডুবু খেতে খেতে কি ওকে আমি জিজ্ঞেস করতাম, আপনার বজরায় অন্য স্ত্রী লোক আছেন কিনা? যদি না থাকেন, আমায় জল থেকে তুলবার দরকার নেই, আমি জলে ডুবে মরবো?"

"আমি ঠাট্টা করছিনা উত্তরা, আমি চৌধুরী পরিবারের সম্ভ্রমের কথা ভাবছি।"

"একজন আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়েছেন, এতে আমাদের পরিবারের অসম্ভ্রমের কি হোলো?"

"একজন অপরিচিত যুবাপুরুষ তোমাকে স্পর্শ করেছে, তোমাকে ধরে জল থেকে বজরায় তুলেছে, এসব তো—।"

"চুপ করো, আর বলতে হবে না," ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলো উত্তরা।

বাসুদেব কি যেন ভাবছিলো। বললো, "নিশ্চয়ই কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। তাঁর যখন নিজের বজরা আছে, তখন একটা পরিচয়ও নিশ্চয়ই আছে।"

উত্তরা কোনো উত্তর দিলো না।

বাসুদেব জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা উনি হিন্দু না মুসলমান?"

এই উদ্ধত প্রশ্ন শুনে উত্তরার মুখ লাল হয়ে গেল। বললো, "হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন, তিনি আমার জীবনদাতা, সুতরাং আমার প্রণম্য।"

বাসুদেব আরো কি যেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলো। উত্তরা বললো, "আমি খুব অসুস্থবোধ করছি বাসুদেব।"

সে তখন চুপচাপ উঠে চলে গেল গম্ভীর মুখ করে।

পরদিন সন্ধ্যায় লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে গেল উত্তরা। সঙ্গে নিলো শুধু ললিতাকে। তাকে সঙ্গে না নিয়ে উপায় ছিলোনা। সুরেশ্বরী আপত্তি করেছিলো। কিন্তু উত্তরা ইন্দ্রনারায়ণকে বোঝালো যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। এবং ঈশ্বর যে তাঁকে রক্ষা করেছেন সেজন্যে মন্দিরে পূজো দিতে চায় সে। ইন্দ্রনারায়ণ আপত্তি করলো না।

ললিতাকেও সঙ্গে না নিয়ে পারলেই ভালো হোতো। কিন্তু তাকে না নিয়ে একেবারে একা যাওয়া সম্ভব নয়। পালকি বাহক ও পাইকেরা মন্দিরের বাইরে অপেক্ষা করবে। সুতরাং ওদের চোখে কিছু হয়তো পড়বে না। কিন্তু ললিতার নজর এড়ানো সম্ভব নয়। তাকে কোথাও দাঁড় করিয়ে রেখে অন্যদিকে গেলে তার মনে প্রশ্ন

উঠবে। উত্তরা ভেবে স্থির করলো, ললিতাকে কিছু কিছু না জানিয়ে উপায় নেই। ললিতা তার অনেক দিনের পরিচারিকা, নিম্ন জাতীয়া হলেও তার সমবয়স্কা এবং মার্জিতভাষী বলে উত্তরার খানিকটা সখী স্থানীয়া হয়ে উঠেছিলো। উত্তরার বয়েস যখন আরো অনেক কম, তখন থেকেই একে নিযুক্ত করা হয়েছিলো উত্তরার সঙ্গিনী হিসেবে। বহুদিন ধরে একসঙ্গে আছে বলে তাদের মধ্যে একটা হৃদ্যতাও ছিলো। উত্তরার মনে হোলো, ললিতার বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করা যায়। সে নিশ্চয়ই বলে দেবে না কাউকে। তবে ললিতা চৌধুরীবাড়িতে এসেছিলো দেবীকান্ত চলে যাওয়ার পর। তাই দেবীকান্তকে সে কোনোদিন দেখেওনি, চিনতোও না—শুধু তার নাম শুনেছিলো মাত্র। উত্তরা স্থির করলো যে ললিতাকে শুধু দেবীকান্তর পরিচয় জানাবে না।

উত্তরা যখন মন্দিরে এসে উপস্থিত হোলো তখন আরতি হচ্ছে। অনেক লোকের ভিড়। মেয়েরা দাঁড়িয়েছিলো একটা পৃথক জায়গায় চিকের আড়ালে। চিকের ভিতর থেকে তাকিয়ে দেখলো উত্তরা। দেখতে পেলো ভিড়ের মধ্যে এক জায়গায় দেবীকান্ত দাঁড়িয়ে আছে।

আরতি শেষ হতে উত্তরা ললিতাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো নাটমন্দিরের সামনে। দেবীকান্তও বেরিয়ে এসে দেখতে পেলো তাকে। ললিতা দেখতে পেলো না, চোখে চোখে একটা ইসারা হয়ে গেল তাদের মধ্যে। দেবীকান্ত ঘুরে চলে গেল গঙ্গার ঘাটের দিকে।

একটু অপেক্ষা করে ললিতাকে নিয়ে উত্তরাও সেদিকে এগিয়ে গেল।

ঘাট থেকে একটু দূরে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিলো দেবীকান্ত। গাছের নিচে রাখা আছে শিব। ললিতাকে নিয়ে উত্তরা

সেখানে গেল প্রণাম করতে। প্রণাম করে উঠে দেখে পাশে দেবী-কান্ত দাঁড়িয়ে আছে।

উত্তরা দেবীকান্তকে বললো, "বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না। বাইরে পালকি দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে।"

দেবীকান্ত তাকালো ললিতার দিকে, তারপর উত্তরাকে বললো, "কে আছে তোমার সঙ্গে?"

উত্তরা হেসে বললো, "এর নাম ললিতা। আমার সঙ্গেই থাকে সব সময়।"

ললিতা বিস্মিত হয়েছিলো উত্তরাকে এক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বাক্যালাপ করতে দেখে। সে প্রশ্নঘন চোখে উত্তরার দিকে তাকালো।

উত্তরা বললো, "ইনিই আমায় কাল নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছেন।"

ললিতা অবনত হয়ে নমস্কার করলো দেবীকান্তকে। তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো একটা কৌতুকের হাসি।

কয়েক মুহূর্ত তিনজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর উত্তরা আস্তে আস্তে বললো, "ললিতা!"

ললিতা বুঝতে পারলো। তাড়াতাড়ি বললো, "আমি মন্দিরের ভিতর গিয়ে অপেক্ষা করছি।"

"হ্যাঁ, আমি আসছি এক্ষুনি," বললো উত্তরা।

ললিতা চলে আসছিলো, দেবীকান্ত তাকে ডাকলো পেছন থেকে। সে ফিরে দাঁড়ালো। জামাহর জেব থেকে তিন চারটি আশরফি বার করলো দেবীকান্ত, ললিতার হাতে দিয়ে বললো, "এগুলো তোমার। এর থেকে তোমার পছন্দ মতো কোনো গয়না গড়িয়ে নিয়ো।"

ললিতা হাসি মুখে আবার নমস্কার করলো অবনত হয়ে, তার পর চলে গেল।

ও চলে যাওয়ার পর দেবীকান্ত বললো, "চলো, আমরা ওদিকে একটু নিরালায় গিয়ে দাঁড়াই। এখানে অনেক লোক যাওয়া আসা করছে।"

আস্তে আস্তে একটি গাছের আড়ালে সরে এলো ওরা দুজন। সেখানে কিছু ঝোপঝাড়ের আড়াল আছে। শুক্লা একাদশীর চাঁদ দেখা দিয়েছে পূব দিগন্তে! সামনে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে কলস্বরে।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলো। তারপর উত্তরা বললো, "দেবীকান্ত, পরে যদি আমাদের আর দেখা হওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে আজ এই একদিনের জন্যে দেখা নাই বা হোতো। কাল একবার দেখা হয়েছিলো এত বছর পরে, সেকথা ভেবে কয়েক দিন খুব খুশী থাকতাম, তারপর ভুলে যেতাম।"

"ভুলে যেতে পারতে?" দেবীকান্ত জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ।"

"আমি পারতাম না।"

উত্তরা ম্লান হাসি হেসে বললো, "মনে রেখে আর কিই বা লাভ, দেখা যখন আর হবেই না—।"

দেবীকান্ত মাথা নাড়লো। "না উত্তরা, কাল মনে সংশয় ছিলো, তাই ওকথা বলেছিলাম। আজ আর সে কথা বলতে পারবো না।"

"সংশয়? কেন, কিসের সংশয়?"

"সেকথা তোমায় আমি আজ বোঝাতে পারবো না। তাহলে অনেক কথা বলতে হয়। সংক্ষেপে এটুকু বলতে পারি,—আমার জীবনযাত্রার ধরনটা যেরকম, তাতে পুরোনো দিনের চেনাজানা লোকেদের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কাল যখন তোমার সঙ্গে আবার দেখা হোলো, তখন কি রকম একটা ওলটপালট হয়ে গেল মনের মধ্যে। আজ এত

বছর কেটে গেছে, প্রত্যেকটি দিন তোমার কথা ভেবেছি। তুমি কাছে নেই অথচ আমার মন একটি দিনও তোমার কাছে-ছাড়া হয়নি। কাল ভাবলাম, আবার যখন দেখা হোলো, এর পর কি আর তোমাকে চোখের আড়াল করে থাকতে পারবো? অথচ প্রকাশ্যে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তোমায় একথা কি করে বলি যে, যখনই দেখা করবো তোমার সঙ্গে, সেই দেখা-হওয়াটা হবে অত্যন্ত গোপনে। তুমি কেন রাজী হবে তাতে? আর রাজী হলেও, তোমার সুযোগ কোথায়? তুমি রাজা ইন্দ্রনারায়ণের কন্যা, গড় নাসিমপুরের বাইরে আসা তো তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তোমায় বলেছিলাম, আমাদের আর দেখা হবে না।"

উত্তরা মুখ নিচু করে একটু হাসলো, জিজ্ঞেস করলো, "আজ কি সেকথা তোমার মনে হচ্ছে না?"

"না।"

"কেন?"

"কাল ভেবেছিলাম কষ্টটা হবে আমার একলার। সুতরাং সয়ে যাবো সেই কষ্ট। তুমি চলে যাওয়ার পর বুঝলাম, কষ্টটা তোমারও কম হবে না। তোমার কষ্ট আমার সইবে না। তাই বলছি, তোমার সঙ্গে আমার দেখা আরো হবে, তার উপায়ও করতে হবে। কিন্তু তুমি কি পারবে?"

"হ্যাঁ, পারবো।"

"তুমি তো বেশ সহজভাবে বলতে পারলে।" দেবীকান্ত হাসলো।

"হ্যাঁ, পারলাম তো।"

"কি করে পারলে, তাই ভাবছি।"

উত্তরা চোখ তুলে তাকালো দেবীকান্তর দিকে। তারপর খুব আস্তে আস্তে বললো, "আমাদের দুজনার কাউকে কিছু বলার কি

বাকী আছে ? খুব তো সহজ ভাবে বুঝে নিলে সব কিছু, মুখ ফুটে বলার দরকার হোলো না।"

দেবীকান্ত তাকালো পূব দিগন্তের চাঁদের দিকে, তারপর উত্তর দিলো, "মনে মনে এতদিন ধরে এতবার এত কথা বলা হয়ে গেছে যে, দেখা হওয়ার পর নতুন করে আর কিছু বলতে হোলো না। তুমি আমার দিকে তাকালে, আমি তাকালাম তোমার দিকে, ব্যস, যা বলার সব বলা হয়ে গেল।"

উত্তরা দেবীকান্তর হাত ধরলো।

"দেবীকান্ত!"

"কি ?"

"একটা কথা বলবো ?"

"বলো।"

"আমাকে নিয়ে চলো তোমার সঙ্গে।"

"তুমি যাবে ?"

"হ্যাঁ।"

"সব কিছু ছাড়বে আমার জন্যে ?"

"হ্যাঁ, শুধু তোমার জন্যে।"

দেবীকান্ত চুপ করে ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো "বেশ, তোমায় নিয়ে যাবো আমার সঙ্গে। তবে এখন নয়।"

"কবে নিয়ে যাবে দেবীকান্ত ?"

"সময় আসুক। বলবো তোমায়।"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো দুজনে। তারপর উত্তরা বললো, "আমায় তো যেতে হবে এখন।"

"হ্যাঁ, বেশী দেরি করা ঠিক হবে না।"

"আবার কখন দেখা হবে দেবীকান্ত ?"

"কাল।"

"এখানেই ?"

"হ্যা, এরকম সময়। আমি অপেক্ষা করবো তোমার জন্যে।"

উত্তরাকে মন্দিরের ভিতর পৌঁছে দিয়ে দেবীকান্ত চলে গেল।

ললিতা অপেক্ষা করছিলো উত্তরার জন্যে। উত্তরা ফিরে আসতে সে শুধু একটু হাসলো। তারপর দুজনে নিঃশব্দে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে পালকিতে উঠে বসলো।

তারপরদিন দুপুরবেলা উত্তরা ললিতাকে দেখালো একটি সোনার হার। জিজ্ঞেস করলো, "এটি পছন্দ হয়?"

ললিতা খুশী হয়ে হাত বাড়িয়ে হারটি নিলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, ওঁর নাম কি, দিদি?"

উত্তরা হেসে বললো, "ওঁর নাম যে আমার মুখে আনতে নেই, ললিতা।"

ললিতা অবাক হয়ে তাকালো উত্তরার দিকে। মুখে ফুটে উঠলো একটা আনন্দের আভাস। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু রাজামশায়, দেওয়ান-মশায় এরা জানতে পারলে অসন্তুষ্ট হবেন না তো?"

"জানতে পারলে মোটেও অসন্তুষ্ট হবেন না," উত্তরা উত্তর দিলো, "কিন্তু এখনই জানতে দিতে চাই না।"

ললিতা চুপ করে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলো, "উনি কোথাকার জমিদার, দিদি?"

"সময় হলে জানতে পারবি সবই," উত্তরা একটু গম্ভীর হয়ে বললো।

ললিতা আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস করলো না। উত্তরার গাম্ভীর্যকে ভয় পায় সবাই।

দেবীকান্তর রাজমহল ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা, কিন্তু সে থেকে গেল উত্তরা চলে না যাওয়া অবধি।

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা আরতির সময় লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দিরে

আস্তো উত্তরা। শুধু ললিতা আসতো সঙ্গে। পালকিবাহক ও পাইক-পিয়াদারা অপেক্ষা করতো মন্দিরের বাইরে। উত্তরা ললিতাকে নিয়ে মন্দিরের ভিতর ঢুকতো। ললিতা অপেক্ষা করতো মন্দিরের ভিতর। উত্তরা মন্দিরের পেছন দিকে গঙ্গার ঘাটে যেতো দেবীকান্তর সঙ্গে দেখা করতে। বেশীক্ষণ থাকতে পারতো না। আরতি শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে ফিরে আসতে হোতো। তবু সেই অল্প কিছুক্ষণের সাক্ষাতেই মনটা পরিপূর্ণ হয়ে থাকতো সারা রাত ধরে।

চোখে ঘুম আসতো না। নিশি পুষ্পের হাল্কা গন্ধে ভরে যেতো সারা ঘর। বাইরে কখনো কখনো শোনা যেতো গাছের শাখায় শাখায় উত্তুরী হাওয়ার অশান্ত দাপাদাপি। সারা শহর ছেয়ে নিঝুম হয়ে থাকতো শীতের রাত। শুধু বিছানার উপর একলা জেগে থাকতো উত্তরা।

তারপর দিন সকাল থেকে আবার সন্ধ্যার অধৈর্য প্রতীক্ষা।

তিনচার দিন পরে শোনা গেল রাজমহল ছেড়ে রওনা হতে হবে পঞ্চমীর দিন।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণের মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় সামনে বসে থাকতো উত্তরা। এটা তার অনেকদিনের রেওয়াজ।

সেদিন রাজা ইন্দ্রনারায়ণ যখন ভোজনে বসলো, উত্তরা জিজ্ঞেস করলো, "বাবা, আমরা কি শিগগিরই গড় নাসিমপুর ফিরে যাচ্ছি?"

"হ্যাঁ। পঞ্চমীর দিনে উষাকালে রওনা হবো।"

"এত তাড়াতাড়ি কেন ফিরে যাচ্ছি বাবা? এখানকার কাজ কি সব শেষ হয়েছে?"

"না। তবে আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। শিব শঙ্কর এখানে থাকবে। বাসুদেব তো আছেই। ওরাই শাহজাদার

দরবারে হাজিরা দেবে প্রত্যেকদিন। কাজ হলে পরে শিবশঙ্কর ফিরে যাবে।"

"তাহলে আমরা কেন তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছি বাবা?"

"আমার তো আরো কয়েকদিন থাকবার ইচ্ছে ছিলো। প্রয়োজনও ছিলো। কিন্তু যা শুনছি, মনে হচ্ছে, তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়াই ভালো।

দিনকাল ভালো নয়। দিনকে দিন অবস্থা খারাপ হচ্ছে। জলপথে যাতায়াত করা রীতিমতো বিপজ্জনক হয়ে উঠবে আর কয়েকদিনের মধ্যে। এখনো খুব নিরাপদ নয়।"

"কেন বাবা?"

"এদিকে খুব ডাকাতি হচ্ছে আজকাল।"

"শহরের এত কাছে? মোগল নওয়ারা গঙ্গায় টহল দেয় না?"

"ওদের সময় কোথায়? সবাই এখন আওরংজেব ও দারার সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। এখন ডাকাতের পেছনে তাড়া করে বেড়ানোর অবসর কারো নেই।"

"কারা ডাকাতি করছে, বাবা?"

"সেই ভুজঙ্গ হালদারের দল।"

"ওরে বাবা!" একটু শিউরে উঠলো উত্তরা। ভুজঙ্গ হালদার এক নামে পরিচিত। তার নাম শুনলে অভিজাত সমাজের স্ত্রী-পুরুষ সবারই গায়ে কাঁটা দেয়।

"কিন্তু শুনেছিলাম, ভুজঙ্গ ঠাকুর এখন এদিকে নেই, সে দক্ষিণে গেছে?" উত্তরা বললো।

"হ্যাঁ, সে এদিকে নেই বলেই সবার ধারণা। একটা বড়ো দল নিয়ে সে গেছে দক্ষিণে, মগদের সঙ্গে আলোচনা করতে।"

"কিসের আলোচনা বাবা?"

"শাহ শুজার হয়ে মগদের সঙ্গে একটা রফার কথা বলতে। যদ্দূর শুনেছি শাহ শুজার ইচ্ছে মগ ফিরিঙ্গি ও এদেশী জলদস্যুদের

একটা দল গঙ্গা দিয়ে উত্তরে পাঠিয়ে দারার ফৌজের রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা নষ্ট করে দেওয়া। স্বয়ং শাহ শুজা এদের সহায়তা চাইছে বলে, এদের আস্পর্ধা ও সাহস ভয়ানক বেড়ে গেছে। ভুজঙ্গ হালদারের দলের একটা অংশ এদিকে নির্ভয়ে নির্বিবাদে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে। শোনা যাচ্ছে এদের নেতৃত্ব করছে ভুজঙ্গ হালদারের এক পালিত পুত্র।"

ইন্দ্রনারায়ণ বলে যাচ্ছিলো আরো অনেক কথা। কিন্তু উত্তরা যেন আনমনা হয়ে গেল। কোনো কথাই গেল না তার কানে।

বাসুদেব আসতো প্রত্যেকদিনই। দরবারের নানারকম গল্প বলে চমৎকৃত করতে চাইতো সবাইকে, বিশেষ করে উত্তরাকে।

কিন্তু উত্তরা তাকে আমল দিতো না একেবারেই।

সেদিনও অপরাহ্ণে সে এসে উপস্থিত হোলো।

তার সাজ পোশাকের ঘটা খুব। পরনে তার তখনকার মোগল মনসবদারদের বেশ,—চুড়িদার পাজামা আর জামাহ, শুধু হিন্দু রীতিতে জামাহ্‌র বন্ধনী বাঁ-দিকে। মাথায় রঙীন পাগ, তার সামনে শোভা পাচ্ছে বড় গোমেদখচিত একটি কলগী। কোমর-বন্ধের একপাশে রুপোর কাজ করা হাতলওয়ালা একটি ছোটো কাটারি, ডানদিকে বাঁকা তলোয়ার। পায় লাল চামড়ার পয়জার। হাতের কব্জিতে সবুজ রেশমের রুমালি জড়ানো। বাদামী রঙের ঘোড়ায় চড়ে টগবগিয়ে আসে। সঙ্গে থাকে দুজন সিলাহদার।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণ বললো, "তোমার পাগএর কলগী তো ভারী সুন্দর!"

"এটি শাহ শুজা নিজে আমায় উপহার দিয়েছে। সেবার ওঁর সঙ্গে কামারগাহতে গিয়েছিলাম আলমপুরের জঙ্গলে। একটি চিতে বাঘের পিছু নিয়েছিলাম আমরা চারজন, স্বয়ং শাহ শুজা,

সুলতান বুলন্দ আখতার, সয়িদ আলম আর আমি। চিতে বাঘটা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো সয়িদ আলমের ঘোড়ার উপর। আমিই ছিলাম কাছে। হাতে ছিলো বর্শা। তাই দিয়ে চিতে বাঘের পেট এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলাম। তখন শাহ শুজা নিজের হাতে এটা আমার পাগএ পড়িয়ে দিলেন। বললেন, তোমার মতো লোক এদ্দিন হিসাব দফতরে পড়েছিলে কেন? আমি জানলে অনেক আগেই তোমাকে ফৌজে মনসব দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করতাম। কাল থেকে তোমার মনসব আরো একশো ঘোড়া বাড়িয়ে দেওয়া হোলো।"

"তুমি একা একটি বর্শা দিয়ে চিতে বাঘ শিকার করলে?" রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চক্ষু বিস্ফারিত করে বললো।

"চিতে বাঘ শিকার করা তো এমন কিছু নয়। যে কোনো সাধারণ শিকারীই পারে। মাস তিনেক আগে পিলখানার একটি হাতি হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো। কেউ দরবারের দিকে এগোতে পারে না। আমি জানতাম না। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলাম। সেদিন রিসালার কুচকাওয়াজ হবে। হঠাৎ দেখি পাগলা হাতি ছুটে আসছে আমার দিকে। আমার ঘোড়া ভয় পেয়ে আচমকা লাফিয়ে উঠলো। আমি প্রস্তুত ছিলাম না। পড়ে গেলাম ঘোড়া থেকে। কিন্তু পালাবার উপায় নেই? হাতি কাছে এসে পড়েছে। অগত্যা তলোয়ার খুলে রুখে দাঁড়াতে হোলো। কাছে আসতেই তলোয়ারের এক কোপে হাতির শুঁড় কেটে ফেললাম? হাতি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে পড়লো গঙ্গার জলে।"

"তুমি তো খুব বাহাদুর লোক, বাসুদেব," ইন্দ্রনারায়ণ বলে উঠলো।

"রাজমহলে যদি আরো কিছুদিন থাকেন তো আমার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনতে পারবেন লোকের মুখে। আমি আর নিজের

মুখে কী বলবো," বলে বাসুদেব তাকালো উত্তরার দিকে। দেখলো উত্তরা আনমনে কি যেন ভাবছে।

"থাক বাবা, আর বলে কাজ নেই," বলে উঠলো সুরেশ্বরী, "যা বলেছিস তাই শুনে আমার বুক টিপ টিপ করছে। সব সময় ওরকম গোঁয়ার্তুমি করতে যাস না বাবা।"

"পিসীমা, কি যে বলো! আমরা ফৌজের লোক, মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের সব সময় মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়।"

"সুলতান বুলন্দ আখতারের সেই ঘটনাটা বলো," বললো দেওয়ান শিবশঙ্কর।

"ওটা বলার মতো কিছু নয়। কিলিচ খাঁর ছেলে মহম্মদ তাহির একদিন দরবার সমাপ্ত হবার পর মনসুর হোসেনকে বলছিলো শাহ-ই-আলিজা দারা শিকোর ছেলে সুলেমান শিকোর মধ্যে সত্যিকারের পৌরুষ আছে। কিন্তু সুলতান শাহ শুজার ছেলেকে দেখলে হারেমের খোজা বলে ভুল হয়। সুলতান বুলন্দ আখতার কথাটা শুনতে পেলো। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার খুলে সে এগিয়ে গেল মনসুর হোসেনের দিকে। মহম্মদ তাহিরও তলোয়ার বার করলো খাপ থেকে। তখন আমি এগিয়ে গিয়ে সুলতান বুলন্দ আখতারকে বললাম,—আলিজা, আপনি স্বয়ং সুলতান শাহ শুজার পুত্র, শাহ-ই-আলিজার এক মনসবদারের পুত্রের সঙ্গে আপনি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন, আপনার এই বান্দা হাজির থাকতে? আপনার মোকাবিলা হবে সুলতান সুলেমান শিকোর সঙ্গে। এই পাজী মহম্মদ তাহিরের সঙ্গে মোকাবিলা হোক আমার। ওর সঙ্গে অসিযুদ্ধ হোলো কয়েক মুহূর্ত। তারই মধ্যে তার কব্জি এমন জখম হোলো যে তলোয়ার পড়ে গেল হাত থেকে। দরবারের উচ্চপদস্থ মনসবদারেরা এসে তাড়াতাড়ি আমাদের থামিয়ে দিলো। সুলতান বুলন্দ আখতার আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো,—তুমি আমার মান

রেখেছো, আজ থেকে তুমি আমার ভাই। সব সময় থাকবে আমার সঙ্গে সঙ্গে।”

শিবশঙ্কর বললো, “শুনছি শাহ শুজা আগ্রার তখত্ অধিকার করবার পর, বুলন্দ আখতারই হবে সুবা বাংলার সুবাদার।”

উত্তরা হেসে জিজ্ঞেস করলো, “তখন কি সুবা বাংলার দেওয়ান হবে আমাদের বাসুদেব মজুমদার?”

বাসুদেবের মুখ লাল হয়ে গেল। উত্তর দিলো, “কার ভাগ্য কখন কিভাবে ফেরে বলা যায় না! শাহ শুজার ফৌজের সঙ্গে পাটনা রওনা হচ্ছি কিছুদিনের মধ্যেই। যখন ফিরবো কে বলতে পারে যে দু হাজার কি তিন হাজার ঘোড়ার মনসব আমি পাবো না।”

“তা তো বটেই, তা তো বটেই,” বলে উঠলো রাজা ইন্দ্রনারায়ণ। “হাজারের উপরের হিন্দু মনসবদার তো প্রায় সবাই রাজপুত। বাংলা থেকে মনসবদার হয়েছে দু-তিনজন মাত্র। তুমি যেভাবে উন্নতি করছো, আমার তো ভালোই লাগছে।”

“তুমি রাজা হও বাবা,” সুরেশ্বরীবললো।

আরো কিছুক্ষণ নানারকম আত্মপ্রশংসাসূচক সংলাপের পর বাসুদেব বললো, “ভাবছি, আজ সন্ধ্যায় সবাই মিলে গঙ্গায় বেড়ালে কেমন হয়। বজরার মাঝিদের খবর দিই সব ব্যবস্থা করতে।”

“শুনছি খুব ডাকাতি হচ্ছে আজকাল,” ইন্দ্রনারায়ণ বললো—।

“আমি থাকতে কিসের ভয়,” আশ্বাস দিলো বাসুদেব। “সুলতান বুলন্দ আখতারের প্রিয়পাত্র মনসবদার বাসুদেব মজুমদার যে বজরায় থাকবে, সে বজরায় ডাকাত আসবে না, এমন কি স্বয়ং ভুজঙ্গ হালদারও নয়। তাছাড়া শহরের ধারে কাছে ডাকাতি হয় না। যা কিছু হয় একটু দূরে দূরে! ওদের কি এত সাহস! আমরা আছি কেন?”

"পরশুদিন তো গঙ্গার মাঝখানেই একটা ডাকাতি হয়ে গেল," বললো রাজা ইন্দ্রনারায়ণ।

"ওটা এমন কিছু নয়। একটি ছোটো নৌকায় কয়েকজন নিরস্ত্র যাত্রীকে পেয়ে কতকগুলো দুষ্টপ্রকৃতির লোক একটুখানি হামলা করেছে। গড় নাসিমপুরের রাজার বজরার ধারে কাছে কেউ আসতে সাহস করবে না।"

"যাই হোক, সন্ধ্যায় বজরায় বেড়াবার কি দরকার, কাল পরশু একদিন দিনের বেলা বেড়ালেই চলবে," বললো দেওয়ান শিব শঙ্কর।

"গঙ্গা থেকে রাজমহলের শোভা যদি উপভোগ করতে হয় তো শুক্লপক্ষের চাঁদনী রাতে সন্ধ্যার পরই সব চাইতে ভালো সময়। আপনি, বাবা, পিসীমা, উত্তরা, আমি,—সবাই মিলে বেশ উপভোগ করা যাবে। রাজমহলে এই সময়টা খুব ভালো।"

"আমি তো যাবো না," উত্তরা বললো।

"কেন?"

"আমি সন্ধ্যেবেলা আরতি দেখতে যাই লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দিরে।"

"একদিন নাই বা গেলে।"

"না, ওখানেই আমার ভালো লাগে। বজরায় চড়ে বেড়ানোর শখ আমার নেই!"

বাসুদেব একটু তাকিয়ে দেখলো উত্তরার দিকে। তারপর বললো, "আচ্ছা, তুমি না হয় মন্দিরেই গেলে। আরতির পর তোমাকে বজরায় তুলে নেওয়া হবে মন্দিরের ঘাটের ওখান থেকে। সেখানে একটি নৌকোর ব্যবস্থা করে রাখবো। তোমায় নিয়ে আসবে।"

"না," বললো উত্তরা, "সন্ধ্যের পর বড্ড ক্লান্তি অনুভব করি। আমি মন্দির থেকে সোজা বাড়িই ফিরে আসবো।"

বাসুদেবের চোখ দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত হোলো।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণ বললো, "এবার থাক। আরেকবার যখন আসবো তখন দেখা যাবে। আজকাল হিম পড়ে সন্ধ্যের পর। আমার পক্ষে তখন বাইরে বেরোনো ঠিক নয়।"

বাসুদেব আর কিছু বললো না।

সন্ধ্যে হয়ে এলো। ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে পালকিতে চাপলো উত্তরা। হঠাৎ চোখে পড়লো দূরে একটি থামের পাশে দাড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছে বাসুদেব। চোখে তার একটা অদ্ভুত দৃষ্টি।

উত্তরা মুখ ফিরিয়ে নিলো।

"তাহলে তোমরা গড় নাসিমপুর ফিরে যাচ্ছো?" দেবীকান্ত জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ।"

"কবে রওনা হোচ্ছো?"

"পঞ্চমীর দিন সকাল বেলা।"

দুজনে চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ।

"উত্তরা!" একটু পরে ডাকলো দেবীকান্ত।

"কি?"

"কি ভাবছো?"

উত্তরা হাসলো। বললো, "তুমি যা ভাবছো, আমিও তাই ভাবছি।" হেসে ফেললো দেবীকান্তও। বলে উঠলো, "এই কটা দিন কি রকম একটা স্বপ্নের মতো কেটে গেল, শেষ রাত্তিরের একটা ভারী মিষ্টি স্বপ্ন।"

"এর পর?" জিজ্ঞেস করলো উত্তরা।

"প্রত্যেকদিন দেখা হওয়ার সুযোগ তো আর হবে না।"

"কিন্তু দেখা একেবারে না হলেও তো চলবে না।"

"তুমি বলো, কি উপায় করা যায়। সব কিছু তোমার সুযোগ সুবিধের উপর নির্ভর করছে," দেবীকান্ত বললো।

উত্তরা একটু ভাবলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তুমি গড় নাসিমপুরের কাছাকাছি আসতে পারবে?"

"তোমার জন্যে সবই পারবো,—শুধু গড় নাসিমপুরের ভেতরে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।"

উত্তরা আবার ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, "শোনো। অম্বিকাপুর গ্রাম চেনো তো?"

"হ্যাঁ। গড় নাসিমপুর থেকে দুক্রোশ উত্তরে, ঠিক গঙ্গার ধারে।"

"সেখানে আছে অষ্টভুজা দেবীর মন্দির।"

"হ্যাঁ, চিনি।"

"অষ্টভুজা জাগ্রত দেবী, আশপাশের দশখানা গ্রাম থেকে লোকে পূজো দিতে আসে।"

"তাও জানি।"

"আমি ওখানে যাই মাঝে মাঝে।"

"সেখানে তুমি কখন আসবে বলো।"

"প্রত্যেক শুক্লা চতুর্দশীর দিন সকাল বেলা আমি যাবো সেখানে। তুমিও এসো।"

"সকাল বেলা?" দেবীকান্ত একটু চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"অন্য সময় যাওয়া তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সকাল বেলা স্নান করে পালকিতে উঠবো। পৌঁছে যাবো প্রথম প্রহরের মধ্যেই।"

"বেশ। শুক্লা চতুর্দশীর দিন আমি আসবো।"

কথায় কথায় কেটে গেল দু-দণ্ড সময়, মনে হোলো যেন চোখের পলক ফেলারও অবকাশ হোলো না। উত্তরার যাওয়ার সময়

হোলো, দুজন দুজনের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। সজল হয়ে উঠলো উত্তরার চোখ দুটো।

"আসবে তো?" উত্তরা জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবো।"

উত্তরা বিদায় নিয়ে মন্দিরে ফিরে গেল। দেবীকান্ত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো উত্তরার যাওয়ার পথের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে একটি নৌকোয় চড়ে বসলো।

নৌকোটি আস্তে আস্তে মিশে গেল সন্ধ্যায় কুয়াশায়।

একটি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একজন। সন্ধ্যার আবছায়ায় তার মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। সে তাকিয়ে রইলো অপসৃয়মান নৌকোর দিকে, তারপর শিস দিয়ে ডাকলো একজনকে। সেও একটি গাছের ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালো।

প্রথম জন বললো, "ওই লোকটির সম্বন্ধে খোঁজ নাও।"

"কে ওই লোকটি?" জিজ্ঞেস করলো অন্যজন।

"ওর যে পরিচয় আমি জানি, সে পরিচয়ে হয়তো কেউ ওকে আজকাল আর চেনে না। এখন ওর কি পরিচয়, কোথায় ওর নিবাস, কি ওর বৃত্তি, সব খবর আমার চাই।"

ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে উত্তরা গড় নাসিমপুরে ফিরে এলো। শিব শঙ্কর কিছুদিনের জন্যে থেকে গেল রাজমহলে। বাসুদেব শিগগির পাটনা রওনা হবে শাহ শুজার ফৌজের সঙ্গে।

প্রত্যেক শুক্লা চতুর্দশীর দিন সকালবেলা উত্তরা পূজো দিতে যেতো গড় নাসিমপুর থেকে দু ক্রোশ দূরে গঙ্গার ধারে অম্বিকাপুর গ্রামের অষ্টভুজা দেবীর মন্দিরে। সেখানে আসতো দেবীকান্তও।

উত্তরা সারাটা মাস উৎকণ্ঠ হয়ে সেই দিনটির প্রতীক্ষা করতো। সে একদিন বলেছিলো কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর দিনও সে আসতে পারে।

কিন্তু তাকে নিবৃত্ত করলো দেবীকান্ত। বললো, "এমনিতেই তুমি অনেক ঝুঁকি নিয়ে আসছো মাসে একবার। মাসে ছুবার আসতে তোমার অসুবিধে হবে। তাছাড়া আমাকেও নানা কাজে বিভিন্ন পরগণায় ঘুরে বেড়াতে হয়। পনেরো দিন পর পর এখানে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

"কিন্তু এমনি করে কতোদিন চলবে?" উত্তরা জিজ্ঞেস করলো।

দেবীকান্ত কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর উত্তর দিলো, "এখন দেশে বড়ো গোলমাল। পরিস্থিতি একটু শান্ত হোক। শাহ শুজা তো ফৌজ নিয়ে শাহজাদা দারার মোকাবিলা করতে আগ্রার উদ্দেশে রওনা হয়েছে। ওদিকে শুনছি দাক্ষিণাত্য থেকে শাহজাদা আওরংজেব আর মুরাদ ও এগিয়ে আসছে আগ্রার দিকে। দেখি কি হয়। এ যুদ্ধের ফলাফলের উপর আমাদের অনেক কিছু নির্ভর করছে।"

"যুদ্ধ কদ্দিন চলবে কে জানে।"

"বছর খানেকের মধ্যেই একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।"

"তদ্দিন অপেক্ষা করতে হবে আমাকে?" উত্তরা করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

"এক বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে উত্তরা।"

দেখতে দেখতে কয়েক মাস কেটে গেল।

খজওয়ার যুদ্ধে হেরে রাজমহলে ফিরে এলো শাহ শুজা। সেই সঙ্গে ফিরে এলো বাসুদেবও। সে রাজমহলে আর থাকলো না, সোজা ফিরে এলো একেবারে গড় নাসিমপুরে।

লোকে বলাবলি করতে লাগলো, বাসুদেব মজুমদার নাকি পালিয়ে এসেছে। শাহ শুজা আওরংজেবের ফৌজের কাছে ক্রমাগত হেরে যাচ্ছে বলে বাসুদেব সরে পড়েছে শাহ শুজার ফৌজ থেকে।

বাসুদেব ফিরে আসার পর উত্তরার ভাবনা হয়েছিলো, সে যদি আবার তাকে উত্যক্ত করতে শুরু করে। কিন্তু তেমন কোন ভাব দেখা গেল না তার মধ্যে। সে খুব সহজভাবেই মিশতো উত্তরার সঙ্গে। কোনো রকম বিসদৃশ ব্যবহার দেখা গেল না তার হাব ভাবের মধ্যে। তবে মাঝে মাঝে উত্তরার মনে হোতো কি রকম যেন একটা কুটিলতায় বিষাক্ত হয়ে উঠতো তার দৃষ্টি। উত্তরার একটু ভয় ভয় করতো।

বাসুদেব গড় নাসিমপুরেই বড়ো হয়েছে ছেলেবেলা থেকে, তাই সে মহলের সর্বত্র অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারতো। কিন্তু উত্তরার কাছে সে বেশী আসতো না ইদানীং, এলেও বেশীক্ষণ থাকতো না, সাধারণ কথাবার্তা ছাড়া আর কিছু বলতোও না। এবার বরং দেখা গেল সে বেশী মাখামাখি করছে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে। শাহ শুজার মির বকশি সয়িদ আলমের প্রিয়পাত্র বলে তার খাতির এবার অনেক বেশী।

চারদিকে গোলমাল আরো বেড়ে উঠেছে। মির জুমলার সেনাবাহিনী মুঙ্গের থেকে দক্ষিণ-পূব দিকে ঘুরে সুরীতে এসে ঘাঁটি বসিয়েছিলো। শুজা ঘাঁটি বসিয়েছিলো গৌড়ের দুক্রোশ পশ্চিমে তণ্ডায়। ইসলাম খাঁ ও জুলফিকর খাঁর সঙ্গে দোগাছিতে ঘাঁটি বসিয়েছিলো আওরংজেবের পুত্র মহম্মদ সুলতান। উনিশশো উনষাট খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকাল কেটে গিয়েছিলো দুপক্ষের অবিরাম সংগ্রামে। জুন মাসে শুজার কাছে পালিয়ে গিয়েছিলো মহম্মদ সুলতান। কিন্তু তাতে শুজার কোনো সুবিধে হয়নি। রাজমহল চলে গিয়েছিলো মির জুমলার দখলে।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি বাসুদেব গড় নাসিমপুর থেকে চৌকি মিরদাদপুরে গিয়েছিলো শাহ শুজার ছাউনিতে। তারপর ফাল্গুনের আরম্ভে আবার ফিরে এলো গড় নাসিমপুরে।

শুজার নওয়ারা ও দেশী জলদস্যুরা বার বার বিপর্যস্ত করছিলো

মোগল ফৌজের রসদ সরবরাহ। একাজে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলো ভুজঙ্গ ঠাকুরের দল। কিন্তু মিরজুমলাকে রুখে রাখা গেল না।

বাসুদেব যখন চৌকি মিরদাদপুরে গিয়েছিলো, তখনই শোনা গিয়েছিলো মহম্মদ সুলতান শুজার পক্ষ ত্যাগ করে দোগাছিতে মির জুমলার কাছে ফিরে গেছে। বাসুদেব গড় নাসিমপুরে ফিরে আসবার পর, শোনা গেল মির জুমলা মালদহ দখল করেছে।

হৈ চৈ পড়ে গেল চারদিকে। শোনা গেল, শুজার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, শুজা ঢাকায় চলে যাওয়ার উপক্রম করছে।

বাসুদেবের ভাবগতিক খুব রহস্যময়। 'সে আর গড় নাসিমপুর থেকে বেরোয় না। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে মোগল হরকরা। বলা হয় এরা শুজার পক্ষ ত্যাগ করে মির জুমলার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। শুজার উমরাহ অলাওয়ার্দি খাঁ শুজার পক্ষ ত্যাগ করে মির জুমলার সঙ্গে যোগ দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলো বলে তাকে কোতল করা হয়েছিলো। এমন একটা গুজব শোনা গেল যে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে বাসুদেবও ছিলো, কিন্তু বেঁচে গেছে সয়িদ আলমের অনুগ্রহে।

মহম্মদ সুলতান দোগাছি থেকে শুজার কাছে পালিয়ে আসার সময় তাকে সাহায্য করেছিলো ভুজঙ্গ ঠাকুরের দলের লোকেরা। এবং তাকে শুজার পক্ষ ত্যাগ করিয়ে মিরজুমলার কাছে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে তাকে ঘিরে যে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার হয়েছিলো, তাতে নাকি লিপ্ত ছিলো বাসুদেব মজুমদার।

এসব নানা কারণে সে আজকাল আর গড় নাসিমপুর ছেড়ে বেরোয় না। শুজার পক্ষের লোকেরা তাকে ধরতে পারলে তার জীবন সংশয় হতে পারে। এজন্যে সে গড় নাসিমপুরে আত্মগোপন করে আছে, যদ্দিন না শুজা ঢাকা চলে যায়।

কিন্তু এসব শোনা কথা। রাজা ইন্দ্রনারায়ণ আর উত্তরার

কানেও এসব খবর উঠেছিলো। কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ এসব কথা বিশ্বাস করতো না। কয়েক মাস আগে পর্যন্ত রাজা ইন্দ্রনারায়ণ শাহ শুজার পক্ষকে যথাসাধ্য সহায়তা করেছিলো অর্থ ও রসদ দিয়ে। তখন শুজার ফৌজের সয়িদ আলম, মির্জা জান বেগ, সয়িদ কুলি উজবক প্রমুখ প্রধান মনসবদারদের সঙ্গে যা কিছু যোগাযোগ হোতো, সব বাসুদেবের মধ্যস্থতায়।

তাহলে সে এখানে পড়ে আছে কেন? জানতে চাইতো লোকে।

কেন যাবে? বলতো বাসুদেবের অনুরক্তেরা,—এই অরাজক অবস্থায় সে কি করে গড় নাসিমপুর অরক্ষিত অবস্থায় রেখে ঢাকা চলে যাবে শুজার কাছে? রাজা ইন্দ্রনারায়ণ, দেওয়ান শিবশঙ্কর দুজনেরই বয়েস হয়েছে। এসময় বাসুদেবের এখানে থাকা প্রয়োজন। সে কি আর ইচ্ছে করে আছে? রাজা ইন্দ্রনারায়ণের বিশেষ অনুরোধেই সে থেকে গেছে।

গড় নাসিমপুরে খুব কর্মব্যস্ততা। প্রায়ই কেউ না কেউ আসছে গৌড়ের কাছে, শাহ শুজার ঘাঁটি থেকে। থেকে থেকে গুজব শোনা যাচ্ছে যে হয়তো শাহ শুজা ঢাকা নাও যেতে পারে। নিজের ফৌজকে পুনর্গঠিত করে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে। যুগপৎ আক্রমণ চালাবে দোগাছি, জুনাপুর, জঙ্গিপুরের উপর। যদি আবার রাজমহল দখল করা যায়, হয়তো যুদ্ধের মোড় ফিরে যাবে।

আরো শোনা গেল যে গড় নাসিমপুরে ঘাঁটি করবে শুজার গোলন্দাজ বাহিনী। নতুন তোপখানা হবে এখানে। গঙ্গার পাড়ে এমন একটা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে গড় নাসিমপুরের অবস্থিতি যে এখান থেকে রুখে রাখা যায় মিরজুমলার নওয়ারাকে। পূর্ববঙ্গের দিকে যেতে হলে গড় নাসিমপুরের কাছে গঙ্গা বেয়ে যেতে হবে মোগল নওয়ারাকে, আর এই গড় থেকে ঠিক মতো কামান দাগতে পারলে, সেই গোলাবর্ষণ অতিক্রম করে এগিয়ে আসা যে কোনো নৌবাহিনীর পক্ষে অত্যন্ত শক্ত।

গড় নাসিমপুরে সবারই মনে একটা বিপুল উৎকণ্ঠা। কি হবে কিছুরই ঠিক নেই। শুজার পক্ষের অনেক মনসবদার গিয়ে যোগ দিচ্ছে মিরজুমলার সঙ্গে। কন্যা গুলরুখ বানুর সঙ্গে বিয়ে দিয়েও আওরংজেবের পুত্র মহম্মদ সুলতানকে নিজের সঙ্গে রাখতে পারেনি শাহ শুজা। সে এখন মিরজুমলার বন্দী। শোনা যাচ্ছে ভুজঙ্গ ঠাকুরের দলও আর শুজার নওয়ারাকে সহায়তা করতে চাইছে না! সে চলে যাচ্ছে দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে।

শুভানুধ্যায়ীরা অনেকে রাজা ইন্দ্রনারায়ণকে বোঝাবার চেষ্টা করলো যে, এখন প্রাকাশ্যভাবে শুজাকে সাহায্য না করাই বাঞ্ছনীয়। বরং এখন একটা নিরপেক্ষভাব দেখানো উচিত। শাহ-জাদা মুরাদ আওরংজেবের হাতে বন্দী। কয়েকমাস আগে দারাকেও বন্দী করে দিল্লী এনে হত্যা করা হয়েছে। শুজাও আওরংজেবের সঙ্গে পেরে উঠবে কিনা সন্দেহ। হয়তো শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্তানের বাদশাহ্ হবে আওরংজেব।

কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ এদের কারো কথা কানে তুললো না। দেওয়ান শিবশঙ্করের ধারণা শুজার সঙ্গে আওরংজেবের একটা মিটমাট হয়ে যাবে। ইন্দ্রনারায়ণকে বাসুদেবই বোঝাতে লাগলো যে এই দুঃসময়ে প্রকাশ্যভাবে শুজার প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন করলে একদিন এর প্রতিদান পাওয়া যাবে। সে কথা মেনে নিলো ইন্দ্র-নারায়ণ। বাসুদেব বলে বেড়ালো, সে নাকি মির্জা জান বেগের কাছ থেকে খবর পেয়েছে যে, আওরংজেব শুজার কাছে সন্ধির প্রস্তাব করে পত্র প্রেরণ করেছে। শুজা যদি তাকে বাদশাহ বলে স্বীকার করে নেয়, তাহলে সমগ্র বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার পদে নিরাপদে বহাল থাকতে পারবে শাহ্ শুজা।

শিবশঙ্কর ইন্দ্রনারায়ণকে বোঝালো যে আওরংজেব যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর যুদ্ধ করতে চায় না, সুতরাং আওরংজেবের চিঠিতে উল্লিখিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে হয়তো শিগগিরই একটা মিট

মাট হয়ে যাবে। অতএব এ সময় শুজাকে সাহায্য দান বন্ধ করা উচিত হবে না, কারণ সুবাদারের কোপদৃষ্টিতে না পড়াই বাঞ্ছনীয়।

এদের কথাই মেনে নিলো ইন্দ্রনারায়ণ। প্রায় সময় বাসুদেব ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো। অনেকে বললো, বোধহয় শিগ্‌গিরই অবসর গ্রহণ করবে দেওয়ান শিবশঙ্কর, নতুন দেওয়ান নিযুক্ত করা হবে বাসুদেবকে। কেউ কেউ বলতো বাসুদেব মজুমদার গড় নাসিমপুরে থাকবে না, যুদ্ধ থেমে গেলেই ফিরে যাবে রাজমহলে। তাকে নাকি নাইব দিওয়ানের পদে নিযুক্ত করার কথা বিবেচনা করছেন শাহ শুজা।

গড় নাসিমপুরে সর্বক্ষণ এরকম জল্পনা কল্পনা বাসুদেব সম্বন্ধে। দেওয়ান শিবশঙ্কর যে ইন্দ্রনারায়ণের কন্যার সঙ্গে নিজের পুত্রের বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন, এমন কথাও কেউ কেউ বলতো। ইন্দ্রনারায়ণ যে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করার চেষ্টা করতো না এমন নয়, কিন্তু কোনো না কোনো একটা ছুতো তুলে বাধা দিতো দেওয়ান শিবশঙ্কর। বোঝাতো যে এই গোলমালের সময় নয়, দু-চার মাসের মধ্যেই যুদ্ধবিগ্রহ থেমে যাবে, তখন মন দেওয়া যাবে উত্তরার বিয়ের চেষ্টায়। লোকে বলতো, এসব নাকি শিবশঙ্করের উদ্দেশ্যপ্রসূত।

দেবীকান্তর সঙ্গে প্রত্যেক শুক্লা চতুর্দশীতে উত্তরার দেখা হোতো অষ্টভুজার মন্দিরে। সেখান থেকে ওরা চলে যেতো গঙ্গার পাড়ে।

তার কাছে মনের আশঙ্কাগুলো খুলে বলতো উত্তরা।

দেবীকান্ত তাকে আশ্বাস দিয়ে বলতো, "তোমায় আমার কাছে থেকে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না উত্তরা।"

"আমার কিন্তু খুব ভয় করে আজকাল।"

"তুমি ভেবো না উত্তরা। আমি তো আছি।"

পালকির ভিতর বসে উত্তরা চোখ বুঁজে ভাবছিলো। তার সামনে পরিষ্কার ভেসে উঠলো সেই পুরোনো দিনগুলোর ছবি।...

—নির্জন নিরিবিলি গঙ্গার তীর, ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই। চারদিক এত স্তব্ধ যে, শুকনো পাতার উপর কাঠবিড়ালির ছুটে বেড়ানোর শব্দও পরিষ্কার শোনা যায়। কিছু দূরে দেবীকান্তর নৌকো বাঁধা আছে একটি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। মাঝি মাল্লারা সবাই চোখের আড়ালে। অষ্টভুজার মন্দিরে যারা পূজো দিতে আসে তাদের সাড়া পাওয়া যায় না এখান থেকে।

চুপচাপ সময় কেটে যায়। হাত ধরে পাশাপাশি বসে থাকে উত্তরা ও দেবীকান্ত।

উত্তরা একদিন দেবীকান্তকে বলেছিলো। "এমনি আর ভালো লাগে না। মহলের ভিতর মন হাঁফিয়ে ওঠে।"

"কেন?"

"এখানে আমি বড়ো একা। তা ছাড়া আমার ভয় করে বড্ডো।"

"ভয় করে? কিসের ভয় উত্তরা?"

"এখানে বাসুদেব আছে। ওর চোখের চাউনি আমার মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। ওর মনে কি আছে কে জানে!"

"আরো কিছুদিন তো এমনিই কাটাতে হবে উত্তরা।"

"আরো কিছুদিন? কদ্দিন আর? তুমি আমায় নিয়ে চলো কোথাও। আমি চলে আসবো তোমার সঙ্গে।"

"কাউকে না বলে?" জিজ্ঞেস করেছিলো দেবীকান্ত।

'হ্যাঁ, কেউ জানতে পারবে না। আমরা চুপচাপ পালিয়ে যাবো।"

"তোমার বাবার মনে কষ্ট হবে না?"

একথা শুনে উত্তরার চোখ দুটো সজল হয়ে উঠেছিলো।

"হ্যাঁ, বাবা কষ্ট পাবেন। কিন্তু উপায় কি? মেয়ে তো সঙ্গে থাকে না চিরকাল।"

কিছুক্ষণ মৌন হয়ে ছিলো দেবীকান্ত। তারপর ধীরকণ্ঠে বললো, "না উত্তরা। তোমার বাবার মনে কষ্ট দিয়ে আমি কিছু করতে চাইনা।"

উত্তরা অবাক হয়ে তাকালো দেবীকান্তর কথা শুনে।

দেবীকান্ত বলে গেল, "আমি যখন অনাথ হয়ে পড়েছিলাম, কোথায় আশ্রয় পাবো কিছুরই ঠিক ছিলো না, তখন উনি আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন। সে কৃতজ্ঞতা আমি জীবনে কোনোদিনই ভুলতে পারবো না উত্তরা।"

"কিন্তু শিবশঙ্কর কাকার কুচক্রে পড়ে বাবা তো তোমার সমস্ত ভূসম্পত্তি জমিদারি সবই নিজের দখলে নিয়ে এসেছিলেন—।"

"কি আর এমন সম্পত্তি! আমি তার চাইতে অনেক বেশী গড়ে তুলবো উত্তরা।"

এই আশ্বাসে উত্তরার মনের বিষণ্ণতা কাটলো না।

"কি হোলো উত্তরা? মুখ ভার করে আছো কেন?"

উত্তরা উত্তর দিলো, "সে আর কবে হবে? কদ্দিন এমনি ভাবে কাটবে আমাদের?"

দেবীকান্ত আশ্বাস দিয়ে বললো, "তুমি ভেবো না। এমন দিন আসবে যখন তোমার বাবা খুব খুশী হয়ে তোমায় আমার হাতে সঁপে দেবেন।"

"সত্যি?" জলভরা চোখে হাসি-হাসি মুখ তুলে দেবীকান্তর দিকে তাকালো উত্তরা। সেই এখন তার জীবনের একমাত্র

ভরসা। তার আশ্বাস নিয়ে সারা জীবন অপেক্ষা করে থাকতে পারে সে।

দেবীকান্ত হাসলো তার দিকে তাকিয়ে। বললো, "আমি বলছি। তুমি দেখে নিও।"

সব স্বপ্নের মতো এও একটা স্বপ্ন, যা বাস্তব জীবনের ঘটনা ও পরিস্থিতির নিষ্করুণ আঘাতে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

ভগবান কি জীবনের অন্তত একটি স্বপ্নও সফল হতে দেবে না, —উত্তরা ভাবলো। কিন্তু এখন তো আর কোনো আশাই নেই। তখন দেবীকান্তর কথা শুনে তার মনে হয়েছিলো, তাই হয়তো হবে একদিন, সাফল্য সম্মান প্রতিষ্ঠা নিয়ে দেবীকান্ত যখন গড় নাসিমপুরে ফিরে এসে রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সামনে দাঁড়াবে, তখন খুব খুশী হয়েই তার হাতে সমর্পন করবে কন্যাকে।

ফুলচন্দন পড়ুক দেবীকান্তর মুখে,—সে সময় দেবীকান্তর কথা শুনে উত্তরা ভেবেছিলো। আজ পালকির ভিতর হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় বসে সে কথা মনে পড়তে উত্তরার হাসিই পেলো।

লোক লস্কর হাতি ঘোড়া নিয়ে রূপকথার রাজকুমার হয়ে গড় নাসিমপুরে ফিরে আসার সুযোগ দেবীকান্তর আর হবে না। সেখানে বন্দী হয়ে আছে রাজা ইন্দ্রনারায়ণ। এখানে পালকির ভিতর এক অপহৃতা হতভাগিনী নারীকে তার ভাগ্য কোন অজানা ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছে কে জানে!

বন্ধুর পথে পালকি ডাইনে বাঁয়ে দুলছে, ঝাঁকুনি লাগছে বার বার। পালকি বাহকেরা পথ চলছে নিঃশব্দে।

"আর কদ্দুর,"—একজনের গলা শোনা গেল।

"আরো তিনদণ্ডের পথ,"—উত্তর দিলো একজন।

"জঙ্গলের ভিতর এই অন্ধকারে পথ চলতে বড় অসুবিধে

হচ্ছে। অনেকটা পথ তো এসেছি। এবার একটা মশাল জ্বেলে নিলে হোতো না?"

"না,"—একটা কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠ শোনা গেল।

কি করে যে সব উলট-পালট হয়ে গেল, আজো বুঝতে পারে না উত্তরা। আগের থেকে আচ করতে পারলে হয়তো দেবীকান্তকে বলে কোনো একটা উপায় করার চেষ্টা করা যেতো।

সে মাসখানেক আগেকার কথা। শুক্লা চতুর্দশীর নির্দিষ্ট দিনটি আসতে তখনো কয়েকদিন দেরি আছে।

উত্তরা বসেছিলো সুরেশ্বরীর কাছে। এমন সময় বাসুদেব এসে উপস্থিত হোলো।

ইদানীং সে বেশী আসে না মহলের ভিতর। বাইরের কাজে খুব ব্যস্ত। টাণ্ডা থেকে শাহ শুজা ঢাকা রওনা হয়ে গেছে। শুজার তোপখানার যে অংশ মিরজুমলার হাতে পড়েনি, সেটা চলে এসেছে গড় নাসিমপুরে। শুজা কি ঢাকা থেকেই যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, না আত্মসমর্পন করবে মিরজুমলার কাছে,—একথাই জল্পনা কল্পনা করছে সবাই। মিরজুমলার সেনাবাহিনী জঙ্গিপুর থেকে উত্তর দিকে এগিয়ে আসছে গঙ্গার ওপারের দিকে। গড় নাসিমপুর সম্বন্ধে একটু উৎকণ্ঠিত হওয়ার কারণ আছে। এ সময় মোগলদের তোয়াজ করা প্রয়োজন। তাই হয়তো কয়েকদিনের মধ্যে দোগাছি যেতে হবে বাসুদেবকে, দেখা করতে হবে সেখানকার সেনাধ্যক্ষ আওরংজেবের বিখ্যাত মনসবদার ইসলাম খাঁর সঙ্গে।

এসব বিবরণ সুরেশ্বরীকে শোনাচ্ছিলো বাসুদেব। ইসলাম

খাঁর প্রশংসা করছিলো খুব। সে নাকি বহু বৎসর দাক্ষিণাত্যে ছিলো আওরংজেবের সঙ্গে, যখন সেখানে সুবাদার ছিলো শাহজাদা আওরংজেব। বিজাপুরের যুদ্ধে খুব খ্যাতি অর্জন করেছে। সমুগড় ও ধারমতের যুদ্ধেও অপূর্ব রণকৌশল দেখিয়েছে। নতুন বাদশাহ আওরংজেবের উপর ওর খুব প্রভাব।

"ইসলাম খাঁ, আকিল খাঁ, সাফ শিকান খাঁ ও শেখ মির,—এরা চারজন বাদশাহর খুব অন্তরঙ্গ," বলছিলো বাসুদেব, "আকিল খাঁর উপর নিজের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে তাকে আওরঙ্গাবাদে রেখে এসেছিলো আওরংজেব। হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করতে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো অন্য তিনজনকে। এদের মধ্যে ইসলাম খাঁ এসেছে বাংলায়। ওকে যদি সন্তুষ্ট করা যায়, তাহলে গড় নাসিমপুরের কোনো বিপদ হবে না, বাদশাহের সৈন্যরা দখল করতে চাইবে না গড় নাসিমপুর। নতুন করে সনদ পাওয়া যেতে পারে স্বয়ং বাদশাহ্‌র কাছ থেকে। তা নইলে কিন্তু ভাবনার কথা। ওদের কারো কারো ধারণা আমরা শুজার পক্ষভুক্ত। আমি যে শাহ শুজার সৈন্যবাহিনীতে ছিলাম, এটাও ওরকম ধারণা হওয়ার একটা কারণ। যাই হোক, দেখা যাক কি করা যায়।"

শুনতে শুনতে সুরেশ্বরীর মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিলো ভয়ে।

"কিন্তু ওরা যদি গড় দখল করতে আসে তাহলে কি হবে?" ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সুরেশ্বরী।

"কেন ভাবছো পিসীমা, আমি তো আছি," এই বলে বাসুদেব আড়চোখে উত্তরার দিকে তাকালো।

বাসুদেবের কথা উত্তরা খানিকটা শুনেছে, খানিকটা শোনেনি। দেশের রাজনৈতিক জটিলতা সম্বন্ধে ওর বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। সে নিজের মনে ভাবছিলো অন্যকথা। যদি মোগল সৈন্যেরা ইতিমধ্যে এসে পড়ে গড় নাসিমপুরে, তাহলে দেবীকান্তর সঙ্গে উত্তরার দেখা হবে কি করে? গড় থেকে বেরিয়ে অম্বিকাপুরে অষ্টভুজা

দেবীর মন্দিরে যাওয়ার সুযোগ কি হবে? শুক্লা চতুর্দশীর আর কদিন বাকী, মনে মনে একটা হিসেব করলো উত্তরা।

বাসুদেব তাকিয়ে তাকিয়ে লক্ষ্য করছিলো উত্তরার এই আনমনা ভাব। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা উত্তরা! দেবীকান্তকে তোমার মনে আছে?"

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলো উত্তরা, কিন্তু শান্ত করে রাখলো মুখের ভাব। শুধু মুখ ফিরিয়ে তাকালো বাসুদেবের দিকে। ভাবলো আজ পর্যন্ত একদিনও বাসুদেব দেবীকান্তর নাম মুখে আনেনি। আজ হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

উত্তরা কিছু বলার আগে সুরেশ্বরী বলে উঠলো, "দেবীকান্ত! আমাদের দেবীকান্ত? সে কি বেঁচে আছে? কোথায় যে চলে গেল ছেলেটি, আজ পর্যন্ত কোনো সন্ধান নেই।"

ছেলেবেলা থেকে লালন পালন করেছে দেবীকান্তকে, সেজন্য ওর প্রতি সুরেশ্বরীর একটা স্বাভাবিক মমতা ছিলো। বলতে বলতে সুরেশ্বরীর চোখে জল এলো।

"দেবীকান্ত যে বেঁচে আছে, সে খবর আমরা জানি," বাসুদেব শান্ত কণ্ঠে বললো।

উত্তরার বুক ধুকধুক করে উঠলো। বাসুদেব কি করে জানলো!

"বেঁচে আছে?" জিজ্ঞেস করলো সুরেশ্বরী।

"হ্যাঁ।"

"কোথায় আছে সে?"

"একথা জানতে চাইছো কেন?"

"সে কি কথা? বাঃ, ও কোথায় আছে জানতে পারলে ওকে আমি ধরে নিয়ে আসবো না? তোরা যেমন, সেও তো তেমনি আমার নিজের হাতে মানুষ করা ছেলে?"

"কিন্তু সে কি মানুষ হয়েছে?" ঈষৎ ব্যঙ্গ ভরে বাসুদেব জিজ্ঞেস করলো।

উত্তরার কান ছুটো লাল হয়ে গেল চাপা রাগে।

"সে কি কথা রে?" জিজ্ঞেস করলো সুরেশ্বরী।

"ওর সঙ্গে তোমাদের দেখা না হওয়াই ভালো।"

"ও মা, সে কি কথা?"

"ওর সঙ্গে দেখা হলে তোমরা কেউ খুশী হবে না।"

"কেন রে? কি বলছিস তুই?"

"ঠিকই বলছি।"

"তুই কি ওর কোনো খবর জানিস?"

"হ্যাঁ, আমি ওর সব খবরই জানি।"

উত্তরা বাসুদেবের দিকে তাকালো।

"পিসীমা, তুমি ভুজঙ্গ ঠাকুরের নাম শুনেছো?" আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো বাসুদেব।

"ওরে বাবা, ওর নাম কে শোনেনি," সুরেশ্বরী বলে উঠলো, "কিন্তু তার সঙ্গে দেবীকান্তর কি সম্পর্ক?"

বাসুদেব তাকালো সুরেশ্বরীর দিকে, তারপর উত্তরার দিকে।

উত্তরা বাসুদেবের উত্তরের প্রতীক্ষা করছিলো রুদ্ধনিঃশ্বাসে।

বাসুদেব বললো, "ভুজঙ্গ ঠাকুরের এক পালিত পুত্র আছে। সবাই তাকে রাজাবাবু বলে জানে। ওই ডাকাতের দলের আসল সর্দার হোলো এই রাজাবাবু।"

সুরেশ্বরী আর উত্তরা নির্বাক হয়ে শুনছিলো দেবীকান্তর কথা।

"ভুজঙ্গ ঠাকুরের বয়েস হয়ে যাচ্ছে। সে এসব ডাকাতি হামলার মধ্যে বেশী থাকে না। নিজের পূজোআর্চা নিয়েই থাকে। শোনা যায়, সে নাকি এককালে মনসবদার ছিলো বিহার বাংলার সুবাদার নাজিমের ফৌজে। সে সময় নতুন বাদশাহ হয়েছে শাহজাহান। অনেকদিন আগেকার কথা। তারপর এক সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা অপহরণের ব্যাপারে তার শাস্তি হয়। এর পর সে নিরুদ্দেশ হয়ে

যায়। কয়েক বছর পরে সন্ন্যাসী সেজে ডাকাতের দল গড়ে তোলে। সন্ন্যাসী সেজে ডাকাতি করার সুবিধে অনেক। সাধারণ লোক ভক্তি শ্রদ্ধা করে, ফৌজদার কি কোতোয়ালদের কোনো খবর দিতে চায় না তার সম্বন্ধে। তার ডাকাতির এলাকা দক্ষিণে হুগলি থেকে ওদিকে রাজমহল পর্যন্ত।"

"ওর কথা তো আমরা জানি," বললো সুরেশ্বরী।

"ভুজঙ্গ ঠাকুরের সঙ্গে মগ-হার্মাদদের বনিবনাও ছিলো না। ওদের সঙ্গে বিবাদ লেগে থাকাতো সব সময়। এই রাজাবাবু মগ-হার্মাদ-দের সঙ্গেও মিতালি করে তাদের সঙ্গে ডাকাতির এলাকা ভাগ করে নিয়েছে। আগ্রা রাজমহলেও তার যোগাযোগ বড় কম নেই। নিয়মিত অর্থ দেয় অনেক প্রভাবশালী ওমরাহ্ মনসবদারকে। ইদানীং শাহ শুজার মির বকশি সয়িদ আলমের সঙ্গে তার খুব সখ্যতা হয়েছে। শাহ শুজার পক্ষ নিয়ে সে মিরজুমলার রসদ সরবরাহ ব্যবস্থার উপর আক্রমণ চালাচ্ছে সর্বত্র। এবং এই সুযোগে নানা রকম ভাবে ডাকাতি করে নিজেও লাভবান হচ্ছে কম নয়। তোমরা শুনলে অবাক হবে বাদশাহ আওরংজেবের পুত্র মহম্মদ সুলতানকে মোগল শিবির থেকে বার করে এনে নিরাপদে গঙ্গা পার করে শাহ শুজার শিবিরে পৌঁছে দিয়েছিলো এই রাজা-বাবুই। শোনা যাচ্ছে ঢাকা থেকে মগদের দেশে চলে যাবে শাহ শুজা। এই ব্যাপারেও মগদের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ করবার ভার দেওয়া হয়েছিলো তারই উপর।"

একটু থেমে সুরেশ্বরী ও উত্তরার দিকে তাকিয়ে দেখলো বাসুদেব। দুজনে কৌতূহলভরে শুনছে তার কথাগুলো। বাসুদেব আস্তে আস্তে বললো, "এবং এই রাজাবাবু হোলো—ম্—আমাদের ছেলেবেলার খেলার সাথী, সেই শ্রীমান দেবীকান্ত রায়।"

"বলিস কি রে?" সুরেশ্বরী আঁতকে উঠলো বাসুদেবের কথা শুনে।

বাসুদেব আর কোনো কথা না বলে একটু হেসে উঠে পড়লো সেখান থেকে।

ওর কথা শুনে উত্তরাও মনে একটা ধাক্কা খেয়েছিলো। দেবীকান্ত কি করে সে সম্বন্ধে উত্তরা কোনোদিন কোনো কথা জিজ্ঞেস করেনি তাকে, সেও উত্তরাকে কিছু বলে নি। ওর স্বচ্ছল অবস্থা দেখে উত্তরা ধরে নিয়েছিলো, সে হয়তো ব্যবসা বাণিজ্য কিছু করে, কিংবা হয়তো ছোটোখাটো জমিদারি করেছে কোথাও। কিন্তু ডাকাতি! তার প্রিয়তম দেবীকান্ত ডাকাত!

ভাবতেই উত্তরার মন শিউরে উঠলো বারবার।

হ্যাঁ, রাজাবাবুর নাম সে যে শোনেনি তা নয়। ভুজঙ্গ ঠাকুরের সম্বন্ধে গল্প করে লোকে, সে সময় ওরা বলে রাজাবাবুর কথাও। ভাবতে মনে পড়লো, লোকের মুখে সব সময় ওর শৌর্য ও শক্তির কথাই শুনেছে, কোনোরকম নৃশংসতা নিষ্ঠুরতার উল্লেখ কেউ করে নি। বরং সাধারণ লোকের প্রতি তার করুণা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের কথাই শোনা গেছে মাঝে মাঝে।

তবু সে ডাকাত। কোনোরকম সম্ভ্রান্ত বৃত্তি তার নয়। তার কোনো আভিজাত্য নেই, কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠা নেই, কোনো ভবিষ্যত নেই। সেই লোকটাকেই সে স্থান দিয়েছে তার হৃদয়ের মন্দিরে! সেও তো তার কাছে গোপন করে গেছে তার কথা!

উত্তরার মনে পড়লো যে, রাজমহলে দেবীকান্তর বজরায় জ্ঞান ফিরে আসবার পর তার অনুচরের মুখে এই সম্বোধনই শুনেছিলো। তখন খেয়াল হয়নি। আরো মনে পড়লো, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের বাইরে দেবীকান্ত ললিতাকে কয়েকটা আশরফি দিয়েছিলো। সে সব তাহলে ডাকাতি করে পাওয়া!

উত্তরা প্রথম দিন রাগের মাথায় স্থির করেছিলো, আর দেখা করবে না দেবীকান্তর সঙ্গে। কেন সে তাকে আগে বলেনি। না,

না, গড় নাসিমপুরের রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কন্যা কোনো সম্পর্ক রাখতে পারে না একজন সাধারণ ডাকাতের সঙ্গে। ছিঃ!

কিন্তু একদিন দু-দিন করে শুক্লা চতুর্দশীর দিন যতো এগিয়ে এলো, ততোই বিচলিত হয়ে উঠলো উত্তরা।

তাকে যে সে আসতে বলে দিয়েছে। না গেলে চলে কি করে? আর, যাকে একবার প্রাণমন দিয়ে ভালোবেসেছে, তাকে এক কথায় পরিত্যাগই বা করা যায় কি করে? বরং দেবীকান্তকে বিপথগামী হতে না দিয়ে তাকে সৎপথে আনবার চেষ্টা করা উচিত। এটা তার কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নয়, এ তার দায়িত্ব।

এসে গেল শুক্লা চতুর্দশীর দিন। সেদিন সকালে একলা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলো উত্তরা। মনটা খুবই বিচলিত। নানা কথা ভাবতে হচ্ছে তাকে।

হঠাৎ চোখ পড়লো নিচে বাগানের দিকে। ওধারে এক কোণে একটি মস্তো বড়ো কৃষ্ণচূড়ার গাছ। তারই আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে বাসুদেব। সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে এদিক সেদিক।

উত্তরার মনে একটু খটকা লাগলো। সে সরে গেল একটা থামের আড়ালে। বাসুদেব দেখতে পায়নি তাকে।

এধারে নানারকম ফুলের ঝাড়। সেদিক থেকে এগিয়ে এলো ললিতা। সেও চারদিক সন্তর্পণে তাকিয়ে এগিয়ে গেল বাসুদেবের কাছে। দুজনে নিচু গলায় কথা বললো কিছুক্ষণ।

গড় নাসিমপুরেরই ছেলে বাসুদেব, সে যে মহলের একজন পরিচারিকার সঙ্গে কথা বলবে, এটা এমন কিছু নয়, কিন্তু ওদের হাবভাবভঙ্গি উত্তরার ভালো লাগলো না।

কিছুক্ষণ পর বাসুদেব চলে গেল। ললিতা খানিকক্ষণ বাগানের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে ফিরে এলো মহলের ভিতর।

উত্তরা প্রথমে ভেবেছিলো ললিতাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না।

এসব ছোটোখাটো ব্যাপার লক্ষ্য না করাই ভালো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে অধৈর্য হয়ে উঠলো। তাকে আজ যেতে হবে অষ্টভুজার মন্দিরে, ললিতা যাবে তার সঙ্গে। বাসুদেব জানতে পেরেছে দেবী কান্তর অস্তিত্ব, এ অবস্থায় উত্তরাকে সতর্ক থাকতে হবে, কেউ যেন ললিতার কাছ থেকে কিছু জানতে না পারে, কেউ যেন কোনোরকম সন্দেহ না করে উত্তরাকে। ললিতা অবশ্যি জানেনা দেবীকান্তর পরিচয়, কিন্তু উত্তরা যে অম্বিকাপুরে যায় কোনো এক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করবার জন্যেই, একথবরও যদি কেউ জানতে পারে, দেবীকান্তর পক্ষে সেটা বিপজ্জনক হতে পারে।

ললিতা উপরে এসে জিজ্ঞেস করলো, "দিদি, আপনার চান-টান সারা হয়েছে। বেলা বেড়ে ওঠার আগেই যে আমাদের রওনা হতে হবে।"

"পালকির বেয়ারা ও পেয়াদারা এসে গেছে?" উত্তরা জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ দিদি, আপনি এবার তৈরী হতে শুরু করুন।"

ললিতা চলে যাচ্ছিলো। উত্তরা ডাকলো তাকে।

"দিদি আমায় কিছু বলছেন?"

"হ্যাঁ, এদিকে আয়।"

"কি দিদি?"

"আচ্ছা, ছোটোবাবু তোকে বাগানের ভিতর ডেকে কি বলছিলো রে?"

ললিতা হাসিমুখে বললো, "বিশেষ কিছু নয়। আমি ওদিক থেকে আসছিলাম। দেখি ছোটোবাবু দাঁড়িয়ে আছেন গাছতলায়। ডেকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার কথা।"

"আমার কথা?"

"হ্যাঁ। বললেন,—ললিতা, তোর দিদিমণি কি আজ মন্দিরে যাবেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, যাওয়ার ব্যবস্থা তো হয়ে আছে।

উনি বললেন,—আজকাল মোগল সৈন্যদের ছোটো ছোটো দল নদী পার হয়ে এসে এপাড়ে মাঝে মাঝে হামলা করছে, তাই আজ আপনার সঙ্গে বেশী করে পাইক বরকন্দাজ দেওয়া হবে।"

"পাইক বরকন্দাজ?" উত্তরা বিস্মিত হোলো, বললো, "কি দরকার? আমি তো বলিনি যে আমার সঙ্গে এত লোক চাই। দু-ক্রোশ মোটে পথ, দুপাশেই লোকজনের বসতি আছে, সব আমাদেরই জমিদারি, এত ভাবনা করার কি আছে? এদিকে তো কোনো গোলযোগ নেই। বাইরে বলে দিয়ে আয়, এত লোকজন আমার দরকার নেই।"

"দেওয়ানজীর হুকুম। রাজামশায় তাই নির্দেশ দিয়েছেন। এখন কি ওদের ফিরিয়ে দেওয়া যাবে?"

"দেওয়ানজীর হুকুম, রাজামশায়ের নির্দেশ," উত্তরা রাগে গজগজ করতে লাগলো, "আমার কথা কিছু নয়? পরামর্শটা নিশ্চয়ই শ্রীমান বাসুদেবের?"

"উনি খুব হুঁসিয়ার লোক," বললো ললিতা।

"হুঁশিয়ার নিজের বেলা হোন গে," উত্তরা বলে উঠলো, "আমি কোথাও যাওয়ার সময় কি ব্যবস্থা হবে না-হবে সেটা বাসুদেব ঠিক করার কে?"

ললিতা কোনো উত্তর দিলো না। দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে।

"তুই এখন যা," বললো উত্তরা।

"আপনিও তৈরী হয়ে নিন দিদি।"

ললিতা চলে গেল।

উত্তরা ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করলো উত্তেজিত হয়ে। কিন্তু তখন বেরিয়ে পড়ার সময় হয়ে আসছে। মনে হোলো, এ নিয়ে এখন বেশী উচ্চবাচ্য করা ঠিক হবে না। স্থির করলো যে, ফিরে এসে বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে নিতে হবে।

যাওয়ার আগে একবার রাজা ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গেও দেখা হোলো। খুব চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিলো তাঁকে।

উত্তরা ঘরে ঢুকতে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, "মন্দিরে যাচ্ছিস পূজো দিতে ?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"ওখানে বেশী দেরি করিস না। সকাল সকাল ফিরে আসিস।"

"অতো ভাবনা করার কি আছে বাবা ?" উত্তরা জিজ্ঞেস করলো মৃদু গলায়, "ওখানে তো নিয়মিত যাচ্ছি।"

"দিনকাল ভালো নয় মা। আজকাল ফৌজের লোকেরা মাঝে মাঝে এসে হামলা করছে। সঙ্গে জোরদার পাহারা থাকা দরকার হয়ে পড়েছে।"

উত্তরা আর কোনো প্রতিবাদ করলো না। এখন অনর্থক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। ওঁর মুখের ভাব দেখে উত্তরা একটু উদ্বিগ্ন হোলো। জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে বাবা ?"

"না, বিশেষ কিছু না।"

"তুমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলে আমায় ?"

"হ্যাঁ, একটা কথা বলবো ভাবছিলাম।"

"কি কথা বাবা ?"

"তেমন কিছু নয়। মানে, আজকাল সময়টা খারাপ পড়েছে। আমারও বয়েস হয়ে যাচ্ছে। তোর কোনো একটা ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারলে ভালো হোতো। এদ্দিন গড়িমসি করে কিছু করা হয়ে ওঠে নি। যাই হোক,—"

"আজ তোমার মুখে এসব কথা কেন বাবা ?"

একটু চুপ করে থেকে ইন্দ্রনারায়ণ বললো, "বাসুদেব আমার কাছে এসেছিলো একটু আগে।"

"কেন বাবা ?" উত্তরা এবার রীতিমতো উদ্বিগ্ন হোলো, "কিছু বলেছে তোমায় ?"

"হ্যাঁ," ইন্দ্রনারায়ণের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

"কি বলেছে বাবা ?"

"ওর যে এত আস্পর্ধা হতে পারে আমি ভাবতে পারিনি !"

"কেন বাবা, কী বলেছে তোমায় ?"

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলো রাজা ইন্দ্রনারায়ণ। তারপর বললো, "বাসুদেব আমার কাছে তোমার সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলো।"

"বাসুদেব !" উত্তরার মুখ রাগে রাঙা হয়ে উঠলো, "একথা বলেছে তোমায় ? ওকে বার করে দাও গড় নাসিমপুর থেকে।"

ইন্দ্রনারায়ণ উত্তর দিলো, "আমি ওকে খোলাখুলি বলে দিলাম, না, হবে না। বামন হয়ে চাঁদ ধরবার আশা কোরো না।"

"ব্যস, তাহলে তো মিটেই গেল। ওকে বলে দাও, এখান থেকে চলে যেতে।"

"সেটাই তো বড়ো মুশকিলের কথা, মা।"

"মুশকিল ! কেন ?"

"ও আমায় শাসিয়েছে। ওকে এখন আমি কিছু করতে পারি না। আমার মনে তো ভাবনা ধরে গেছে।"

ইন্দ্রনারায়ণের কথা শুনে উত্তরা বিস্মিত হোলো। রাজা ইন্দ্র নারায়ণকে যে কেউ শাসাতে পারে, এবং তাতে যে ভাবনা হতে পারে ইন্দ্রনারায়ণের, উত্তরা একথা জীবনে এই প্রথম শুনলো।

রেগে উঠলো সে। বললো, "তোমাকে শাসিয়েছে ? এত সাহস তার ? ওকে দূর করে দাও গড় নাসিমপুর থেকে।"

ইন্দ্রনারায়ণ বলে গেল, "ও যে কি প্রকারের লোক আগে ভাবতে পারিনি। ওকে কিছু করার উপায় আমার নেই। ও আমায় এমন জালে জড়িয়েছে যে কি বলবো। এখন ও আমার

রীতিমতো ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু আমি ওর কিছু করতে পারি না।"

উত্তরার বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো, "জালে জড়িয়েছে? তোমায়? আমায় সব খুলে বলো বাবা, কি হয়েছে। দেখি আমি কি করতে পারি।"

"তুই আর কি করতে পারবি।" ইন্দ্রনারায়ণ শুকনো হাসি হাসলো। তারপর বললো। "এখন থাক এসব কথা। তুই ঘুরে আয় মন্দির থেকে। তারপর কথা হবে। অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।"

উত্তরার চোখে জল আসছিলো। কোনো রকমে নিজেকে সামলে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

অন্যান্যবার পালকিতে চেপে অম্বিকাপুরে অষ্টভুজা দেবীর মন্দিরে যাওয়ার পথে উত্তরার মন একটা আনন্দে ভরে থাকতো। মাসে একবার করে এই কিছুক্ষণের দেখা হওয়া দেবীকান্তর সঙ্গে, তারই রেশ নিয়ে কেটে যেতো মাসের পনেরোটা দিন, তারপর আবার অমাবস্যার পর থেকে শুরু করতো দিন গুনতে। যাওয়ার দিন সকাল থেকে সারাটা সময় দেবীকান্তর মুখখানি ভাসতো মনের মধ্যে।

আজ কিন্তু মন্দিরে যাওয়ার পথে উত্তরার বার বার মনে পড়-ছিলো ইন্দ্রনারায়ণের কথাগুলো।—তাঁকে শাসিয়েছে বাসুদেব? কিসের জোরে? কী এমন ক্ষমতা আছে তার যে, গড় নাসিমপুরের রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে শাসাতে পারে?—মনে মনে অনেক কথাই ভাবছিলো উত্তরা। ইন্দ্রনারায়ণ বলেছে, বাসুদেব তাঁকে এমন জালে জড়িয়েছে যে তাঁর কিছু করবার উপায় নেই। কিসের জাল? উত্তরা ভেবে ভেবে কূল পেলো না। রাজা ইন্দ্রনারায়ণ প্রতিপত্তিশালী লোক, মোগল দরবারে ওঁর যথেষ্ট প্রভাব, তাঁকে কি

জালে জড়াতে পারে বাসুদেবের মতো একটি লোক! নিশ্চয়ই এর মধ্যে দেওয়ান শিবশঙ্করও আছে,—ভাবলো উত্তরা। নিশ্চয়ই কোনো বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তা নইলে অতো উদ্বিগ্ন হোতো না রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

জোর করে মন থেকে সব দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো উত্তরা। ভাবলো, যাক, আগে তো দেবীকান্তর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নি, তারপর অন্য ভাবনা ভাবা যাবে। ওর কথা মনে পড়তে উত্তরার আবার রাগ হোলো। ছিঃ, দেবীকান্ত ডাকাতি করে! আর উত্তরার কাছেই সে কথা গোপন রেখেছে এতদিন!

উত্তরার হাতে ছিলো একটা পান্নার আংটি। তাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলো সে।

রাজমহলে গঙ্গার ধারে এক স্নিগ্ধ গোধূলিতে উত্তরার আঙুলে এ আংটি পরিয়ে দিয়েছিলো দেবীকান্ত। মনে পড়লো সেদিনের কথাগুলো। তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। গঙ্গায় ভরা জোয়ার। অতি মন্থরগতিতে গঙ্গার বুকে ভেসে যাচ্ছে নানারকমের নৌকো, পানসি আর ছিপ।

"তোমার সঙ্গে তো দেখা হওয়ার সুযোগ বেশী হবে না," উত্তরা বলেছিলো, "আমি কি নিয়ে থাকবো?"

"এদ্দিন কি নিয়ে ছিলে?" জিজ্ঞেস করেছিলো দেবীকান্ত।

"হয়তো একদিন দেখা হয়েও যাবে, এ আশা নিয়ে ছিলাম এতদিন।"

"এবার নিশ্চয়ই আরো বেশী করে আশা করতে পারো," বলে দেবীকান্ত একটু হেসেছিলো।

"কিন্তু তুমি তো আমায় ভুলে গিয়েছিলে," অনুযোগ করেছিলো উত্তরা।

"না উত্তরা, একদিনের জন্যেও ভুলিনি। তোমার কথা আমার মনে পড়তো সব সময়।"

"কিন্তু আবার যে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে আমাদের। তুমি আমার কাছে আবার ফিরে আসবে তো?"

"আমায় ফিরে যে আসতেই হবে উত্তরা।"

উত্তরার গলায় ছিলো একটা সরু সোনার হার। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি খচিত একটি সোনার পদক ঝুলছে সেই হার থেকে। উত্তরা হার খুলে দেবীকান্তের হাতে দিয়ে বললো, "এটি তোমার কাছে রাখো। যখনই দেখবে তখনই মনে পড়বে যে তুমি আমায় কথা দিয়েছো।"

দেবীকান্ত সেই হার নিজের গলায় পড়লো। বললো, "তোমার স্পর্শ এখন থেকে সব সময় আমার বুকে লেগে রইলো। আমি ভুলবোনা যে আমি কথা দিয়েছি।" তারপর নিজের আঙুল থেকে একটি পান্নার আংটি খুলে উত্তরার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে বললো, "যখনই তাকাবে এই আংটির দিকে তখনই নিশ্চিত হয়ে ভাবতে পারবে যে, আমি আমার কথা রাখবো। আর হ্যাঁ, একটা কথা, —যখনই আমায় তোমার প্রয়োজন হবে, এই আংটি সমেত কাউকে পাঠিয়ে দেবে অষ্টভুজা দেবীর মন্দিরে মুরলীধরের কাছে। আমি খবর পেয়ে যাবো।"—

উত্তরার মনে পড়লো সেই সন্ধ্যার কথাগুলো। তার বুক ফেটে কান্না পাচ্ছে, চোখে যেন অন্ধকার দেখছে চারদিকে। এক দিকে তার বাবার জন্যে ওই দুর্ভাবনা, অন্যদিকে বাসুদেবের কাছে পাওয়া দেবীকান্তর সংবাদ,—উত্তরার মনে হোলো যেন আকাশটা ভেঙে পড়তে চাইছে মাথার উপর। সংসারে ওই একজনের উপরই তো তার ভরসা। তাকেও যদি হারাতে হয়, সে বাঁচবে কি নিয়ে।

ভেবেছিলো দেবীকান্তর সঙ্গে দেখা হতেই ঝগড়া করবে। কিন্তু দেখা হতে ততোটা রাগ আর রইলো না।

দেবীকান্ত অপেক্ষা করছিলো গঙ্গার ধারে। ললিতাকে

মন্দিরের ভিতর রেখে উত্তরা চলে এলো তার কাছে। তার দিকে তাকিয়ে মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করলো দেবীকান্ত। জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে উত্তরা? তোমার মুখ অতো শুকনো কেন? কাকা মশায় ভালো আছেন তো?"

উত্তরা স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো দেবীকান্তর দিকে। তার সরল আয়ত চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে ভাবলো, বাসুদেব নিশ্চয়ই মিছে কথা বলেছে।

"কি হোলো উত্তরা? কোনো কথা বলছো না কেন?"

উত্তরা চুপ করে রইলো।

"কি হয়েছে উত্তরা? বলো আমায়।"

উত্তরা আর সামলাতে পারলো না নিজেকে। অঝোরধারায় কেঁদে ফেললো।

উত্তরার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিলো দেবীকান্ত। দুজনে বসে পড়লো গাছের মোটা শেকড়ের উপর।

"বলো উত্তরা, কি হয়েছে? আমার যদি কিছু করার থাকে তো যথাসাধ্য করবো তোমার জন্যে।"

"দেবীকান্ত!"

"কি?"

"বাসুদেব কি বলেছে জানো?"

"বাসুদেব!"

"হ্যাঁ—।"

"সে আবার কি বললো তোমায়?"

"সে বলেছে তুমি নাকি ডাকাতের দল চালাও।"

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল দেবীকান্ত।

উত্তরা বলে গেল, "বাসুদেব বলেছে, ভুজঙ্গ ঠাকুরের যে পালিত পুত্র আছে রাজাবাবু নামে, সে নাকি তুমিই। এরকম মিছে কথা সে কেন বলে তোমার নামে?"

দেবীকান্ত কোনো উত্তর দিলোনা।

"বলো না দেবীকান্ত, বাসুদেবের এত স্পর্ধা কি করে হয় যে আমার কাছে এসে এসব কথা বলে তোমার নামে? তুমি আমার কাছে নেই বলেই তো সে এসব বলতে সাহস করে। তুমি আমায় কবে নিয়ে যাবে তোমার কাছে?"

উত্তরার মন থেকে একটা বোঝা নেমে যেতো যদি দেবীকান্ত একথা শুনে খুব জোরে হেসে উঠে বলতো,—না উত্তরা, এসব সত্যি নয়, বাসুদেব তোমাদের মিছে কথা বলেছে।

কিন্তু একথা বললো না দেবীকান্ত। চুপ করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো।

তার এই স্তব্ধতা দেখে উত্তরার বুক কেঁপে উঠলো। জল এলো চোখ ভরে। ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলো, "তুমি চুপ করে আছো কেন দেবীকান্ত?"

সে কোনো উত্তর দিলো না।

"দেবীকান্ত। বলো একটা কিছু।"

"কি বলবো?"

"তুমি চুপ করে থাকলে যে আমার মন ভেঙে যাবে।"

"কি বলবো বলো?"

"বাসুদেব যা বলেছে সে কি সত্যি?"

দেবীকান্ত উত্তরার দিকে ফিরে ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, "তাহলে বাসুদেব জানে একথা?"

উত্তরা ওর কথা নিজের কানে শুনেও বিশ্বাস করতে পারলোনা। কি বলছে দেবীকান্ত? সে চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইলো দেবীকান্তর দিকে।

দেবীকান্ত নিজের মনে বললো, "কিন্তু জানেই বা কি করে!"

"দেবীকান্ত!"

"কি?"

"কথাটা সত্যি তাহলে ?"

দেবীকান্ত চুপ করে রইলো।

আবার প্রশ্ন করলো উত্তরা. "কথাটা সত্যি ?" ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর মুখ, হিম হয়ে গেল বুকের ভিতরটা।

দেবীকান্ত আস্তে আস্তে বললো, "মিছে কথা নয়, তবে—"

"তবে কি ?"

"ডাকাতি করা বলতে সবাই যা বোঝে, ঠিক সে কাজ আমি করি না।"

উত্তরা অবাক হয়ে তাকালো দেবীকান্তর দিকে। বললো, "কি বলছো দেবীকান্ত, আমি বুঝতে পারছি না তোমার কথা।"

দেবীকান্ত বোঝাবার চেষ্টা করলো।

"দেখ উত্তরা, দেশে ঘোর অরাজকতা এসেছে। আইন কানুন বলে কিছু নেই এখন। শক্তিই একমাত্র আইন। তা না হলে আওরংজেব দারাকে হত্যা করে তখ্ত দখল করতে পারতো না। মিরজুমলা হানা দিতো না বাংলায়। শাহ শুজাকে রাজমহল ছেড়ে ঢাকায় পালিয়ে যেতে হোতো না। এ বছর দেশে ফসল হয়নি, আবাদ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রজাদের খাজনা কিন্তু মাপ হচ্ছে না। সুবাদার নাজিমের সরকারে তাদের খাজনা জমা হবে কিনা ঠিক নেই, কিন্তু জমিদারের পাইক পিয়াদা লাঠিয়ালেরা তাদের উপর অবাধ জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে, জোর করে খাজনা উসুল করছে তাদের কাছ থেকে। ঠগ, ডাকাত, হার্মাদ, মগ গাঁয়ে গাঁয়ে এসে হানা দিচ্ছে,—কিন্তু তাদের রক্ষা করার কেউ নেই। ফৌজদার কোতোয়ালেরা যে যার নিজের স্বার্থের ধান্দায় মশগুল হয়ে আছে। ব্যাপারীদের বেচাকেনা বন্ধ, কিন্তু তাদের সঞ্চিত ধন জোর করে কেড়ে নিচ্ছে ফৌজের লোকেরা, জমিদারের লোকেরা। ছোটো ছোটো জমিদারেরা নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, বড়ো জমিদারদের অর্থ সম্পদ ভূসম্পত্তি বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। দেশে আর রাজা নেই,

বাদশাহ্ নেই। আমার শক্তি আছে, সহায় আছে,—তাই সাধারণ লোকদের জন্যে যতোটুকু আমি করতে পারি, তাই করবার চেষ্টা করি। বাদশাহ্‌র আইন কানুন আমার সহায়তা করে না, তাই শাহী কানুন আমাকে তুচ্ছ করে চলতে হয়। যারা প্রবল, তাদের সঙ্গে আমায় লড়তে হয়, আমায় জোর খাটাতে হয়, আমার শক্তি দেখাতে হয় তাদের কাছে। তারা আমায় বলে ডাকাত,—কিন্তু যারা সাধারণ লোক, যাদের আমি বাঁচিয়ে রেখেছি মগ, হার্মাদ, দস্যু, ঠগ, আর অত্যাচারী জমিদার, ফৌজদারদের হাত থেকে, তারা আমায় ভালোবেসে বলে রাজাবাবু।"

উত্তরা চুপচাপ শুনলো। তারপর বললো, "আমি অতোসব বুঝি না। যাই বলো, অন্যের ধন যে লুঠ করে সে ডাকাত। না হয় তুমি অন্য ডাকাতের উপর ডাকাতি করো। নিজের জন্যে করো না, অন্যের জন্যে করো। তাহলেও তুমি ডাকাত। সাধারণ লোকে তোমায় শ্রদ্ধা করতে পারে, কিন্তু সমাজ তোমাকে স্থান দেবে না। এ পথ ছেড়ে দাও। অন্তত আমার জন্যে ছাড়ো।"

"তা নইলে? তুমি কি আমায় ছাড়বে?"

"আমি বলেছি নাকি সেকথা? আমি তোমায় ছাড়তে পারবো না, তাই তোমাকে এ পথ ছাড়তে হবে।"

উত্তরার কথা শুনে দেবীকান্ত কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "একদিন তো ছাড়বো নিশ্চয়ই, তবে বলতে পারছি না কতো শিগগির সেটা সম্ভব হবে। যেদিন ছাড়বো, সেদিন তোমায় নিয়ে সংসার পাতবো।"

"সংসার পাতবে? কোথায়?"

"ঠিক জানি না। তবে দক্ষিণে কোথাও। নতুন আবাদ গড়ে তুলবো সেখানে,—তুমি আমি মিলে। সেখানে মগ আসবে না, হার্মাদ আসবে না, মোগল আসবে না। সেটা হবে তোমার আর আমার আর সাধারণ চাষীদের রাজত্ব।"

"কিন্তু কবে ?"

"জানি না। খুব তাড়াতাড়ি কিছু হবে না। তবে চেষ্টা করছি খুব। কিন্তু শাহ শুজা আর মিরজুমলার মধ্যে যেই যুদ্ধ চলছে, এর একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত ভাবে কিছু হবে বলে বলা যায় না।"

উত্তরা কিন্তু কোনো কথা মানতে রাজী নয়। সে বললো, "আমি বসে বসে দিন গুনতে পারবোনা। গড় নাসিমপুরে দিন কাটানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে।"

"কি করবো বলো ?"

"তোমার এ পথ ছাড়ো। এক্ষুনি। আমি আছি তোমার সঙ্গে। চলো কোথাও চলে যাই আমরা। আমি এই মুহূর্তেই প্রস্তুত। তুমি যেখানে বলবে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবো। কিন্তু তোমায় আর ও পথে ফিরে যেতে দেবো না।"

দেবীকান্ত চুপ করে রইলো।

উত্তরা তাকিয়ে দেখলো দেবীকান্তর দিকে। তারপর বললো, "তোমাকে আজ আমার খুব প্রয়োজন দেবীকান্ত। শুধু আমার নয়, আমার বাবারও প্রয়োজন তোমাকে।"

দেবীকান্ত অবাক হয়ে উত্তরার দিকে তাকালো।

উত্তরা বলে গেল, "জানো আজ কি শুনলাম বাবার কাছে ? আসবার আগে যখন বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, তখন দেখি উনি খুব বিষণ্ণ ও ভাবনাগ্রস্ত হয়ে বসে আছেন। আমি জিজ্ঞেস করতে উনি বললেন—"

কথা শেষ হোলো না। বাধা পড়লো হঠাৎ। দেবীকান্তর নৌকোর একজন মাল্লা ছুটে এসে বললো, "রাজাবাবু, ঘোর বিপদ ! গড় নাসিমপুরের দেওয়ানজীর ছেলে বাসুদেব মজুমদার একদল মোগল পিয়াদা ও বরকন্দাজ নিয়ে এদিকে আসছে। চলে আসুন তাড়াতাড়ি।"

"বাসুদেব !" দেবীকান্ত উঠে দাঁড়ালো।

উত্তরার মুখ শুকিয়ে গেল। সে বলে উঠলো, "পালাও এক্ষুনি। এভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না। ওরা তোমায় ধরে নিয়ে যাবে।"

দেবীকান্তর মুখে কোনো ভয়ের ছাপ নেই, কোনো চাঞ্চল্য নেই। সে স্থির দৃষ্টিতে উত্তরার দিকে তাকিয়ে বললো, "বাসুদেব কি করে জানলো যে আমি এখানে এসেছি ?"

"জানি না। নিশ্চয়ই সে আমার পেছন পেছন এসেছে।"

"কেন ? তার সন্দেহ হোলো কি করে ?"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না দেবীকান্ত। কিন্তু তার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভালো নয়। তুমি পালাও এক্ষুনি।"

"তোমাকে এখানে একলা ফেলে ?" হাসলো দেবীকান্ত।

"আমার জন্যে ভেবো না। আমি এক্ষুনি মন্দিরে ফিরে যাচ্ছি।"

"যদি সে তোমার কোনো অসম্মান করে ?"

"দেবীকান্ত, রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মেয়ের অসম্মান করতে কেউ সাহস করবে না।"

"কিন্তু তুমি আমায় কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলে ? তুমি কী শুনেছো তোমার বাবার কাছে ?"

"সে কথা আরেকদিন বলবো। তুমি এখন চলে যাও এখান থেকে। দেরি কোরো না।"

"আবার দেখা হবে কখন ?"

উত্তরার চোখে জল এলো। বললো, "জানি না। বাসুদেব যখন টের পেয়ে গেছে, আমি কি আর আসতে পারবো এখানে ? তোমার আসাও নিরাপদ হবে না।"

"কিন্তু তাহলে যে তোমার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগই থাকবে না।"

"দেরী কোরো না দেবীকান্ত," উত্তরা অধৈর্য হয়ে উঠলো, "আমি খবর দেবো তোমায়। আমার হাতে তোমার এই আংটি

আছে। এটি দিয়ে আমি কাউকে পাঠিয়ে দেবো অষ্টভুজা দেবীর মন্দিরের মুরলীধরের কাছে।"

"উত্তরা!"

"আর দেরী কোরো না। আমি অনেক লোকের শোরগোল শুনতে পাচ্ছি। এদিকেই আসছে ওরা।"

"তুমি যাবে কি করে?"

"আমি জঙ্গলের ভিতর ওই পথ ধরে যাবো। ওপথে কেউ আসবে না।"

দুজনে বিদায় নিলো দুজনার কাছে। মন্দিরে ফিরে এলো উত্তরা।

মন্দিরে ললিতা অপেক্ষা করছিলো। তার মুখ শুকিয়ে গেছে ভয়ে। উত্তরাকে দেখে বললো, "আপনি এসে গেছেন দিদি? আমার যে কি ভয় হয়েছিলো। ছোটোবাবু এসেছেন বরকন্দাজ ও পিয়াদা নিয়ে।"

"আমার খোঁজ করতে এসেছিলো?"

"না। আমাদের পিয়াদা নীলরতন এসে বলে গেল। ছোটো বাবু ওঁর লোকজন নিয়ে গঙ্গার দিকে গেছেন।"

'বাসুদেব জানলো কি করে?" উত্তরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ললিতার দিকে।

ললিতার চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি। সে উত্তর দিলো, "সে আমি জানিনা দিদি। নিশ্চয়ই ওঁর মনে কোনো সন্দেহ হয়েছে। সকালে যেভাবে কথা বলছিলেন, তাতেই আমার মনে খটকা লেগেছিলো তখন। চলুন দিদি, আমরা চলে যাই।"

"অপেক্ষা করো কিছুক্ষণ। পূজোটা সেরে নি।"

দূরে গঙ্গার ধারের ওদিক থেকে একটা হৈ চৈ গণ্ডগোল শোনা যাচ্ছে অনবরত। দেবীকান্তর কি হোলো না জেনে সেখান থেকে নড়বার ইচ্ছে উত্তরার ছিলো না। সে ফুল ও প্রসাদের রেকাবি নিয়ে অষ্টভুজার মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। পূজারী ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ

হয়েছে, খুব স্নেহ করে উত্তরাকে। চারদিকের হৈ-চৈ উত্তেজনা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে পূজো দিলো উত্তরার হয়ে।

মন্দিরের ধারে কাছেও লোকজন জমেছে অনেক। ভুজঙ্গ ঠাকুরের পালিত পুত্র রাজাবাবুকে সবাই এক নামে চেনে। তাকে ধরার জন্যে যে ফৌজদারের পাইক বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছে গড় নাসিমপুরের বাসুদেব মজুমদার, একথা ছড়িয়ে পড়েছে গাঁয়ের লোকদের মধ্যে। সবারই মনে প্রবল উৎকণ্ঠা।

হঠাৎ শোনা গেল সবাই বলাবলি করছে, বাসুদেব মজুমদার রাজাবাবুকে ধরতে পারেনি।

সাধারণ লোককে কোনোদিন বিব্রত করতো না ভুজঙ্গ ঠাকুরের লোকেরা, ওদের নজর শুধু জমিদারদের ঐশ্বর্য ও সরকারের রাজস্বের উপর। সাধারণ লোক বরং মাঝে মাঝে উপকৃত হোতো ভুজঙ্গ ঠাকুর ও রাজাবাবুর কাছে। তাই একটা উল্লাস দেখা দিলো তাদের মধ্যে।

রাজাবাবুর নাম শুনে ললিতার চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে। উত্তরা নিশ্চিন্ত হয়ে পূজো সেরে ঠাকুর প্রণাম করে নেমে আসতে ললিতা জিজ্ঞেস করলো, "উনিই রাজাবাবু?"

তার ভয়ার্ত প্রশ্নের কোন উত্তর দিলো না উত্তরা। শান্ত কণ্ঠে বললো, "আমার পূজো সারা হয়েছে। এবার ফিরে চলো!"

উত্তরা পালকিতে চেপেছিলো খুব নিশ্চিন্ত হয়ে। কিন্তু খানিকটা পথ যেতে না যেতে বাসুদেব অন্যান্য লোকজন সঙ্গে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এলো পালকির পেছন পেছন। উত্তরা মুখ বাড়িয়ে দেখলো, বাসুদেবের মুখের উপর ফুটে উঠেছে একটা ক্রুরতার কাঠিন্য। সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে পালকির পাশে পাশে।

"তুমি কেন আসছো সঙ্গে সঙ্গে?" উত্তরা জিজ্ঞেস করলো।

বাসুদেব হেসে উত্তর দিলো, "চারদিকে চোর ডাকাত ঠগের উপদ্রব   তোমায় তো একলা ছা'   পারি

"আমার নিজের লোকজন সঙ্গে আছে। তোমার খবরদারি না করলেও চলবে।"

বাসুদেব হাসতে লাগলো নিজের মনে। কোনো উত্তর দিলো না সে।

উত্তরা বললো, "হয় তুমি এগিয়ে যাও, তা নইলে আমার পালকি এগিয়ে যেতে দাও।"

"আমি সঙ্গে থাকলে তুমি নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারবে।"

"তুমি সঙ্গে না থাকলেও আমার কোনো বিপদ হবে না।"

"কিছুই বলা যায় না," বাসুদেব উত্তর দিলো, "আমি খবর পেয়েছি যে একটি খুব নামজাদা ডাকাতের দল এদিকে এসেছে। আমি যদি তোমায় একলা ফেলে যাই, আর তারপরে তোমার কোনো বিপদ আপদ হয়, তাহলে আমি রাজামশায়ের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না।"

উত্তরা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো বাসুদেবকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আমার আবার কি বিপদ হবে?"

"কে জানে, যদি ডাকাতের দল তোমায় অপহরণ করার চেষ্টা করে? ওরা জানে যে গড় নাসিমপুরের রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মহলে অনেক ধনরত্ন আছে। ডাকাতদের এও একরকম অর্থ লাভ করার কায়দা। তোমায় ফিরে পাওয়ার জন্যে প্রচুর অর্থ দিতে রাজী হবেন তোমার বাবা।"

উত্তরা বললো, "আমি নিজের থেকে যেতে রাজী না হলে সংসারে এমন কোনো ডাকাত নেই যে আমায় ধরে নিয়ে যেতে পারে।"

বাসুদেব খুব জোরে হেসে উঠলো। তারপর বললো, "আমরা খবর পেয়েছি যে একটি ডাকাতের দল তোমায় ছল করে অপহরণ

করার পরিকল্পনা করেছিলো। আমি সময় মতো এসে উপস্থিত হলাম বলে তুমি বেচে গেলে। তুমি আমার উপর রাগ করছো কেন? তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

উত্তরা কোনো উত্তর না দিয়ে পালকির দরজাটা সজোরে টেনে দিলো। বাইরে শোনা গেল বাসুদেবের অট্টহাসি।

মহলে নিজের কক্ষে খুব অস্থির হয়ে পায়চারি করছিলো রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। এমন সময় উত্তরা ঘরে ঢুকলো। সে কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছে অষ্টভুজার মন্দির থেকে।

"শুনলাম, তুমি এখনো খাওনি?" উত্তরা জিজ্ঞেস করলো।

একথার উত্তর দিলো না ইন্দ্রনারায়ণ। পায়চারি করতে করতে দাঁড়িয়ে পড়ে ফিরে তাকালো।

উত্তরা দেখলো অত্যন্ত গম্ভীর তাঁর মুখ।

"আমি সব শুনেছি," বললো ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

"বাসুদেব বলেছে নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ। আগের জন্মে নিশ্চয়ই অনেক পাপ করেছি। নইলে স্বয়ং শ্রীমান বাসুদেবের মুখেই একথা আমায় শুনতে হবে কেন?"

"তুমি বিশ্বাস করেছো বাসুদেবের কথা?"

"তুমি কি বলতে চাও বাসুদেব আমায় মিছে কথা বলেছে?" চড়া গলায় বলে উঠলো ইন্দ্রনারায়ণ, "তুমি কি অস্বীকার করতে চাও যে তুমি প্রতিবারই অষ্টভুজা দেবীর মন্দিরে যেতে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে? তুমি কি একথা অস্বীকার করো যে গঙ্গার তীরে তুমি নির্জনে গোপনে মিলিত হতে একজনের সঙ্গে? একথা কি সত্যি নয় যে, আজো তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাত হয়েছিলো?"

"আমি কোনো কথাই অস্বীকার করছি না, বাবা," উত্তরা শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো, "আমার শুধু একথাই বক্তব্য যে, আমি এমন

কিছু অন্যায় করিনি যার জন্যে আমায় অপরাধীর মতো কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে!"

"আমি তোমার পিতা," বলে গেল রাজা ইন্দ্রনারায়ণ, "তোমার যে কোনো অশোভন কাজের জন্য জবাবদিহি চাইবার অধিকার আমার আছে।"

"কিন্তু আমি তো কোনো অন্যায় কাজ করিনি।"

"করোনি? তোমার এরকম অধঃপতন আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি না।"

"কি অধঃপতন আমার দেখলে?" শান্ত আয়ত চোখ মেলে সংযত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো উত্তরা।

"একজন কুখ্যাত দস্যুর সঙ্গে তুমি গোপনে অন্তরঙ্গতা করেছো। আমার মেয়ে হয়ে তুমি চৌধুরী বংশের নাম ডোবালে।"

"কে কুখ্যাত দস্যু আমি জানিনা," উত্তরা গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো, "দেবীকান্ত আমার ছেলেবেলার বন্ধু।"

"কে দেবীকান্ত?" গর্জে উঠলো রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, "আমি তাকে চিনি না। একজন সাধারণ ডাকাত, তাকে ধরতে পারলে ফৌজদারের লোক সাধারণ কয়েদির মতো তাকে কোতল করবে, তার সঙ্গে আমার কন্যার কোনো পরিচয় থাকতে পারে না।"

উত্তরা আস্তে আস্তে বললো, "একদিন রাজমহলে সে যদি আমায় বাঁচাবার জন্যে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে না পড়তো, তুমি আমায় ফিরে পেতে না বাবা।"

"সেটা বরং ভালোই হোতো," উত্তর দিলো ইন্দ্রনারায়ণ।

উত্তরার চোখে জল এলো। তার বাবা কোনোদিন তার সঙ্গে এত রূঢ় ভাবে কথা বলেনি।

"তার কী স্পর্ধা!" নিজের মনে গজরাতে লাগলো ইন্দ্রনারায়ণ।

"সে কোনো স্পর্ধা প্রকাশ করেনি বাবা," উত্তরা কোমল কণ্ঠে বললো, "আমি তাকে না ডাকলে সে কখনো আমার ধারে কাছেও আসতো না।"

"কি বলছো? সে স্পর্ধা প্রকাশ করেনি? এটা তার স্পর্ধা নয় যে, একজন সাধারণ ডাকাত হয়ে সে রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কন্যার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে আসে? কী আশা করে সে?"

"আমি তাকে যতোটুকু আশা দিয়েছি, ততোটুকুই আশা করে বাবা, তার বেশী কিছু নয়।"

"কি?" রাগে রাজা ইন্দ্রনারায়ণের মুখ শাদা হয়ে গেল। প্রথমটা মুখে কোনো কথাই সরলো না। তারপর খুব ধীর গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি তাকে কতোটুকু আশা দিয়েছো, সে কথা শুনতে পারি কি?"

"আমি তাকে এই আশা দিয়েছি," আস্তে আস্তে বললো উত্তরা, "জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি তারই জন্যে অপেক্ষা করে থাকবো।"

রাজা ইন্দ্রনারায়ণ ফেটে পড়ছিলো একথা শুনে, কোনোরকমে আত্মসংবরণ করলো। তারপর কঠিন কণ্ঠে বললো, "না, না, ওসব হবে না। এ অসম্ভব। স্পর্ধা তোমারও কম নয়। না, আমি আর বিলম্ব করবো না। এই শ্রাবণের মধ্যেই তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করবো, সে যেখানেই হোক।"

উত্তরা কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই দেখতে পেলো, একটি ছায়া পড়েছে পাশে। সে মুখ ফিরিয়ে দেখলো, বাসুদেব এসে দাঁড়িয়েছে তার পেছনে। মনে হোলো, বোধ হয় আড়ালে দাঁড়িয়ে এদের কথা শুনছিলো এতক্ষণ।

উত্তরা চুপ করে গেল।

ইন্দ্রনারায়ণ রাশভারী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো বাসুদেবকে, "কি চাই তোমার?"

বাসুদেবের মুখের উপর একটা নির্মম হাসি। সে উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো রাজা ইন্দ্রনারায়ণের দিকে। তারপর তাকালো উত্তরার দিকে।

উত্তরা ভ্রূকুঞ্চিত করে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

ইন্দ্রনারায়ণের দিকে ফিরলো বাসুদেব, তারপর উদ্ধত কণ্ঠে বললো, "আমার উত্তরাকে চাই।"

স্তম্ভিত হয়ে ওরা বাসুদেবের দিকে তাকালো, রাজা ইন্দ্রনারায়ণ ও উত্তরা দুজনেই। রাগে শাদা হয়ে গেল ইন্দ্রনারায়ণের সুগৌর মুখমণ্ডল। প্রথমটা মুখে কোনো কথাই এলো না। খানিকক্ষণ পরে ইন্দ্রনারায়ণ কোনোরকমে বললো, "তুমি এরকম নির্লজ্জ হতে পারো আমি ভাবতেই পারি না।"

"যা চাই তা নিঃসঙ্কোচে চাইছি, এতে লজ্জার কি আছে," নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিলো বাসুদেব মজুমদার।

"বাসুদেব!" রাগে ইন্দ্রনারায়ণের সারা শরীর কাঁপছে।

"বাবা!" ইন্দ্রনারায়ণের দিকে এগিয়ে উত্তরা তার হাত ধরে একটি আসনের উপর বসালো। তারপর বাসুদেবের দিকে ফিরে বললো, "তুমি এখান থেকে যাও। তোমার সঙ্গে আমরা কথা বলতে চাই না।"

"তোমরা কি চাও না চাও আমি জানতে চাইনা। কিন্তু আমি কথা বলতে চাই। আমার কথা এখনো শেষ হয় নি।"

ইন্দ্রনারায়ণ আবার উঠে দাঁড়ালো। ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে বললো, "আমার সামনে থেকে তুমি চলে যাও বাসুদেব। তা নইলে আমার আর মনে থাকবে না যে তুমি শিবশঙ্করের ছেলে।"

বাসুদেব আস্তে আস্তে বললো, "আমি আমার পিতার পরিচয় নিয়ে তো আপনার সামনে এসে দাঁড়াইনি। আমি আমার নিজের পরিচয় নিয়েই দাঁড়িয়েছি। গড় নাসিমপুরে আজ থেকে আপনার হুকুম চলবে না। চলবে শুধু আমার হুকুম।"

"উন্মাদের মতো কি যা তা বলছো বাসুদেব ? তুমি যদি এক্ষুনি না যাও আমি আমার পাহারাদারদের ডাকতে বাধ্য হবো। আমি কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে দিতে চাই না। তুমি যাও এখান থেকে।"

বাসুদেব একটু হাসলো। বললো, "কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে দিতে আমিও চাই না, রাজামশায়। পাহারাদারদের ডাকবেন ? ডাকুন।"

"বিষ্ণুরাম ! ভোলানাথ ! ওরে, কে আছিস !" হাঁক দিলো রাজা ইন্দ্রনারায়ণ।

কারো সাড়া পাওয়া গেল না।

"বিহারী লাল !" আবার ডাক দিলো ইন্দ্রনারায়ণ।

চারদিক যেন একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু দূরে আস্তাবলে শোনা গেল একটা মৃদু হ্রেষাধ্বনি।

"কেউ নেই। কেউ সাড়া দেবে না। কেউ আসবেও না," বললো বাসুদেব।

ইন্দ্রনারায়ণ যেন বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেল। একটা ভীতচকিত দৃষ্টি ফুটে উঠলো উত্তরার চোখে।

বাসুদেব হাসতে হাসতে বলে গেল, "আপনি জানেন না এখনো। ফৌজদারের সৈন্যেরা গড়ের ভিতর বসে আছে। নিরস্ত্র করা হয়েছে আপনার পাইক বরকন্দাজদের। তালা পরেছে হাতিয়ার-খানার দরজায়।"

ইন্দ্রনারায়ণ ও উত্তরা নির্বাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালো।

"আপনার একথাও জানা নেই," বাসুদেব বললো, ফৌজদার মহম্মদ কাসিম খাঁ শাহ শুজার পক্ষ ছেড়ে মিরজুমলার পক্ষে যোগ দিয়েছে।"

"সে কি !" মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো রাজা ইন্দ্রনারায়ণ,

"একথা আমি ভাবতেই পারিনি। আমার সর্বনাশ হোলো। তুমি তো আমায় বলেছিলে বাসুদেব, কাসিম খাঁ কোনোদিন শুজার পক্ষ ত্যাগ করবে না। সর্বনাশ, শুধু সেই তো জানে শুজার তোপখানার বেশির ভাগ অস্ত্র ও বারুদ আমার এখানে এনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আমি রাজী হইনি,—না বাসুদেব, আমি রাখতে রাজী হইনি,—শুধু তুমি আর শিবশঙ্কর আমায় বুঝিয়েছিলে যে কেউ জানতে পারবে না, শুজার হার হতে পারে না, শুজার সঙ্গে আওরংজেবের একটা মিটমাট হয়ে যাবে, শুজা বাংলা ও বিহারের সুবাদার হয়ে শাসন পরিচালনা করতে থাকবে আগের মতো। আমার একটুও ইচ্ছে ছিলো না। ভগবান জানেন, আমি এই যুদ্ধে কোনো পক্ষ অবলম্বন করতে চাইনি, শুধু তোমরা পিতাপুত্র মিলে আমায় ভুল পরামর্শ দিয়েছিলে,—না, না, বাসুদেব, আমি এই সর্বনাশ হতে দেবো না। কোথায়, তোমার বাবা শিবশঙ্কর কোথায়, ডাকো তাকে—"

ইন্দ্রনারায়ণ আত্মসংযম হারিয়ে বিচলিত হয়ে উঠলো ভয়ে ও দুর্ভাবনায়।

উত্তরা ওঁকে চেপে ধরে বললো, "তুমি ওরকম কোরো না বাবা। তোমার কোনো বিপদ হতে পারে না। কোনোরকম অন্যায় তো করো নি তুমি।" বাসুদেবের দিকে ফিরে বললো, "তুমি এখন এখান থেকে যাও বাসুদেব। বাবার এখনো খাওয়া হয়নি। এসব আলোচনা এখন না হলেও চলবে।"

বাসুদেব হাসতে হাসতে কঠিন কণ্ঠে বললো, "আপনার আর বাঁচবার কোনো উপায় নেই রাজামশায়। মিরজুমলা, কাসিম খাঁর কাছে খবর পেয়েছে যে শাহ শুজার তোপখানার প্রায় বেশির ভাগ তোপ, বন্দুক, বারুদ, গোলাগুলি মজুদ করা আছে গড় নাসিমপুরে। খবর হয় তো পেতো না। কিন্তু সেদিন আপনি আমার সঙ্গে যেরকম উদ্ধত ব্যবহার করলেন, উত্তরা ইদানীং আমাকে যেরকম

তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে শুরু করেছিলো, দর্পহারী মধুসূদন তো তার প্রতিবিধান না করে পারলেন না। তাই খবর পেয়ে গেল মির জুমলা।"

"উত্তরা!" আর্তনাদ করে উঠলো রাজা ইন্দ্রনারায়ণ।

বাসুদেব বলে গেল, "কাসিম খাঁর উপর হুকুম হয়েছে আপনাকে কয়েদ করার। গড় নাসিমপুর আর আপনার নয়। এটা হিন্দুস্তানের বাদশাহ আওরংজেবের নামে বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন বাংলার নতুন সুবাদার মিরজুমলা। এখন আমিই গড় নাসিমপুরের কিল্লাদার। আপনি এখন আমাদের বন্দী।"

স্তব্ধ হয়ে বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে রইলো রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

বাসুদেব বললো, "আর, আমিই আপনার কন্যার পানিগ্রহণ করছি আগামী মাসে। এতে আপনার বা আপনার কন্যার সম্মতির কোনো প্রশ্ন ওঠে না।"

"না, বাসুদেব, সেটা হবে না," বললো ইন্দ্রনারায়ণ, "ছলচাতুরি করে গড় নাসিমপুর তুমি দখল করতে পারো, কিন্তু চৌধুরীবংশের সম্মানহানি তোমাকে করতে দেবো না। আমার কন্যার বিবাহ তোমার সঙ্গে হতে পারে না। আমি বেঁচে থাকতে নয়।"

শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠে বাসুদেব জিজ্ঞেস করলো, "আমি উত্তরাকে বিয়ে করবো আমার ইচ্ছায়। আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপেক্ষা আমি করি না। আপনি আমায় ঠেকাবেন কি করে?"

"রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এখনো মরে যায় নি," বলে ইন্দ্রনারায়ণ ছুটে গেল দেওয়ালে প্রলম্বিত তলোয়ারের দিকে।

ঠিক এমন সময় কুড়ি পঁচিশজন সশস্ত্র পিয়াদার সঙ্গে সেঘরে প্রবেশ করলো মালদহের ফৌজদার মহম্মদ কাসিম খাঁ।

অস্ফুট কণ্ঠে রাজা ইন্দ্রনারায়ণ বলে উঠলো, "কি করে মোগল ঢুকলো গড়ের মধ্যে? আমি জানতেই পারলাম না?"

গড় নাসিমপুরের রাজা ইন্দ্রনারায়ণ রায় ও তাঁর কন্যা উত্তরা বন্দী হোলো নিজের মহলে।

পালকি চলছে খুব দ্রুত। উঁচু নিচু পথে ঝাঁকুনি লাগছে খুব। উত্তরার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু মনে আর কোনো বেদনাবোধ নেই। সে নিরুপায় হতাশায় আত্মসমর্পণ করেছে দুর্ভাগ্যের পায়ে। কয়েকদিনে ওলট-পালট হয়ে গেছে জীবনের ধারা। এত দ্রুত পটপরিবর্তন হয়ে গেছে যে, মনেই পড়ে না এই কদিনের কথাগুলো। সবই যেন ঝাপসা, আধো অন্ধকার।

কিন্তু প্রায় নিশ্চল সময় কাটাতে হচ্ছে কোনো রকমে। সামনে কি আছে ভেবে কোনো লাভ নেই। তাই পেছনে ফেলে আসা দিনগুলো চেষ্টা করে করে মনে করতে লাগলো উত্তরা।

পিতা ও কন্যাকে কিছুদিন একই মহলে রাখা হয়েছিলো।

বাইরে কড়া পাহারা। চেনাজানা কারো সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত অনেক কথা সে সময় ইন্দ্রনারায়ণের কাছ থেকে শুনে জানতে পেলো উত্তরা।

রায় রায়ান উমাকান্ত রায়ের সম্পত্তি দখল করার পরামর্শ দিয়েছিলো দেওয়ান শিবশঙ্করই। এভাবে সে নিজের প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করতে চেয়েছিলো। ইন্দ্রনারায়ণ আপত্তি জানিয়ে-ছিলো, কিন্তু তখন সে শিবশঙ্করের হাতের মুঠোয়, তার কথা অগ্রাহ্য করার উপায় ছিলো না। রাজস্বের হিসেবসংক্রান্ত কি একটা গোলমালে সুবাদার নাজিমের দেওয়ান প্যাঁচে ফেলেছিলো ইন্দ্র-নারায়ণকে, সে সময় শিবশঙ্করের পরামর্শে কিছু জাল দলিল-

দস্তাবেজ তৈরী করতে হয়েছিলো নিজের জমিদারি রক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু নিজের সততা রক্ষা করেনি শিবশঙ্কর মজুমদার। ইন্দ্রনারায়ণকে নানা ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলো যে, ইন্দ্রনারায়ণ যদি এর পর থেকে শিবশঙ্করের কথামতো না চলে, যদি জমিদারি পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে না দেয় তার উপর, এবং শিবশঙ্করের কাজে কর্মে সামান্যরকম হস্তক্ষেপও করে, তাহলে শিবশঙ্কর গড় নাসিমপুরের দেওয়ানের কাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য হবে,—এবং সোজাসুজি চাকরি নেবে সুবাদার নাজিমের দেওয়ানিতে। তখন হয়তো নতুন মনিবের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে জাল দলিল-দস্তাবেজ সম্পর্কিত সংবাদ দেওয়ানের কর্ণগোচর করে দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

ব্যস, সেই থেকেই শিবশঙ্করের হাতে নিরুপায় ক্রীড়নক হয়ে যেতে হোলো ইন্দ্রনারায়ণকে। সুবর্ণগ্রামের জমিদারি গড় নাসিম-পুরের এলাকাভুক্ত করা হোলো। গড় নাসিমপুরে নিয়ে আসা হোলো নিরাশ্রয় অনাথ দেবীকান্তকে।

ইন্দ্রনারায়ণ মনে মনে ভেবেছিলো কয়েকবছর পরে এই অন্যায়ের প্রতিকার করবে দেবীকান্তর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ দিয়ে। কিন্তু বিধাতা সে আশায় বাদ সাধলেন।

আওরংজেব আর শাহ শুজার মধ্যে যখন যুদ্ধ বেধে উঠলো, ইন্দ্রনারায়ণ বেশ বুঝতে পেরেছিলো যে বাংলায় শাহ শুজার শাসন শেষ হোলো। কোনো পক্ষ অবলম্বন করার ইচ্ছে তার ছিলো না। কিন্তু শিবশঙ্কর আর বাসুদেব বোঝালো যে, একটা মিটমাট হয়ে যাবে শিগ্‌গিরই। শাহ শুজাকে বাংলা-বিহারের সুবাদার হিসেবে স্বীকার করে নেবে বাদশাহ আওরংজেব। সুতরাং শাহ শুজাকে নানারকম ভাবে সাহায্য করলে ভবিষ্যতে উপকার হতে পারে। ইন্দ্রনারায়ণের ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু সে নিরুপায়। শিবশঙ্করের ইচ্ছাতেই সব কিছু করতে হোতো তাকে। শাহ শুজা যখন ঢাকায়

পালিয়ে যাচ্ছিলো, মির বকশি সয়িদ আলম তোপখানার যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ রাখতে চাইলো গড় নাসিমপুরে। ঢাকায় গিয়ে সেনাবাহিনী পুনর্গঠিত করে যদি আবার আক্রমণ চালানো হয় মিরজুমলার ফৌজের উপর, তখন ওসব আবার কাজে লাগবে। ইন্দ্রনারায়ণের আপত্তি ছিলো, যে কোনো সাধারণ বুদ্ধির লোকই তখন বুঝতে পারছে যে, শুজার চূড়ান্ত পরাজয় হয়েছে, সে আর ফিরে আসবে না। এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে, ঢাকা থেকে শুজা চলে যাবে চাট্গাঁও, সেখান থেকে গিয়ে আশ্রয় নেবে আরাকানের রাজার কাছে। কিন্তু শিবশঙ্কর ও বাসুদেব কানে তুললো না ইন্দ্রনারায়ণের আপত্তি। সয়িদ আলম ও ফৌজদার মহম্মদ কাসিম খাঁর সঙ্গে যোগসাজস করে শুজার তোপখানার যে অংশ বাঁচানো গেছে মিরজুমলার হাত থেকে, সেটা গড় নাসিমপুরে এনে তুললো। রাজা ইন্দ্রনারায়ণকে বললো, রাজমহলের এদিকে বড়ো দুর্গ নেই, একটা প্রথম শ্রেণীর দুর্ভেদ্য কেল্লা বানিয়ে তুলবো গড় নাসিমপুরকে। তাতে রাজা ইন্দ্রনারায়ণের ইজ্জত অনেকখানি বেড়ে যাবে জমিদার-জায়গিরদার সমাজে।

নিজের ইজ্জত বাড়ানোর লোভ ইন্দ্রনারায়ণের বিশেষ আর ছিলো না, কিন্তু শিবশঙ্করের নির্দেশ অবহেলা করার উপায় নেই। তাই তাকে রাজী হতে হোলো।

এবং শুজার তোপখানার সরঞ্জাম গড় নাসিমপুরে এনে তোলার কিছু পরেই ইন্দ্রনারায়ণ টের পেলো যে দোগাছির মোগল ফৌজের বকশি ইসলাম খাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছে বাসুদেব। আর তখন থেকেই ভয় ধরে গেল ইন্দ্রনারায়ণের মনে। আগে জানলে সে কিছুতেই রাজী হোতো না শুজার তোপখানার গোলাবারুদ নিজের হেপাজতে রাখতে।

সেদিন থেকে রাজা ইন্দ্রনারায়ণের চোখে আর ঘুম নেই। মন

খুলে যে সব কথা বলবে এমন কোনো আপনজনও নেই। তাই নিজের দুর্ভাবনার আগুনে নিজেই দগ্ধ হতে লাগলো চুপচাপ।

যা ভয় করছিলো, শেষ পর্যন্ত তাই হোলো।

কয়েকদিন পরে উত্তরাকে ইন্দ্রনারায়ণের কাছ থেকে সরিয়ে আলাদা মহলে নিয়ে আসা হোলো। উত্তরা বুঝতে পারলো যে এভাবে শুরু হচ্ছে বাসুদেবের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তুতি।

উত্তরা মনে মনে স্থির করলো যে, বাঁচবার আর কোনো পথ না পেলে জহর খাবে সে। কিন্তু তার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে।

প্রত্যেক দিন বিকেলে একবার করে সে দেখা করতে যেতে পারতো ইন্দ্রনারায়ণের কাছে। রাজা ইন্দ্রনারায়ণ ভেঙে পড়ছিলো আস্তে আস্তে। উত্তরা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলতো, "তুমি ভেবো না বাবা, আমাদের একেবারে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি একটা উপায় করবো।"

উত্তরার দেখাশোনা ও পরিচর্যা করার জন্যে ললিতা তখনো বহাল ছিলো। তার কাছে বাইরের জগতের কিছু কিছু খবর পেতো উত্তরা। সুরেশ্বরী গড় নাসিমপুরে আর নেই, তাকে কোথায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কেউ জানে না। গড় নাসিমপুরের কিলাদার হয়েছে বাসুদেব মজুমদার, তাকে পাঁচশো ঘোড়ার মনসব দেওয়ার ফরমান জারি করেছে বাদশাহ। মিরজুমলা তার উপর খুবই প্রীত। শুধু শাহ শুজার তোপখানার হদিশ দেওয়ার জন্যে নয়, আরো একটা কারণে মোগলরা তার উপর খুবই সন্তুষ্ট। আওরংজেবের পুত্র মহম্মদ সুলতানকে শাহ শুজার কাছ থেকে সরিয়ে এনে মিরজুমলার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসায় নাকি তার হাত ছিলো অনেকখানি। মহম্মদ সুলতানকে এখন কয়েদ করে রাখা হয়েছে। সে শুজার পক্ষে থাকলে হয়তো এত সহজে পরাজিত

করা যেতো না তাকে। শোনা যাচ্ছে নাসিমপুরের জমিদারি নাকি বাসুদেবকে দেওয়া হবে জায়গির হিসেবে, তার ফরমান জারি হওয়ার জন্যে বাদশাহর দরবারে সুপারিস গেছে সুবাদার নাজিম মির জুমলার কাছ থেকে।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণের ভবিষ্যত খুব অনিশ্চিত। বাসুদেব ও ফৌজদার মহম্মদ কাসিম খাঁর ইচ্ছে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে তাকে কোতল করা। কিন্তু দেওয়ান শিবশঙ্কর এই প্রস্তাবে এখনো রাজী হচ্ছে না।

মোগল ফৌজ খুঁজে বেড়াচ্ছে ভুজঙ্গ ঠাকুর ও রাজাবাবুকে। মিরজুমলার বাহিনীর রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা ওরা বার বার বানচাল করে দিচ্ছে, ফৌজী রসদ কেড়ে নিয়ে বিলিয়ে দিচ্ছে দক্ষিণের দুর্ভিক্ষপীড়িত চাষীদের মধ্যে, মাঝে মাঝে অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে। ভুজঙ্গ ঠাকুরের দল আরো বাড়ছে আস্তে আস্তে। মহম্মদ সুলতানকে মোগল ছাউনি থেকে বার করে নিরাপদে গঙ্গা পার করিয়ে ছিলো রাজাবাবু। শাহ শুজার হয়ে চাটগাঁর মগ ও দক্ষিণের হার্মাদদের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ করেছে সে। এজন্যে তার উপর মোগল সেনাধ্যক্ষদের খুব আক্রোশ। তার সন্ধান করার ভার দেওয়া হয়েছে বাসুদেব মজুমদারকে।

ইতিমধ্যে বাসুদেব দু-একবার দেখা করার চেষ্টা করেছিলো উত্তরার সঙ্গে। কিন্তু উত্তরা দেখা করতে রাজী হয়নি! বাসুদেবও বিশেষ জোর করেনি। অন্যান্য কতকগুলো জরুরী কাজে খুব ব্যস্ত সে। এখন তার উত্তরাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।— এখবরও উত্তরা পেলো ললিতার কাছে।

ফৌজদার কাসিম খাঁর পরিবারও এখন গড় নাসিমপুরেরই একটা অংশে আছে। খাঁ-সাহেবের পরিবারের মেয়েরা পরিচয় করতে চেয়েছিলো উত্তরার সঙ্গে। কিন্তু উত্তরা কোনো আগ্রহ দেখায় নি।

উত্তরার মহলে পাহারার কড়াকড়ি ছিলো একটু কম। কিন্তু উত্তরা কারো সঙ্গে দেখা করতে চাইতো না, কথা বলতো না কারো সঙ্গে। সারাদিনই জানালার কাছে বসে তাকিয়ে থাকতো বাইরের আকাশে মুক্ত বিহঙ্গদের দিকে। থেকে থেকে শুধু মনে পড়তো দেবীকান্তর কথা। সে কি শুনেছে তার এই দুর্ভাগ্যের সংবাদ!

আরেকটি শুক্লা চতুর্দশী এসে গেল।

নিজের ঘরে বসে ছটফট করছিলো উত্তরা। অনেকক্ষণ ভেবে ভেবে মরিয়া হয়ে দেবীকান্তর কাছে খবর পাঠানোর একটা উপায় স্থির করলো।

সেদিন ললিতা আসতে তাকে ডেকে বললো, "আমার জন্যে একটা কাজ করে দিবি?"

"কি কাজ দিদি?"

"আমাদের উদ্ধারের একটা উপায় করতে হবে তো।"

ললিতা একটু চুপ করে থেকে বললো, "হ্যাঁ, উপায় তো একটা করতে হবে।"

"আমি যা বলবো, করবি?"

"হ্যাঁ দিদি, করবো।"

"খুব বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে কিন্তু—।"

"তোমার জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি, দিদি," ললিতা উত্তর দিলো।

উত্তরা হাত থেকে দেবীকান্তর দেওয়া সেই পান্নার আংটি খুলে নিয়ে বললো, "অম্বিকাপুরে অষ্টভুজার মন্দিরে চলে যা। সেখানে মন্দির ঝাঁট দেয় মুরলীধর নামে যেই লোকটি, তাকে এই আংটি দেখিয়ে বলবি, তোকে রাজাবাবুর কাছে নিয়ে যেতে। ওঁর সঙ্গে যখন দেখা হবে, এই আংটি দিয়ে বলবি আমাদের অবস্থার কথা। পারবি তো?"

আংটি নিয়ে ললিতা চলে গেল।

ব্যস, সেই যে গেল, আর দেখা নেই।

একদিন কেটে গেল, দু-দিন কেটে গেল, তিন দিন কেটে যায় যায়।

এমন সময় সন্ধ্যার পর এলো দেওয়ান শিবশঙ্কর মজুমদার! কোনো ভূমিকা না করেই বললো, "মা, তোমায় এক কাপড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। এক্ষুনি। হাতে বেশী সময় নেই।"

হতবাক হোলো উত্তরা। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় যেতে হবে আমাকে?"

"এখন বেশী কথা বলার সময় নেই। বাসুদেবের হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে হবে তো! এসো।"

উত্তরা স্তম্ভিত হোলো। নিজের সন্তানের হাত থেকে এক নিঃসহায় নারীকে বাঁচাতে এসেছে দেওয়ান শিবশঙ্কর।

সে বুঝলো উত্তরার মনের দ্বিধা। বলে উঠলো, "জীবনে এক-বারের মতো তোমার এই বুড়ো ছেলেটিকে বিশ্বাস করো, মা। এসো আমার সঙ্গে।"

বিশ্বাস করলো উত্তরা। এমন একটা দৃপ্ত সতেজ সত্যের ছাপ ছিলো শিবশঙ্করের মুখের উপর যে, উত্তরা অবিশ্বাস করতে পারলো না। সে এককাপড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো শিবশঙ্করের পেছন পেছন।

বাইরে যে লোকটি পাহারায় ছিলো, দেখা গেল সে ঘুমিয়ে আছে। "শরবতের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছে একে," বললো শিবশঙ্কর, "দাঁড়িয়ো না। চলে এসো চুপচাপ—।"

"কিন্তু—"

"আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না মা। সব কথা বুঝিয়ে বলার সময় এখন নেই।"'

মহলের এদিকটা অন্ধকার। শিবশঙ্কর উত্তরাকে নিয়ে যেদিকে এলো সেদিকে উত্তরা আগে কোনোদিন আসেনি। অন্দরমহল অন্যদিকে, সুতরাং এদিকের অংশটি উত্তরার সুপরিচিত ছিলো না।

একটি সরু ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে শুরু করলো শিবশঙ্কর। মশাল জ্বালেনি, তাই উত্তরা হোঁচট খাচ্ছিলো বার বার।

কিছুক্ষণ পর শিবশঙ্কর চাপা গলায় বললো, "একটি গুপ্তপথ আছে গড় থেকে বাইরে যাবার, সে পথ আমি আর রাজামহাশয় ছাড়া আর কেউ জানে না, এমন কি বাসুদেবও নয়। বাইরে বেরিয়েই গঙ্গা। সেখানে একখানা ছিপ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।"

উত্তরা আশা করেছিলো ইন্দ্রনারায়ণও নিশ্চয়ই সঙ্গে আসবে, কিন্তু তাকে দেখতে না পেয়ে এবার জিজ্ঞেস করলো শিবশঙ্করকে।

শিবশঙ্কর উত্তর দিলো, "ওঁকে আনবার উপায় নেই। ওঁর ঘরের সামনে কড়া পাহারা। ওঁর জন্যে আমার তেমন ভাবনাও নেই। ওঁর কোনো ক্ষতি করতে সাহস করবে না বাসুদেব। আমার ভাবনা তোমার জন্যে।"

"কিন্তু আপনি কেন আমার জন্যে এই ঝুঁকি নিলেন, দেওয়ান কাকা?"

"আছে অনেক ব্যাপার। আজ তো সেসব বোঝানোর সময় নেই। সুযোগ হলে সব খুলে বলবো। আমি যা অন্যায় করেছি, এখন তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে একলা আমাকে। কি আর বলবো মা, আমার সব স্বপ্ন ধুলোয় ধ্বসে পড়লো।"

উত্তরা খুবই বিস্মিত হোলো শিবশঙ্করের কথা শুনে। তার এই ভাবপরিবর্তনের কোনো কারণই সে পেলো না।

সেই রাত্রে দেওয়ান শিবশঙ্করের সঙ্গে গড় নাসিমপুর থেকে পালিয়ে গেল উত্তরা।

শিবশঙ্কর উত্তরাকে লুকিয়ে রেখেছিলো এক অভিনব জায়গায়।

গড় নাসিমপুর মালদহের ফৌজদার মহম্মদ কাসিম খাঁর দখলে যেতে সুরেশ্বরী সেখান থেকে চলে এসেছিলো। অন্যলোকের তাঁবে থাকার মতো ধাত তার নয়। বাসুদেবকে ভর্ৎসনাও করেছিলো ইন্দ্রনারায়ণ আর উত্তরার সঙ্গে তার দুর্ব্যবহারের জন্যে।

কিন্তু বাসুদেব পিসীর কোনো কথা কানে তোলেনি। বরং বলেছিলো, "তুমি চলে যেতে চাইছো, ভালোই। তোমার আর এখানে থেকে কাজ নেই পিসী। তুমি কাশী চলে যাও।"

"চারদিকে লড়াই চলছে, আর এর মধ্যে আমি যাবো কাশী?"

"যুদ্ধবিগ্রহ গোলমাল সব থেমে গেছে পিসী। পথ ঘাট এখন অনেক নিরাপদ হয়ে গেছে। বাবাকে বলছি, উনি তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবেন।"

বাসুদেব নিজের কাজে খুব ব্যস্ত। পিসীর যাওয়ার কি ব্যবস্থা হোলো না-হোলো সে সম্বন্ধে খবর রাখবার সময় তার নেই। শিবশঙ্করকে বলেই সে নিজের কর্তব্য সম্পূর্ণ মনে করলো।

শিবশঙ্কর কিন্তু সুরেশ্বরীকে কাশী পাঠালো না। সুরেশ্বরীর শ্বশুরবাড়ি ছিলো সাত-আট ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে। দূর সম্পর্কের এক ভাশুর-পো আর এক বিধবা ননদ ছাড়া আর কেউ থাকতো না সেখানে। শিবশঙ্কর সেখানেই পাঠিয়ে দিলো সুরেশ্বরীকে। কেউ কোনো খোঁজ করলো না সুরেশ্বরীর। বাসুদেব এবং অন্যান্য সবাই ধরে নিলো সুরেশ্বরী কাশী গেছে। শিবশঙ্করও সুরেশ্বরীর খবর জানালো না কাউকে।

সেই সুরেশ্বরীর কাছেই উত্তরাকে রাতারাতি পৌঁছে দিয়ে গড় নাসিমপুরে ফিরে এলো শিবশঙ্কর। কেউ জানলো না একথা।

উত্তরাকে পেয়ে সুরেশ্বরী খুব খুশী হয়েছিলো, কেঁদে ফেলেছিলো তাকে জড়িয়ে ধরে।

শিবশঙ্কর বলেছিলো,—উত্তরা এখানে নিরাপদ। কেউ তার খোঁজ করতে এখানে আসবে না। বাসুদেব ধারণাই করতে পারবে না যে উত্তরা এখানে চলে আসবে। সে নিশ্চয়ই ভাববে, দেবীকান্তর হাত আছে উত্তরার অন্তর্ধানের রহস্তে।

"তবে তোমরা একটু সাবধানে থেকো," সতর্ক করে দিয়েছিলো শিবশঙ্কর, "রাজা ইন্দ্রনারায়ণকে যতোদিন না বার করে আনতে পারছি, ততদিন উত্তরাকে এখানেই থাকতে হবে।"

কেটে গেল দুটো দিন। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, উৎকণ্ঠার চাপে দীর্ঘ একঘেয়ে সেই দিনগুলো।

তারপর আজ বেলা দ্বিপ্রহরে হঠাৎ বাড়ি এসে চড়াও হোলো কুড়ি বাইশজন লোক। বাধা দিতে গিয়ে জখম হোলো সুরেশ্বরীর ভাশুর-পো। সুরেশ্বরীর ক্রন্দন রোল শুনে এগিয়ে এসেছিলো প্রতিবেশীরা। কিন্তু এদের হাতে তলোয়ার বন্দুক দেখে বাধা দিতে সাহস করেনি।

উত্তরা হট্টগোলের মধ্যে পালাবার চেষ্টা করেছিলো বাড়ির পেছনের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। কিন্তু ওরা ধরে ফেললো উত্তরাকে, হাত পা মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে একটি পালকিতে তুলে দিলে।

পালকির অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে উত্তরা ভাবলো,—এমন আমার নিয়তি, আমায় আবার কোথায় নিয়ে চলেছে কে জানে!

হেলতে দুলতে দুলতে পালকি খুব দ্রুত চালে চললো ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, অন্ধকার উঁচু নিচু পথ ধরে।

: পাঁচ :   ঃ বাসুদেব মজুমদারঃ

গড় নাসিমপুরের বাইরের মহলের একটি নিভৃত কক্ষে একলা পায়চারি করছিলো বাসুদেব মজুমদার। অন্ধকার ঘর। আলো জ্বালাতে দেয়নি পরিচারককে। বিশেষ কোনো কারণ ছিলো।

জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো বাসুদেব। বাইরে অন্ধকার রাত। পশ্চিম আকাশে একফালি চাঁদ আস্তে আস্তে ঢলে পড়ছে ঘন অরণ্যের অন্তরালে। অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে বাইরের আকাশে। জানালার বাইরে খাড়া দেওয়াল নেমে গেছে। অনেক নিচে পরিখার জলপ্রবাহের অস্পষ্ট আভাস। ভাঁটার টান আসতে শুরু করেছে। খালের জলস্রোত বইতে শুরু করেছে ওধারে গঙ্গার দিকে। খালের ওপারে ঘন জঙ্গল। গাছগুলো শাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে প্রেতলোকের অধিবাসীদের মতো। এতটুকু হাওয়া নেই, গাছের পাতা নড়ছে না, বিন্দুমাত্র শোনা যাচ্ছে না পাতার মরমর ধ্বনি। দূর থেকে মাঝে মাঝে শুধু ভেসে আসছে গা-ছমছমানো শৃগাল রব।

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খালের ওপারের ঘন

জঙ্গলের দিকে নিরীক্ষণ করলো বাসুদেব। না, এখনো সময় হয়নি। নিশ্চয়ই এতক্ষণে এসে গেছে,—বাসুদেব ভাবলো,—আত্মগোপন করে আছে ওই ঘন জঙ্গলের মধ্যে, সঙ্কেতের অপেক্ষা করছে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। বাসুদেব নিজের মনে একটু হাসলো। দেবীকান্ত জানেনা যে বাসুদেব এখানে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রতীক্ষায়।

কাছেই দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো ছিলো বাসুদেবের তলোয়ার। অস্তগামী চাঁদের অতি ক্ষীণ আলোয় একটুখানি চিকচিক করে উঠছে ইস্পাতের খাপ। একবার সেদিকে তাকালো নিজের মনে। আবার হাসলো একটুখানি। এই দুনিয়ায় ওই তার একমাত্র বন্ধু। দিনকাল যা পড়েছে, তাতে ওরকম একটি তলোয়ার, তার সঙ্গে কিছু সাহস কিছু বুদ্ধি আর একটুখানি ভাগ্য থাকলে বহুদূর এগিয়ে যাওয়া যায়।

আবার পায়চারি করতে শুরু করলো বাসুদেব। বার বার মনে পড়লো পুরোনো দিনের অনেক টুকরো টুকরো কথা। অনেক দিন ধরে সে ধৈর্য ধরে তার জাল বুনেছে, এখন সেই জাল গুটিয়ে আনছে আস্তে আস্তে। নতুন পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে তার জীবনে। সামনে এখন শুধু সম্মান, প্রতিপত্তি আর সাফল্যের সার্থক প্রত্যাশা।

সে দেওয়ানের ছেলে। তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে শুজার তাঁবেদার এক সাধারণ জমিদার, তাকে অবজ্ঞা অবহেলা করেছে তার দাম্ভিক কন্যা। এ অপমান কোনোদিন ভুলতে পারেনা সে। এখন দেখিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে দেওয়ানের ছেলে শুধু ভাগ্য আর তলোয়ারকে সম্বল করে কতদূর এগিয়ে যেতে পারে।

তার সন্দেহ হয়েছিলো তখনই,—সেই আড়াই বছর আগে যখন সে রাজমহলে ছিলো। তখন সবে হৈ চৈ পড়ে গেছে সারা হিন্দুস্তানে, জোর গুজব শোনা যাচ্ছে চারদিকে যে বাদশাহ শাহজাহানের

মৃত্যু হয়েছে আগ্রায়। রাজমহলে শুজা প্রস্তুত হচ্ছে সসৈন্যে আগ্রা অভিমুখে রওনা হওয়ার জন্যে।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণ, দেওয়ান শিবশঙ্কর আর সুরেশ্বরীর সঙ্গে উত্তরাও এসেছিলো রাজমহলে।

ভুজঙ্গ ঠাকুরের নাম সে আগেই শুনেছিলো। রাজাবাবুর নাম তার কানে এলো সেই প্রথম।

রাজ মহলের ধারে কাছে কয়েকটা বড়ো ডাকাতি হয়ে গেল। ওই অঞ্চলের ফৌজদার একটু তৎপর হয়ে উঠেছিলো, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল সে আর কোনো আগ্রহ প্রকাশ করছে না এ ব্যাপারে। চাপা কানাঘুসো শোনা গেল,—ভুজঙ্গ ঠাকুরের মারফত বিদেশী হার্মাদদের নওয়ারায় নিযুক্ত করার চেষ্টা করছে শাহ শুজা। ছোটো খাটো ডাকাতির জন্যে বিচলিত হওয়ার অবসর শাহ শুজার সরকারের নেই।

মির বকশি সয়িদ আলমের সঙ্গে বাসুদেবের কথা হচ্ছিলো একদিন। বাসুদেব বললো, "আমার উপর ভার দিন। আমি কথা দিচ্ছি, একদিনে সব ডাকাতি বন্ধ হয়ে যাবে।"

"এখন এসব ব্যাপারে মন না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমাদের গুলি বারুদ রসদ সবকিছু খুব হিসেব করে খরচা করতে হচ্ছে। উপস্থিত আমাদের ফৌজের কি কোতোয়ালির পিয়াদাদের যতো বিশ্রাম দেওয়া যায় ততোই ভালো। ডাকাতের সন্ধান করতে গিয়ে যদি একটি ছিপও খোয়া যায়, কি একটি গুলিও খরচা হয়, অথবা একজন সৈন্যেরও প্রাণ যায়, সেটা আমাদের চরম ক্ষতি।"

"কিন্তু এভাবে ডাকাতি হতে থাকলে আমাদের ক্ষতি হবে না?"

"কিসের ক্ষতি?"

"নানা পরগণা থেকে জমিদারেরা আসছে নজরানার অর্থ নিয়ে, সে অর্থ ডাকাতের হাতে যাওয়া কি বাঞ্ছনীয়?"

সয়িদ আলম কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো বাসুদেবের দিকে।

তারপর বললো, "এ পর্যন্ত পাঁচটি বড়ো ডাকাতির খবর আমাদের কাছে এসেছে। যাদের ঘরে ডাকাতি হয়েছে প্রত্যেকেই জমিদার। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই যে আমাদের বন্ধু বা শুভাকাঙ্খী, সেকথা কি তুমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারো ?"

বাসুদেব একটু ভাবলো। তাই তো! ইকবালপুরের শ্রীমন্ত রায়, গৌরীগ্রামের শম্ভুনাথ ঘোষ, বিবিবাজারের সলিম-উল্লা খাঁ, নাটোরের শ্যামাকান্ত লাহিড়ী, দেবীনগরের মুশারফ হোসেন,—কেউই তো শাহ শুজার পক্ষপাতী নয়। এরা প্রত্যেকেই শাহ শুজার খাজিনাহ্-তে অর্থ দিতে অস্বীকার করেছে, জানিয়েছে যে আগ্রা থেকে নির্ভরযোগ্য নির্দেশ না এলে ওরা সুবাদার নাজিমের দেওয়ানিতে আর রাজস্ব দাখিল করবে না। ওমরাহ্ অলাওয়ার্দি খাঁ বলেছিলো, এদের প্রত্যেককে ধরে ধরে কোতল করা হোক। কিন্তু শুজা কোমল প্রকৃতির লোক। এরকম চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় মনে করেনি। সয়িদ আলমও সায় দেয়নি। সে বলেছিলো যে, এরা প্রভাবশালী জমিদার, শুজার ফৌজ যখন পশ্চিমের দিকে অভিযান করবে, তখন এদিকে শত্রুভাবাপন্ন জমিদার না থাকাই ভালো। এদের না ঘাঁটালে এরা নিরপেক্ষ থাকবে, বিশেষ ক্ষতি করবে না। কিন্তু এদের দু-চার জনকে কোতল করলে অনেক হিন্দু জমিদার শুজার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠবে। বরং কয়েকটা যুদ্ধে শুজার ফৌজ সাফল্য লাভ করলে এরা সঙ্গে সঙ্গে শুজার পক্ষে এসে যোগ দেবে।

বাসুদেবকে চুপকরে ভাবতে দেখে সয়িদ আলম হেসে বললো, "এরা যখন আমাদের সহায়তা করছে না, তখন এদের রক্ষা করার কোনো দায়িত্বও আমাদের নেই।"

"কিন্তু এরা কি লোক বেছে ডাকাতি করছে ?" বাসুদেব জিজ্ঞেস করলো, "যদি আমাদের পক্ষভুক্ত কোনো জমিদারের বজরা এরা লুঠ করে ?"

"করবে না," সয়িদ আলম উত্তর দিলো, "ধরে নাও, এরা বেছে বেছে ডাকাতি করছে।"

"কিন্তু এই সব ডাকাতি করছে কারা?" বাসুদেব জিজ্ঞেস করলো, "ভুজঙ্গ ঠাকুরের লোকেরা নিশ্চয়ই।"

"ভুজঙ্গ ঠাকুর এখানে নেই," বললো সয়িদ আলম।

"কোথায় সে?"

"সে গেছে দক্ষিণে, সাগরদ্বীপের হার্মাদ পেড্রোর সঙ্গে কথা বলতে।"

"তাহলে এই ডাকাত দলের দলপতি কে?"

"রাজাবাবুর নাম শুনেছো?"

"রাজাবাবু?"

"হ্যাঁ। ভুজঙ্গ ঠাকুর তাকে মানুষ করেছে। সেই করছে এদের নেতৃত্ব।"

অনেকক্ষণ ভাবলো বাসুদেব। তারপর বললো, "আচ্ছা, আমি যদি তাকে ধরে আনতে পারি?" যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়, নানা ফন্দি ফিকির করে এখন শুজার নেকনজরে পড়া দরকার একটা ভালো মনসব পাওয়ার জন্যে। বাসুদেব ভাবলো, একজন নামজাদা ডাকাত ধরা মন্দ ফিকির নয়। আসল যুদ্ধে সৈন্যদল পরিচালনা করার চাইতে কয়েকজন ডাকাত ধরায় প্রাণের ঝুঁকি অনেক কম।

হাসলো সয়িদ আলম। বললো, "শাহ শুজা খুবই অসন্তুষ্ট হবেন।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো বাসুদেব।

"শাহ শুজা রাজাবাবুর কাছ থেকে মোটারকমের নজরানা পাচ্ছে।"

"ও—।" চুপ করে গেল বাসুদেব। সাম্প্রতিক রাজনীতির আরেকটি রূপ পরিস্ফুট হোলো তার কাছে।

ওরা তখন শাহ্ শুজার খাস মজলিসে হাজির হওয়ার জন্যে

অপেক্ষা করছিলো বাইরের প্রাঙ্গনে। ভিতরে অলাওয়ার্দি খাঁ ও আরেকজন ব্যক্তির সঙ্গে গোপন আলোচনায় নিমগ্ন ছিলো শাহ শুজা। কক্ষের দ্বার বন্ধ। বাইরে পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র হাবসীরা।

একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো বাসুদেব। এখানকার কাজ সেরে সে যাবে রাজা ইন্দ্রনারায়ণের হাবেলিতে।

"বেশ দেরী হবে মনে হচ্ছে," বললো বাসুদেব।

"হ্যাঁ, তা দেরী একটু হবে," উত্তর দিলো সয়িদ আলম, "শুনলে কি বিস্মিত হবে যে, অলাওয়ার্দি খাঁর সঙ্গে আরেকজন যে ভিতরে বসে আছে, তারই নাম রাজাবাবু।"

"সেই রাজাবাবু?" বাসুদেব এবার রীতিমতো বিস্ময়গ্রস্ত হোলো। তারপর বললো, "ভালোই হোলো। তাকে একবার চোখে দেখতে পাবো। এদিক দিয়েই তো বেরোবে সে।"

"না, এদিক দিয়ে বেরোবে না।"

"কেন?"

"কেউ যে তার মুখ চিনে রাখে এটা সে চায় না। ওকে শুধু দেখেছে শাহ শুজা, অলাওয়ার্দি খাঁ, বুলন্দ আখতার, মির্জা বেগ আর দেখেছি আমি। খুব সুপুরুষ, রাজপুত্রের মতো চেহারা। সে এসেছে গোপনে, বেরিয়েও যাবে গোপনে। সে যখন শাহ শুজার কাছে আসে, তখন তার নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব মির্জা বেগের।"

"সে বেরোবে কোন পথ দিয়ে?"

"এখান থেকে বেরোবার পথ কি একটা নাকি?"

বাসুদেব আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করলো না।

সেদিন শাহ শুজার সঙ্গে সাক্ষাত হোলো না। পরদিন সাক্ষাত করতে গেল আবার।

শাহ শুজার সঙ্গে সাক্ষাত করে বাসুদেব যখন নিজের আবাসে ফিরে এলো তখন দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে। এসেই শুনলো উত্তরা গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে গিয়েছিলো। অল্পের জন্যে

প্রাণরক্ষা হয়েছে। খবর পেয়েই ছুটে এলো বাসুদেব। এসে শুনলো কোনো এক সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবাপুরুষ নিজের বজরা থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে উত্তরাকে বাঁচিয়েছে। একথা শুনে তার রাগ হোলো খুব। নিজের ইজ্জত অন্যের চোখে বাড়ানো যায় এরকম সব সাহসিকতার কাজগুলো অন্য লোকে করছে, এরকম কিছু শুনলেই তার গাত্রদাহ শুরু হোতো। মুসলমানদের উপর বিদ্বিষ্ট হয়ে লাভ নেই, হুকুমত মুসলমানের,—কিন্তু কোনো হিন্দু শাহ শুজার নেক নজরে পড়লেই বাসুদেবের অসহ্য লাগতো। তাকে মনে হোতো নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী। রাজাবাবুর মতো একজন সাধারণ দস্যুকেও যে শাহ শুজা এত খাতির করছে, অথচ বাসুদেব এখনো একজন সামান্য মনসবদার, এ আর সহ্য করতে পারছিলো না বাসুদেব। এখন উত্তরাকে আরেকজন যুবাপুরুষ জলনিমজ্জন থেকে বাঁচিয়েছে শুনে তীব্র বিষের দহন অনুভব করলো মনের মধ্যে।

না, উত্তরাকে সে ভালোবাসতো না,—অন্তত লোকে যাকে ভালোবাসা বলে, সেটা ওর মনের মধ্যে নেই। জীবনে তার তিনটি জিনিসই কাম্য,—ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা। ছেলেবেলা থেকেই একটা হীনমন্যতা গড়ে উঠেছিলো তার মধ্যে। রাজবাড়িতে সে মানুষ, তবু সে রাজবাড়ির কেউ নয়। উত্তরা ও দেবীকান্ত নামে সেই ছেলেটির খেলার সঙ্গী ছিলো সে, তবু তাদের সমান সে নয়। সে চিরকাল দেখে এসেছে উত্তরার বাবা আর দেবীকান্তর. বাবা হুকুম দিয়েছে, তার বাবা হুকুম মেনেছে। এখন আর সেদিন নেই.। তবু সেদিনের কথাগুলো ভুলে যায়নি সে। সুবর্ণগ্রামের রায় রায়ান উমাকান্ত রায় তীব্র ভৎ´সনা করেছিলো শিবশঙ্করকে, শিবশঙ্কর নতমুখে দাঁড়িয়ে শুনেছিলো,—সে কথা এখনো মনে পড়ে মাঝে মাঝে।

তাই সে চিরকাল ভেবে এসেছে, এদের থেকে বড়ো হতে হবে, ছলে বলে কৌশলে, যে করেই হোক। দেবীকান্ত আজ আর নেই,

কিন্তু তার ছায়া আজো আছে মনের মধ্যে। সে আছে উত্তরার মনের মধ্যে, এমন কি রাজা ইন্দ্রনারায়ণের মনের মধ্যেও,—বেশ বুঝতে পারে বাসুদেব। মনে হয়, ওরা হয়তো মনে মনে তাকে তুলনা করে দেখে দেবীকান্তর সঙ্গে। অসহ্য লাগে বাসুদেবের। সুবর্ণগ্রাম আর গড় নাসিমপুর তার চাই, তা নইলে সে উমাকান্ত রায় আর ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর থেকে বড়ো বলে স্বীকৃতি পাবে না নিজের অন্তরের কাছে। আর উত্তরাকে তার চাই,—তা নইলে তার নিজেরই মন তাকে চিরকাল দেবীকান্তর থেকে ছোটো ভাববে। সুতরাং সুবাদারের সরকারে তার সাফল্য চাই উত্তরাকে পাওয়ার জন্যে, উত্তরাকে চাই সুবর্ণগ্রাম-গড় নাসিমপুর পাওয়ার জন্যে, নিরুদ্দিষ্ট দেবীকান্তকে অপাংক্তের মনে করবার জন্যে। উত্তরার কাছে তার পৌরুষ কোনোরকমে ক্ষুণ্ণ হয় এটা সে সহ্য করতে পারতো না।

তাই আজ যখন শুনতে পেলো যে উত্তরাকে উদ্ধার করেছে এক অপরিচিত সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবাপুরুষ, তখন একটা জ্বালা শুরু হলো তার সারা শরীরে। এই ঘটনা থেকে আরো অনেক কিছুর সূত্রপাত হতে পারে। সে খবর পেয়েই ছুটে এলো রাজা ইন্দ্রনারায়ণের হাবেলিতে। এসে খবর শুনে নিশ্চিন্ত হোলো,—যাক, সেই উদ্ধারকর্তার পরিচয় বা খবর এরা কেউই জানেনা।

সে এসে নানারকম প্রশ্ন করলো উত্তরাকে। ওর নিরুৎসাহ উত্তর শুনে বেশ বুঝতে পারলো, সে পছন্দ করছে না তার সান্নিধ্য। কিন্তু বাসুদেব তাতে ভ্রূক্ষেপ করলো না।

সে আরো ঘন ঘন আসতে লাগলো উত্তরার কাছে। নিজের সম্বন্ধে সত্যিমিথ্যে নানারকম বাহাদুরির গল্প বলে চমৎকৃত করতে চাইলো উত্তরাকে। সে চুপচাপ শুনে যেতো। তার আগ্রহের অভাব অনুভব করতে পারতো বাসুদেব। তার জেদ আরো বাড়তে লাগলো।

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে আরতি দেখতে যায় উত্তরা। বাসুদেব লক্ষ্য করলো যে, যতো কাজই থাকনা কেন, বিকেল হয়ে আসতে না আসতে সে একটু আনমনা হয়ে যায়। অপরাহ্ণে প্রায় সময়ই একসঙ্গে বসে গল্পসল্প করে রাজা ইন্দ্রনারায়ণ, শিবশঙ্কর, সুরেশ্বরী আর বাসুদেব। উত্তরাও থাকে—কিন্তু সন্ধ্যে হওয়ার আগেই উঠে পড়ে। রাজা ইন্দ্রনারায়ণ দু-একদিন উত্তরাকে বলেছিলো, না যেতে। সবাই একসঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছে, ওঁর বেশ ভালো লাগছে সবার সঙ্গে। এর মধ্যে একজন উঠে চলে গেলে ভালো লাগে না। কিন্তু ওঁর কথা উত্তরা শুনলো না। একদিন বাসুদেব নিজেই যেতে চেয়েছিলো উত্তরার সঙ্গে, কিন্তু একথা শুনে উত্তরার মুখ রাগে এতখানি রাঙা হয়ে উঠেছিলো যে, সে কোনো উত্তর দেওয়ার আগে রাজা ইন্দ্রনারায়ণই তাকে বলেছিলো,—না, ও একাই যাক। তুমি বোসো আমাদের কাছে। তোমার কাছে দরবারের গল্প শুনতে বেশ ভালো লাগে। হ্যাঁ বলো, সয়িদ আলম আর মির্জা বেগএর ঝগড়ার সেই ঘটনাটা।

সেদিন একটা মতলব এঁটেই এসেছিলো বাসুদেব। অনেকক্ষণ সবার সঙ্গে নানারকম গল্পগুজব করার পর বললো, "ভাবছি, আজ সন্ধ্যায় সবাই মিলে গঙ্গায় বেড়ালে কেমন হয়। বজরার মাঝিদের খবর দিই সব ব্যবস্থা করতে।"

"শুনছি, খুব ডাকাতি হচ্ছে আজকাল," রাজা ইন্দ্রনারায়ণ বললো।

"আমি থাকতে কিসের ভয়," আশ্বাস দিলো বাসুদেব, "সুলতান বুলন্দ আখতারের প্রিয়পাত্র মনসবদার বাসুদেব মজুমদার যে বজরায় থাকবে, সে বজরায় কেউ ডাকাতি করতে আসবে না, এমন কি স্বয়ং ভুজঙ্গ ঠাকুরও নয়।"

দেওয়ান শিবশঙ্কর বললো, "সন্ধ্যায় কেন, কাল পরশু একদিন দিনের বেলা যাওয়া যেতে পারে।"

বাসুদেব বলে উঠলো, "না, দিনের বেলা নয়। গঙ্গা থেকে রাজমহলের শোভা যদি উপভোগ করতে হয় তো, শুক্লপক্ষে চাঁদনী রাতই সব চাইতে ভালো। রাজামশায়, বাবা, পিসীমা, উত্তরা, আমি, সবাই মিলে বেশ উপভোগ করা যাবে—"

উত্তরা বললো, "আমি তো যাবো না।"

সে যাবে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে আরতি দেখতে। তার প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার নিয়ম। একদিনের জন্যেও বাদ দিতে রাজী নয় সে। বাসুদেব বললো, আরতির পর উত্তরাকে মন্দিরের ঘাট থেকে বজরায় তুলে নেওয়া যেতে পারে। উত্তরা রাজী হোলো না। বাতিল হোলো বজরায় চেপে গঙ্গায় বেড়ানোর প্রস্তাব।

বাসুদেব মনে মনে হাসলো। সে যে এরকমটা প্রত্যাশা করেনি, তা নয়।

তার সন্দেহ হওয়ার কারণ ছিলো।

আগের দিন বাড়ির ভেতরে আসবার পথে ললিতার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। এমনিতে জিজ্ঞেস করলে, "কি খবর ললিতা? সন্ধ্যার পর খুব আরতি দেখা হচ্ছে লক্ষ্মী জনার্দনের মন্দিরে? না কি গঙ্গার ধারে হাওয়া খেয়ে বেড়ানো হচ্ছে?"

এমনিই জিজ্ঞেস করেছিলো সে, কিছু ভেবে বলেনি। হঠাৎ দেখলো, তার কথা শুনে ললিতার চোখের উপর এক নিমিষের জন্যে একটা ভয়ার্ত দৃষ্টি ফুটে উঠলো। কিন্তু সে চট করে সামলে নিলো নিজেকে। সে চতুর মেয়ে, এক গাল হেসে বললো, "বেশ তো, আপনিও চলুন না আজ, আমাদের সঙ্গে গঙ্গার হাওয়া খাবেন।"

"তোমার দিদি যে আজকাল একলা থাকতে ভালোবাসেন," আস্তে আস্তে বললো বাসুদেব।

ললিতা চলে যাচ্ছিলো।

তাকে পেছন থেকে ডাকলো বাসুদেব। বললো, "শোনো একটা কথা।"

"কি ?"

"একটা কথা আমায় বলবে ঠিক ঠিক ?"

হাতে একটি রুপোর সিক্কা টাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলো বাসুদেব। সেটি এগিয়ে দিলো ললিতার দিকে।

ললিতা হাত বাড়িয়ে নিলো।

"হ্যাঁ, বলুন।"

"তোমার দিদি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা মন্দিরে যায় কেন ? সত্যি সত্যি আরতি দেখতে ? না, কি—"

কথা শেষ করলো না বাসুদেব। তার কিরকম যেন একটা সন্দেহ হচ্ছিলো মনের মধ্যে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরের ঘাটের কাছেই উত্তরাকে বাঁচিয়েছিলো একজন। তার সঙ্গে উত্তরার পরিচয় হয়নি তো ?

ললিতা হাসিমুখে তাকিয়ে দেখলো বাসুদেবকে। তারপরে বললো, "ছোটো বাবু, আপনি কী মনে করেন আমাদের দিদিকে ?" টাকাটা সে ফিরিয়ে দিতে চাইলো বাসুদেবকে।

"না, না, ওটা ফিরিয়ে দিচ্ছো কেন ? ওটা রেখে দাও। এমনি বলছিলাম। দিনকাল ভালো না। দুষ্ট প্রকৃতির লোকের উপদ্রব বেড়ে যাচ্ছে চারদিকে। সবারই সাবধান থাকা উচিত।" একটু ভাবলো বাসুদেব। তার বুদ্ধি অত্যন্ত কূট। সে দিনই মনে হোলো, এই ললিতাকে আস্তে আস্তে বশীভূত করতে হবে। এবং শুধু অর্থ দিয়ে সেটা সম্ভব নাও হতে পারে।

সে তাকালো ললিতার দিকে। মুখের ভাব যথাসাধ্য কোমল করলো। তারপর বললো, "আরেকটি কথা জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম।"

"কি ?"

"আচ্ছা ললিতা, তোমার কি চিরকাল অন্যের সেবা করে অন্যের মহলেই কাটবে ? নিজের জন্যে কি একটুও ভাববে না ?"

ললিতা তাকিয়ে রইলো বাসুদেবের দিকে।

"ভগবান তোমায় অনেক কিছুই দিয়েছেন," খুব আস্তে আস্তে নিচু গলায় বললো বাসুদেব।

ললিতা চুপচাপ টাকাটা ফিরিয়ে দিলো বাসুদেবের হাতে। তারপর কোনো উত্তর না দিয়েই চলে গেল।

তখন থেকেই আস্তে আস্তে সন্দেহটা দানা বাঁধতে শুরু করেছে বাসুদেবের মনের মধ্যে। ললিতার সঙ্গে দেখা না হলে হয়তো একথাটা মাথায় আসতো না। সত্যিই তো,—যে প্রাণ বাঁচিয়েছে, তার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করা যে কোনো মেয়ের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কে সে লোকটি? সে এই কৃতজ্ঞতার সুযোগ নিচ্ছে না তো?

মনে মনে একটা পরিকল্পনা করলো বাসুদেব।

উত্তরা যখন বজরায় চেপে বেড়ানোর প্রস্তাবে রাজী হোলো না, এমনকি আরতির পর মন্দিরের ঘাট থেকে তাকে তুলে নেওয়ার প্রস্তাবেও নয়, তখন সন্দেহটা আরো বেড়ে গেল।

সে একটি থামের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবছিলো। দেখলো ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে উত্তরার পালকি। দরজাটা ফাঁক করা ছিলো। দেখলো, উত্তরা তাকে দেখতে পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

বাসুদেব হাসলো একটুখানি। অপেক্ষা করলো কিছুক্ষণ। তারপর বেরিয়ে এলো আস্তে আস্তে। দুটি ঘোড়া নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিলো বাসুদেবের একজন অনুচর। ঘোড়ায় চেপে দুজনে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরের দিকে।

ললিতাকে নিয়ে উত্তরা ঢুকলো মন্দিরের ভিতর। একটু পরে ভেতরে ঢুকলো বাসুদেব আর তার অনুচর সহায়রাম। ললিতা মিশে গেল মন্দিরের অন্যান্য কুল-ললনাদের ভিড়ে। উত্তরা মন্দিরের পেছন দিক দিয়ে ঘুরে এগিয়ে গেল গঙ্গার ঘাটের দিকে।

পেছন পেছন গেল বাসুদেব।

ঘাটের কাছে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলো একজন। উত্তরা এগিয়ে গেল তার কাছে। বাসুদেব আর সহায়রাম দুজনে দুদিকে দুটো ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করলো। বাসুদেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলো উত্তরার সঙ্গী সেই লোকটিকে। কিন্তু তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে চারদিকে। বোঝা গেল না তার চেহারা।

ওরা দুজনে কথা বললো অনেকক্ষণ ধরে। পরিষ্কার কিছু শোনা না গেলেও বেশ বোঝা গেল, খুব অন্তরঙ্গ সেই সংলাপ। তারপর সেই লোকটি উত্তরার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নদীর পাড় ধরে নেমে গেল। সেখানে মশাল হাতে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে অপেক্ষা করছিলো একজন লোক। সেই মশালের আলো পড়লো তার মুখের উপর,—এক পলকের জন্মে। আর সেই এক পলকেই চিনতে পারলো বাসুদেব, চিনতে পেরে চমকে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

দেবীকান্ত!—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেবীকান্ত। ওই মুখ দেবীকান্তর। যখন চলে গিয়েছিলো তখন অল্পবয়স্ক কিশোর। এখন সে পূর্ণবয়স্ক যুবাপুরুষ। দেহ আর আগের মতো রুগ্ন নেই, এখন খুব সুগঠিত পেশীসংবদ্ধ, সবল শরীর। কিন্তু মুখের চেহারা তো বদলায়নি আজ এত বছর পরেও ঠিক চিনতে পারলো বাসুদেব।

বাসুদেব দাঁড়িয়ে রইলো স্তম্ভিত হয়ে। দেবীকান্ত একটি নৌকায় উঠে বসলো। নদীর জলে মশাল নিভিয়ে তার পেছন পেছন নৌকায় উঠলো সেই লোকটি। নৌকা ছেড়ে দিলো। উত্তরা ফিরে গেল মন্দিরে।

ঝোপের আড়াল থেকে বাসুদেব বেরিয়ে এলো, তাকিয়ে রইলো অপস্রিয়মান নৌকোর দিকে। তারপর শিস দিয়ে ডাকলো সহায়রামকে। সেও বেরিয়ে এলো একটি গাছের ছায়ার আড়াল থেকে।

বাসুদেব বললো, "ওই লোকটির সম্বন্ধে খোঁজ নাও।"

"কে ওই লোকটি ?" জিজ্ঞেস করলো সহায়রাম।

বাসুদেব আস্তে আস্তে বললো, "ওর যে পরিচয় আমি জানি, সে পরিচয়ে হয়তো ওকে আজকাল কেউ আর চেনে না। এখন ওর কি পরিচয়, কোথায় ওর নিবাস, কি ওর বৃত্তি, ওসব খবর আমার চাই।"

সহায়রাম কিন্তু খবর যোগাড় করতে পারলো না। সে দেবীকান্তর অনুসরণ করেছিলো আরেকটি নৌকায় চেপে। দেখলো আগের নৌকাটি গিয়ে ভিড়লো একটি বজরার গায়ে। তার নৌকাও এগিয়ে যাচ্ছিলো। এমন সময় একটি ছিপ এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো। সহায়রাম বকাবকি করলো তাদের। ওরা জানতে চাইলো, সে কে। সহায়রাম জানালো যে সে ফৌজের লোক। ওরা জিজ্ঞেস করলো, সহায়রাম কেন তার নৌকো নিয়ে তাদের পথ রোধ করেছে। সহায়রাম পাল্টা অভিযোগ করলো যে, পথ তো আটকেছে ওরা। এই বিতর্কে কেটে গেল কিছুক্ষণ সময়। যখন ওরা পথ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, ততক্ষণে বজরা চলে গেছে অনেক দূর।

সবটা শুনলো বাসুদেব। তারপরে শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "বজরায় গিয়ে উঠলো সেই লোকটা ?"

"হ্যাঁ।"

চুপচাপ ভাবলো বাসুদেব। তারপর বললো, "আজ আবার যেতে হবে মন্দিরে। আজ নিশ্চয়ই আবার আসবে।"

বাসুদেব সেদিন হতাশ হোলো। উত্তরা গেল বটে লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দিরে, কিন্তু চুপচাপ আরতি দেখে ফিরে এলো। সেদিন, তারপরদিন, তার পরের দিনও।

দেবীকান্ত আর এলো না।

দু তিনদিন পরে সবার সঙ্গে গড় নাসিমপুরে ফিরে গেল উত্তরা।

রাজমহলে আরো কিছুদিন ছিলো বাসুদেব। অনেক চেষ্টা করেও সে দেবীকান্তর কোনো সন্ধান করতে পারলো না।

কিছুদিন পর সে পাটনা রওনা হোলো শুজার ফৌজের সঙ্গে। দুর্ভাবনা একটু ছিলো দেবীকান্তকে উপলক্ষ করে, তবে এটুকু নিশ্চিত ছিলো যে, দেবীকান্ত গড় নাসিমপুরে ফিরে যাবে না, আর চারদিকের এত গোলযোগের মধ্যে উত্তরাও গড় নাসিমপুর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে কোথাও দেখা করতে পারবে না তার সঙ্গে। তা ছাড়া তার বাবা দেওয়ান শিবশঙ্কর তো আছেই। দেবীকান্ত গড় নাসিমপুরে ফিরে এলে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে যাতে তার উদ্দেশ্য সফল না হয়। বাপ আর ছেলের স্বার্থ একসূত্রে বাঁধা।

তবে শিবশঙ্করকে এখন কিছু জানানো প্রয়োজন বাসুদেবের। শুজার ফৌজের অন্যান্য সবার মতো তারও দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, মাস ছয়েকের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। শুজা আগ্রা দখল করে বাদশাহ্ হতে পারুক বা না পারুক, দারার সঙ্গে একটা আপোস হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

মাস ছয়েক পরে গড় নাসিমপুরে ফিরে এসে উত্তরাকে বিয়ে করার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে হবে। তদ্দিনে তার নিজের মনসব ও বাড়িয়ে দেওয়া হবে নিশ্চয়। প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যাবে যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে। রাজা ইন্দ্রনারায়ণ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

যুদ্ধের মোড় ঘুরলো অন্যদিকে। শুজার ফৌজের কেউ এরকম প্রত্যাশা করতে পারেনি।

মাঘের প্রথম দিকে এক বিশাল ফৌজ, গোলন্দাজ বাহিনী ও নওয়ারা নিয়ে কাশীতে এসে উপস্থিত হোলো শাহ শুজা। কাশী থেকে পাঁচ মাইল দূরে বাহাদুরপুরে ফেললো ছাউনি। সেখানে এসে খবর পেলো দারার জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান শিকো, রাজা জয়সিংহ

ও দিলির খাঁ রুহেলার পারিচালনায় এক বিশাল মোগল বাহিনী এগিয়ে আসছে শুজার মোকাবিলা করতে।

খবর পেয়েও শুজা তার স্বভাবসিদ্ধ আলস্যের দরুন কোনো তৎপরতা দেখালো না। শুজার ছাউনিতে নাচ গান হৈ-হুল্লোড় চলতে লাগলো চিরাচরিত প্রথায়। মাঘের শেষে একদিন ভোর বেলা, যখন সারা রাত্রির আনন্দ-স্ফূর্তির পর সবাই গভীর নিদ্রায় অচেতন, হঠাৎ শোনা গেল অসংখ্য কামানের ভীমগর্জন। সুলেমান শিকো আচমকা আক্রমণ করেছে শুজার ছাউনি।

সব ফেলে পালালো শুজার সৈন্যেরা। বড় বড় মনসবদারেরা অনেকে নিজের তলোয়ার খুঁজে নেওয়ারও সময় পেলো না। শুজার শিবির ঘিরে ফেলেছিলো একদল শত্রুসৈন্য। কিন্তু সয়িদ আলম, মির্জা জান বেগ, সয়িদ কুলি উজবক প্রমুখ সৈনাধ্যক্ষেরা অনেককষ্টে শুজাকে সঙ্গে নিয়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এলো। শুজার পুত্র বুলন্দ আখতারের সঙ্গে সঙ্গে ছিলো বাসুদেব মজুমদার। কোনোরকমে নওয়ারার নৌকোগুলোতে এসে উঠলো ওরা সবাই। শুজার অস্ত্রশস্ত্র রসদ ধনরত্ন সব গেল সুলেমান শিকোর হাতে। নওয়ারা নিয়ে শুজা সাসেরাম হয়ে এসে পৌঁছোলো পাটনায়। কিন্তু সুলেমান শিকোর বাহিনী তখনো ছুটে আসছে শুজার পেছন পেছন। পাটনাতে থাকার সাহসও শুজার হোলো না, সেখান থেকে পালিয়ে এলো মুঙ্গেরে। শুজার গোলন্দাজ বাহিনী সুলেমান শিকোর পথ আটকে ব্যূহ রচনা করলো। মুঙ্গের থেকে পনেরো মাইল দূরে সুরজগড়ে এসে ছাউনি ফেললো সুলেমান শিকো। আর এগোতে পারলো না।

ফাল্গুন কেটে গেল। চৈত্র কেটে গেল। দক্ষিণ থেকে এগিয়ে আসছে আওরংজেবের বাহিনী। দারা এক বিপুল বাহিনী পাঠালো মহারাজা জসবন্ত সিংহ ও কাসিম খাঁর নেতৃত্বে। উজ্জয়িনী পেরিয়ে এসে চোদ্দো মাইল দক্ষিণে ধারমাতএর রণক্ষেত্রে দুই বাহিনীর

সাক্ষাত হোলো। এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হোলো মহারাজা জসবন্ত সিংহের বাহিনী। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলো কাসিম খাঁ ও মহারাজা জসবন্ত সিংহ দুজনেই। মহারাজা সোজা গিয়ে আশ্রয় নিলো যোধপুরে।

এই খবর এলো সুরজগড়ে সুলেমান শিকোর কাছে। তাড়াহুড়ো করে শুজার সঙ্গে একটা সন্ধি করে সে ফিরে গেল আগ্রায়।

দারা আরেকটি সেনাবাহিনী নিয়ে জৈষ্ঠের মাঝামাঝি আওরংজেবের সম্মুখীন হোলো সমুগড়ে। এ যুদ্ধেও দারার পরাজয় হোলো। তারপরের ঘটনা প্রবাহে ইতিহাসের পটপরিবর্তন হতে লাগলো অত্যন্ত দ্রুত।

দারা পালিয়ে এলো আগ্রায়, সেখান থেকে চলে গেল দিল্লী। আওরংজেব আগ্রা দখল করে বন্দী করলো শাহজাহানকে। তার পর আষাঢ় শুরু হওয়ার আগেই আবার আগ্রা ছেড়ে চললো দারার অনুসরণে। পথে মথুরায় বিশ্বাসঘাতকতা করলো মুরাদকে।

শ্রাবণ মাসে দিল্লীতে হিন্দুস্তানের তখ্‌ত্‌এ আরোহণ করে নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করলো আওরংজেব। তারপর একটা ভ্রাতৃপ্রেমে উদ্বেল পত্র প্রেরণ করলো শুজার কাছে। শুজা যদি সিংহাসনের দ্বন্দ্ব থেকে সরে দাঁড়ায় বাংলা-বিহার-উড়িশ্যার সুবাদার হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত আছে আওরংজেব।

শুজা এই কটা মাস চুপচাপ বসেছিলো। যখন দেখলো আওরংজেব পাঞ্জাবে গেছে দারার অনুসরণে, আর পথ খোলা পড়ে আছে আগ্রা পর্যন্ত, তখন স্থির করলো এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। আবার শুরু করলো যুদ্ধের প্রস্তুতি। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি একটা বিরাট বাহিনী নিয়ে শুজা রওনা হোলো পাটনা থেকে। পৌষের মাঝামাঝি এলাহাবাদ পেরিয়ে খজওয়ায় এসে শিবির স্থাপনা করলো।

এই বাহিনীতে যোগ দিয়ে সঙ্গে এলো বাসুদেব মজুমদার। এবং এই খজওয়ার যুদ্ধের সময় থেকে একটা নতুন পরিচ্ছেদ শুরু হোলো তার জীবনে।

খজওয়া থেকে আট মাইল দূরে কোরাতে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে শুজার পথ আটকে দাঁড়িয়েছিলো আওরংজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ সুলতান। দুদিন পর আরেকটি বাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হোলো আওরংজেব স্বয়ং। দাক্ষিণাত্য থেকে মিরজুমলাও এসে উপস্থিত হোলো সেখানে।

শুজা বসে রইলো চুপ করে।

নিজের বাহিনী দ্রুত পুনর্গঠিত করে আরো তিনদিন পরে শুজাকে আক্রমণ করলো আওরংজেবের ফৌজ। প্রবল যুদ্ধ চললো সারাদিন। আওরংজেবের ফৌজ শুজার ফৌজের দ্বিগুণ। আরম্ভ থেকেই শুজার হার হতে লাগলো। শুজার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখভাগ পরিচালনা করছিলো বুলন্দ আখতার। সেখানে ছিলো বাসুদেবও। আওরংজেবের বাহিনীর প্রবল আক্রমণে এরা সম্পূর্ণ ভাবে বিধ্বস্ত হোলো। মোগলদের হাতে বন্দী হোলো বাসুদেব।

বেলা শেষ হওয়ার আগেই শুজার ফৌজ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। শুজা সয়িদ আলম ও বুলন্দ আখতারের সঙ্গে সামান্য কিছু সৈন্য সহ রণক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করলো ঊর্ধ্বশ্বাসে। সুলতান মহম্মদ ও মিরজুমলার তাড়া খেয়ে শুজা কাশী ও পাটনা হয়ে একেবারে মুঙ্গেরে এসে থামলো।

ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছিলো বাসুদেব মজুমদার। সে যখন বন্দী হোলো, মিরজুমলার কাছে কি করে যেন খবর এলো যে, এই হিন্দু মনসবদার শুজার পুত্র বুলন্দ আখতারের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। মিরজুমলার হুকুমে তার কাছে নিয়ে আসা হোলো বাসুদেবকে।

"তোমাদের সবাইকে কোতল করার হুকুম হয়েছে," বললো মিরজুমলা, "বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণের এই একমাত্র শাস্তি।"

বাসুদেবের মুখ তখন শুকিয়ে গেছে। মিরজুমলার কথার মধ্যে একটুও অত্যুক্তি নেই। সেদিন সকালেই কোতল করা হয়েছে বারোজন মনসবদারকে। আরেক দলকে কোতল করা হবে তার পরদিন।

বাসুদেবের কাছে জীবনের মূল্য অনেক। যে কোনো মূল্যে সেটা কেনা যায়। মিরজুমলা দীর্ঘকাল ধরে রাজ্যশাসন পরিচালনায় হাত পাকিয়েছে। ক্ষুরধার তার বুদ্ধি। সে মানুষ চেনে। বললো, "হিন্দুস্তানের তখ্‌ত্‌এ শুজা বসলো কি আওরংজেব বসলো, তাতে কি তোমার কিছু আসে যায়?"

"বিন্দুমাত্র না," বাসুদেব উত্তর দিলো। একটুখানি আশার আলো দেখতে পেলো সে। বললো, "যিনি হিন্দুস্তানের বাদশাহ আমি তারই বান্দা।"

"তোমার কি ধারণা শুজা আমাদের পরাজিত করে তখ্‌ত্‌এ আরোহণ করতে সক্ষম হবে?"

"না মালিক, খজওয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর শুজার আর কোনো আশা নেই, একথা আমার মতো খুব সাধারণ লোকও বুঝতে পেরে গেছে। আপনারা অচিরেই বাংলা দখল করতে সক্ষম হবেন।"

মিরজুমলা খুশী হোলো একথা শুনে। বললো, "বাসুদেব মজুমদার, তুমি খুব সাধারণ লোক হলে তোমায় কোতল করতাম। কিন্তু তুমি বুদ্ধিমান, তোমার কর্মদক্ষতার সংবাদ আমি আলি হুসেনের কাছে পেয়েছি।"

বাসুদেব বিস্মিত হোলো আলি হুসেনের নাম শুনে। সেও শুজার ফৌজে ছিলো তার সঙ্গে।

"আলি হুসেন শুজার ফৌজ ছেড়ে আমাদের ফৌজে যোগ দিয়েছে," বলে গেল মিরজুমলা, "তোমার সাহায্যও আমার প্রয়োজন।"

"আমি আপনার বান্দা। যা হুকুম করবেন, তাই মানবো।"

"যুদ্ধ করবার জন্যে মনসবদার আমাদের অনেক আছে। তোমায় নিয়ে বৃদ্ধি কিন্তু তাতে তুমি তোমার কর্মকুশলতা দেখানোর সুযোগ খুব বেশী পাবেনা।"

"আমি কি করতে পারি, হুকুম করুন।"

একটু চুপ করে থেকে মিরজুমলা আস্তে আস্তে বললো, "তুমি ফিরে যাও শুজার ফৌজে।"

"ফিরে যাবো?" বিস্মিত হোলো বাসুদেব।

"হ্যাঁ। তোমার উপর বুলন্দ আখতারের খুব নেকনজর। এমন একজন লোক আমার প্রয়োজন। শুজার ফৌজে আমাদের লোক অনেক আছে। তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে তুমি। শত্রুবাহিনীর গতিবিধির সমস্ত খবর আমার পাওয়া দরকার। সে কাজে তোমাকে যেমন যেমন নির্দেশ দেওয়া হবে, সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে তোমাকে। তা ছাড়া আরো একটা কাজ আছে। শুজার ফৌজের মধ্যে এমন ভাবে তোমায় নানারকম গুজব ছড়াতে হবে যাতে অন্যান্য মনসবদার, বিশেষ করে হিন্দু মনসবদার যারা আছে. তাদের মনোবল ভেঙে যায়, যাতে তারা বিশ্বাস করে যে শুজার পরাজয় সুনিশ্চিত। আস্তে আস্তে বেশির ভাগ মনসবদার দের আমাদের পক্ষে আনতে হবে। বিস্তারিত ভাবে সব. কিছু জানাবেন যিনি তোমাদের পরিচালক। তুমি ফিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবে আমার এই পত্র নিয়ে।"

"কে তিনি?"

একটু হেসে মিরজুমলা বললো, "অলাওয়ার্দি খাঁ।"

অলাওয়ার্দি খাঁ! এ নাম শুনে বাসুদেব স্তম্ভিত হোলো।

তিনি শুজার প্রধান ওমরাহ, বিশিষ্ট উপদেষ্টা। এবার পরিষ্কার বুঝতে পারলো বাসুদেব, কি রকম ভাঙন ধরেছে শুজার ফৌজে।

মিরজুমলা ও মহম্মদ সুলতানের পরিচালনায় মোগল বাহিনী শুজার পশ্চাদ্ধাবন করে মুঙ্গেরের কাছাকাছি এলো। বাসুদেবও এলো এই ফৌজের সঙ্গে। শীত কেটে গেছে তখন। ফাল্গুন শেষ হয়ে আসছে। শুজা মুঙ্গের ছেড়ে পালিয়ে এলো সাহিবগঞ্জে। সেখান থেকে রাজমহলে ফিরে এলো চৈত্র মাসের প্রথম দিকে। মোগল ছাউনি ত্যাগ করে রাজমহলে শুজার ফৌজে ফিরে এলো বাসুদেব।

তাকে ফিরে পেয়ে সয়িদ আলম ও বুলন্দ আখতার খুব খুশী হোলো। কারো মনে কোনোরকম সন্দেহ হোলো না। শুজার ছত্রভঙ্গ সেনাবাহিনীর কেউ কেউ ফিরে আসছে এদিক ওদিক থেকে। লোকের বড় অভাব। যারা ফিরে আসছে, তাদের প্রত্যেককে স্বাগত করা হচ্ছে অত্যন্ত খাতির করে।

ফিরে এসেই অলাওয়ার্দি খাঁর সঙ্গে দেখা করলো বাসুদেব মজুমদার। শুজার ফৌজের ভিতর কাজ করছিলো মিরজুমলার বিভীষণ-বাহিনী। তাদের কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়লো সে।

কিন্তু বাসুদেব অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। কারো জন্যে তার কোনো বিশ্বস্ততা নেই। সয়িদ আলমের কাছে জানতে পারলো, মিরজুমলা স্বয়ং শুজাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে কৃতসংকল্প হলেও, আওরংজেবের পুত্র মহম্মদ সুলতান শুজার সঙ্গে একটা মিটমাট করে নেওয়ার পক্ষপাতী। আওরংজেব মহম্মদ সুলতানকে জানিয়েছে যে শুজা যদি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারের পদমর্যাদা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে সন্ধি করতে আওরংজেবের কোনো আপত্তি নেই। এই নিয়ে গোপন পত্রালাপ চলছে শুজা ও মহম্মদ সুলতানের মধ্যে। শুজার বিশ্বস্ত অনুচরেরা সবাই সন্ধি করে নেওয়ার পক্ষে

রায় দিয়েছে। হয়তো বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই একটা আপোস-মিমাংসা হয়ে যাবে।

এখবর শুনে বাসুদেব বিচলিত হোলো। যদি সন্ধি হয়ে যায়, তাহলে মিরজুমলার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তার কোনো লাভ নেই। অথচ নিশ্চিত ভাবে কিছুই বলা যাচ্ছে না। সে স্থির করলো, দুটো পথই খোলা রাখতে হবে। যুদ্ধে মিরজুমলা কি শুজা যারই জয় হোক, জীবন যুদ্ধে বাসুদেবের যেন হার না হয়।

বুলন্দ আখতারকে বলে শাহ শুজার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাত করলো বাসুদেব। সয়িদ আলমও উপস্থিত ছিলো সেখানে।

তার কাছ থেকে বিভীষণ-বাহিনীর কার্যকলাপের কিছু কিছু সংবাদ পেলো শুজা। সয়িদ আলম তখনই একটা চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করবার পরামর্শ দিয়েছিলো। কিন্তু শুজা বললো, "না, এ অবস্থায় উত্তেজিত হওয়া ঠিক হবে না। ওদের মধ্যে অনেকেই খুব প্রভাবশালী। সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ হতে পারে। বাসুদেব মজুমদার, তুমি ওদেরই লোক সেজে থাকো কিছুদিন। ওদের কর্মসূচী ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্যে ওদের মধ্যে আমাদের লোকও কিছু থাকা দরকার।"

তসলিম জানিয়ে বাসুদেব চলে আসছিলো। শুজা ডেকে বললো, "বাসুদেব। আমি তোমার বিশ্বস্ততায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তোমায় আমি একটা ভালো জায়গির দিতে চাই। তুমি বলো, কোন পরগণায় তুমি জায়গির পেতে চাও।"

"আমি চাই গড় নাসিমপুর," বাসুদেব বললো।

একটু চুপ করে রইলো শুজা। তারপর বললো, "যুদ্ধের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হোক। তোমার কথা আমার মনে থাকবে।"

তসলিম করে বাসুদেব চলে এলো।

শুজা রাজমহলেও থাকতে পারলো না বেশীদিন। আওরংজেবের

ফৌজ দ্রুত এগিয়ে আসছে সেদিকে। সাত আটদিন পর শুজা রাজমহল ত্যাগ করে চলে এলো মালদহ।

এখানে শুজার কানে এলো অলাওয়ার্দি খাঁর পরিকল্পিত একটা গোপন ষড়যন্ত্রের খবর। খুব নিখুঁত ভাবে, খুব গোপনে করা হয়েছিলো এই পরিকল্পনা। মিরজুমলা রাজমহল দখল করবার পর যখন মালদহের উপর আক্রমণ চালাবে, সেই সময় শুজার ফৌজে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে মিরজুমলার চরেরা। আর গভীর রাতে অলাওয়ার্দি খাঁর নেতৃত্বে একদল মনসবদার হঠাৎ আক্রমণ করে বন্দী করবে শাহ শুজা, ওর পরিবারবর্গ, সয়িদ আলম এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত সেনাধ্যক্ষদের। মালদহেই যবনিকা টানা হবে এই সংঘর্ষের উপর।

কি করে শুজা খবর পেলো কেউ জানলো না। কিন্তু অলাওয়ার্দি খাঁ এবং তার অন্তরঙ্গ দু তিনজনকে কোতল করা হোলো শাহ শুজার নির্দেশে। ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ব্যর্থ হোলো।

মিরজুমলাও স্তম্ভিত হোলো এ সংবাদ পেয়ে। কিন্তু কি করে ষড়যন্ত্রের খবর জানতে পারলো শুজা, এ রহস্যের সমাধান করতে পারলো না কেউ।

পয়লা বৈশাখ রাজমহল দখল করলো শুজার বাহিনী। তার কয়েকদিন আগেই বাসুদেব ফিরে এসেছে গড় নাসিমপুরে।

গড় নাসিমপুরের কাছে অম্বিকাপুর। সেখানকার থানাদার সগিরউদ্দিন খাঁ একদিন ডেকে পাঠালো বাসুদেবকে। সগির-উদ্দিনের কাছে গিয়ে বাসুদেব দেখে মালদহের ফৌজদার মহম্মদ কাসিম খাঁও বসে আছে সেখানে।

কাসিম খাঁকে দেখে বাসুদেব একটু শঙ্কিত হোলো। সে জানতো কাসিম খাঁ শুজার নিযুক্ত মনসবদার হলেও সে ছিলো অলাওয়ার্দি

খাঁর দলের লোক, মিরজুমলার বিভীষণ-বাহিনীর অন্যতম পরিচালক।

সে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো, "তুমি মালদহ ছেড়ে গড় নাসিমপুর চলে এসেছো কেন বাসুদেব?"

বাসুদেব উত্তর দিলো, "আমার পিতা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এই ছুতোয় মালদহ ছেড়ে চলে এলাম। আমাদের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যাওয়ার পর ওখানে থাকা নিরাপদ মনে করিনি। কয়েকদিন পরে আবার ফিরে যাবো।"

এ উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হোলো কাসিম খাঁ। বললো, "তোমায় একটা বিশেষ প্রয়োজনে ডাকিয়েছি। আমরা জানতে পেরেছি যে, শাহ শুজার তোপখানা সরিয়ে আনা হবে গড় নাসিমপুরে। সুতরাং এখানে আমাদের নিজের লোক একজন থাকা দরকার। তা-ছাড়া শাহ শুজার নওয়ারার এ অঞ্চলের গতিবিধির উপর খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখা যায় গড় নাসিমপুর থেকে। মিরজুমলা আমায় নির্দেশ দিয়েছেন একাজের ভার তোমার উপর দেওয়ার জন্যে।"

"আমি আমার যথাসাধ্য করবো।"

"আরেকটা জরুরী কাজ আছে। তুমি ভুজঙ্গ ঠাকুরের দলের নাম শুনেছো?"

"হ্যাঁ। ওদের কার্যকলাপের কিছু কিছু খবর আমি রাখি।"

"রাজাবাবুর নাম জানো নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ, ওর কথাও আমি শুনেছি।"

"শাহ শুজা আর সয়িদ আলমের সঙ্গে ওর একটা যোগাযোগ আছে।"

"তাই নাকি?" অজ্ঞতার ভান করলো বাসুদেব।

"হ্যাঁ, কথাটা বেশী কেউ জানে না। আমরা জানতে পেরেছি ভুজঙ্গ ঠাকুর ফিরে এসেছে দক্ষিণ থেকে। মিরজুমলার সেনা-বাহিনীকে নানাভাবে বিব্রত করার জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছে

এ অঞ্চলের ডাকাতেরা। তাদের সংগঠিত করা হচ্ছে এই রাজাবাবু নামে লোকটির পরিচালনায়। রাজাবাবু এখন এ অঞ্চলেই আছে। তোমাকে তার খবর নিতে হবে।"

"বাসুদেব একটু ভেবে বললো, "এ কাজ খুব সোজা নয়।"

"আমাদের সব রকম সহায়তা তুমি পাবে," বললো সগিরউদ্দিন খাঁ।

"দোগাছির ছাউনিতে আছে শাহজাদা মহম্মদ সুলতান, জুলফিকার খাঁ আর ইসলাম খাঁ। এদিকে আছেন মিরজুমলা নিজে। তুমি গঙ্গা পার হয়ে গিয়ে মিরজুমলার সঙ্গে দেখা করো। সয়িদ আলম আমাকে খবর দিয়েছেন তোমাকে জানাতে, তুমি যেন অবিলম্বে ছাউনিতে এসে বুলন্দ আখতারের সঙ্গে দেখা করো। মিরজুমলার নির্দেশ এই যে, বুলন্দ আখতারের সঙ্গে দেখা করার আগে তুমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে, তারপর গঙ্গা পার হয়ে চলে যাবে মালদহে।"

"আমি আজই রওনা হবো গড় নাসিমপুর থেকে।"

"কেউ যেন জানতে না পারে?"

"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন খাঁ সাহেব।"

মিরজুমলা বাসুদেবকে বললো, "এই রাজাবাবুকে আমার চাই,—জীবন্ত কি মৃত। এক হাজার আশরফি ইনাম। এ আমার বড্ড অসুবিধে করছে। হঠাৎ কোত্থেকে এসে এরা হাজির হয়,—রসদ লুঠ করে নিয়ে যায় বুঝিনা। আমাদের নওয়ারার ছিপগুলো দলে ভারী না থাকলে গঙ্গা দিয়ে যাওয়া আসা করতে চায় না।"

"আমি একমাসের মধ্যেই রাজাবাবুর সন্ধান এনে দেবো," উত্তর দিলো বাসুদেব।

মিরজুমলা খুশী হোলো বাসুদেবের কথা শুনে। তারপর বললো, "তুমি তো এখান থেকে শত্রুপক্ষের ছাউনিতে যাচ্ছো।

তুমি এই চেষ্টা করো যেন শাহ শুজা রাজাবাবুর সঙ্গে সংযোগ করার কাজে তোমাকেই নিযুক্ত করেন। তাতে আমাদের কাজ হাসিল করা সহজ হবে।”

মিরজুমলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে বাসুদেব রওনা হোলো শাহ শুজার ছাউনির দিকে। সেখানে এসে দেখা করলো সয়িদ আলম ও বুলন্দ আখতারের সঙ্গে।

“তোমাকে খুব জরুরী প্রয়োজনে ডাকিয়ে আনালাম,” বললো বুলন্দ আখতার।

“হুকুম করুন।”

“গড় নাসিমপুরকে একটা বিশেষ কাজে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে চাই। তুমি তো আলিজার কাছে গড় নাসিমপুর জায়গির হিসেবে চেয়েছো। আলিজাকে সন্তুষ্ট করার এই এক বিরাট সুযোগ।”

“আমি সর্বদাই আপনাদের খিদমতে হাজির আছি,” বললো বাসুদেব। সে ভাবলো, মহম্মদ কাসিম খাঁ ঠিকই বলেছে, শুজার তোপখানা এরা স্থানান্তরিত করতে চায় গড় নাসিমপুরে। কিন্তু পরক্ষণেই সে সয়িদ আলমের কাছে যা শুনলো তাতে সে মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। এই প্রস্তাব একেবারে অপ্রত্যাশিত। তার উদ্দেশ্য সাধনের এরকম সুযোগ সে পাবে ভাবতেই পারেনি।

সয়িদ আলম বললো, “গড় নাসিমপুরের পেছন দিকে যেই খাল আছে, সেটাকে আমরা রাজাবাবুর দলের ছিপগুলোর ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে চাই।”

“রাজাবাবু কি তাই চান ?”

“ওকে কিছু বলিনি। ও আসলে ওর ছিপগুলি আমাদের তত্ত্বাবধানে রাখতে চায় না। ওর ঘাঁটিও কাউকে জানতে দিতে চায় না। কিন্তু তার উপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ না রাখলে, ও পরে আমাদের পক্ষে আবার বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। আর যাই

হোক, সে হোলো ডাকাত। তাই ভাবছি এই প্রস্তাবটা ওকে দেবো। তবে তার আগে রাজা ইন্দ্রনারায়ণের সম্মতি দরকার। এ কাজে তোমার সহায়তা চাই।"

বাসুদেব একটু ভাবলো, "রাজা ইন্দ্রনারায়ণকে রাজী করানো আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হবে না। তবে, আমার একটা কথা যদি শোনেন—।"

"কি?" জিজ্ঞেস করলো বুলন্দ আখতার।

"আমার সঙ্গে রাজাবাবুর যোগাযোগ করিয়ে দিন। আমি হয়তো তাকে এ প্রস্তাবে রাজী করাতে পারবো। এমনি সে রাজী না হতে পারে, একজন ডাকাত আর যাই হোক একজন পরাক্রান্ত জমিদারের গড়ের কাছে নিজের ঘাঁটি করবে কেন? কিন্তু মনে করুন, সেই জমিদার যদি তার পৃষ্ঠপোষকতা করে, কিংবা ধরুন আমি নিজেই যদি তার দলভুক্ত হই—"

"হ্যাঁ, এ প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে," বললো বুলন্দ আখতার, "তবে ওকে আগে একবার জানাতে হবে। সে আমি কিংবা সয়িদ আলম ছাড়া আর কারো সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চায় না। নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় করার ব্যাপারে সে অত্যন্ত সতর্ক।"

"আমার কথা তো আপনারা বলবেন --।"

"হ্যাঁ, আমরা বললে হয়তো সম্মত হবে," বললো বুলন্দ আখতার।

সয়িদ আলম কি যেন ভাবছিলো, হঠাৎ বলে উঠলো, "তার আগে রাজাবাবুর মনে বিশ্বাস উৎপন্ন করতে হবে। আমি একটা কথা ভাবছি। এক কাজ করলে হয় না?"

"কি?" বুলন্দ আখতার জিজ্ঞেস করলো।

"আজ রাত্রে বাসুদেবকেও নিয়ে যাই আমাদের সঙ্গে।"

বুলন্দ আখতার তাকালো বাসুদেবের দিকে। তারপর বললো,

"হ্যাঁ, ও আমাদের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। ওকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়।"

"কোথায় ?" বাসুদেব জিজ্ঞেস করলো।

"এখন আর এসব আলোচনা নয়," সয়িদ আলম বাইরের দিকে তাকিয়ে বললো, "জান বেগ্ আসছে। ওকে কিছু জানতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তবে তুমি এটুকু জেনে রাখতে পারো যে, আজ রাত্রেই রাজাবাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় হওয়ার সুযোগ হতে পারে। তুমি প্রস্তুত হয়ে এখানে চলে এসো সন্ধ্যার পর। তারপর সব জানাবো।"

•

সেদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষদিকের একটি রাত। বর্ষা একটু আগেই শুরু হয়েছে এবার। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধ্যার কিছু পরেই বুলন্দ আখতার আর সয়িদ আলম, আট দশজন সিলাহ্দার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলো ছাউনি থেকে। সঙ্গে এলো বাসুদেবও। নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে এসে ওরা যখন থামলো তখন অনেক রাত হয়ে গেছে।

বাসুদেব ঠিক বুঝতে পারলো না ওরা কোথায় এসেছে, এবং কেন এসেছে। এতক্ষণ চুপচাপ অশ্বারোহণে এসেছে ওরা সবাই। বাসুদেব তাকিয়ে দেখলো,—সামনে গঙ্গা। ওপারে ঘন অন্ধকার। অঝোর বৃষ্টিতে কিছুই দেখা যায় না চারদিকে। আকাশে বিজলী চমকাচ্ছে থেকে থেকে।

"কোথায় এলাম আমরা ?" জিজ্ঞেস করলো বাসুদেব।

"গঙ্গা পার হয়ে ওদিকে খানিকটা গেলেই দোগাছি," আঙুল দেখিয়ে উত্তর দিলো সয়িদ আলম, "আওরংজেবের পুত্র মহম্মদ সুলতানের ছাউনি সেখানে।"

"এখানে আমরা এলাম কেন ?" বাসুদেব খুব সন্দিগ্ধ চিত্তে জিজ্ঞেস করলো।

শাহ গুজার পুত্র বুলন্দ আখতার হাসলো। বললো, "আমাদের একজন বিশিষ্ট মেহমান আসছেন। এবং তাঁকে নিয়ে আসছে আমাদের বন্ধু রাজাবাবু।"

"কে এই অতিথি?"

"একটু পরেই জানতে পারবে। সময় হয়ে এলো।"

অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো সবাই। হঠাৎ একদিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করে সয়িদ আলম বলে উঠলো, "একটা ছিপ দেখতে পাচ্ছি।"

সবাই তাকিয়ে দেখলো। নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি ছিপ। সেটি আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তীরের কাছে। কয়েকজন লোকের অস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল, কিন্তু কিছুই পরিষ্কার দেখা গেল না।

ছিপ আসতে আসতে নদীর পাড়ে এসে ভিড়লো।

"তুমি এখানেই থাকো," সয়িদ আলম বললো বাসুদেবকে, "নজর রাখো চারদিকে, যদি কারো সাড়া পাও, সঙ্কেত করবে। শত্রুপক্ষের লোক আমাদের যদি অনুসরণ করে থাকে, আমি আশ্চর্য হবো না।"

পার ধরে নিচে নেমে গেল বুলন্দ আখতার আর সয়িদ আলম। চারজন লোক নামলো ছিপ থেকে। এদের নামিয়ে দিয়ে ছিপ আবার অদৃশ্য হোলো নদীর অন্ধকারে।

এরা সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করলো নবাগতদের অগ্রবর্তী ব্যক্তিকে। বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলো বাসুদেব। ভাবলো, "কে এই ব্যক্তি?"

ওরা সবাই পাড় ধরে উপরে উঠে এলো। বুলন্দ আখতার আসছিলো সেই ব্যক্তির হাত ধরে। পেছন পেছন আসছিলো সয়িদ আলম ও অন্য তিনজন লোক। এদের সামনে এসে বুলন্দ আখতার বললো, "ইনি আমার প্রিয় ভ্রাতা, মির্জা মহম্মদ সুলতান, আমাদের সম্মানিত পিতৃব্য শাহজাদা আওরংজেবের পুত্র।"

সবাই অশ্ব থেকে অবতরণ করে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলো। বাসুদেব মনে মনে হাসলো,—আওরংজেব দিল্লীতে তখ্‌ত্‌এ আরোহণ করে বাদশাহ্‌ বলে ঘোষণা করেছেন নিজেকে, কিন্তু এরা এখনো তাঁকে শাহজাদা বলেই অভিহিত করে, কেউ বাদশাহ্‌ বলে না। কিন্তু বিস্মিত হয়ে ভাবলো,—এই গভীর নিশীথে শাহজাদা মহম্মদ সুলতান এখানে এ অবস্থায় কেন?

চারটি অতিরিক্ত অশ্ব আনা হয়েছিলো সঙ্গে। বুলন্দ আখতারের সঙ্গে মহম্মদ সুলতান এগিয়ে গেল সেদিকে। সয়িদ আলম বাসুদেবের কাছে এসে বললো, "তোমাকে এখানে একলা রেখে যাচ্ছি। তোমাকে নজর রাখতে হবে গঙ্গার ওদিকে থেকে কেউ অনুসরণ করে এদিকে আসছে কিনা। চারজন সিলাহ্‌দার রেখে যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। শেষ রাত্রে তুমি ছাউনিতে ফিরে এসো।"

অন্য কারণে উৎকণ্ঠ হয়ে ছিলো বাসুদেব। জিজ্ঞেস করলো, "রাজাবাবু আসেনি?"

"এসেছিলো। কিন্তু নামলো না। ওই ছিপেই ফিরে চলে গেল।"

"রাজাবাবু নিয়ে এসেছে মহম্মদ সুলতানকে?"

"হ্যাঁ, ওরই সাহায্যে ছাউনি থেকে পালিয়ে এসে ওরই সহায়তায় নদী পার হয়েছেন মহম্মদ সুলতান," হেসে বললো সয়িদ আলম, "তিনি যোগ দিচ্ছেন আমাদের পক্ষে। যুদ্ধের গতি এবার কোন দিকে মোড় ফেরে দেখ।"

ওরা চলে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো বাসুদেব। ওই পক্ষ থেকে পালিয়ে এসেছে মহম্মদ সুলতান? হ্যাঁ, এমন একটা কথা কানে এসেছিলো বটে যে, মিরজুমলা আর মহম্মদ সুলতানের মধ্যে বনিবনাও হচ্ছে না মোটেও। কিন্তু এসংবাদ কি পেয়েছে মিরজুমলা? খবরটা নিজে গিয়ে দিতে পারলে ভালো হোতো, কিন্তু সে অসম্ভব। নদী পেরিয়ে অনেকটা গেলে দোগাছি,

সেখান থেকে চার ক্রোশ দূরে মিরজুমলার শিবির। নদী পেরোবে কি করে? তা ছাড়া সঙ্গে আছে চারজন সিলাহ্‌দার, এরা বুলন্দ আখতারের অত্যন্ত বিশ্বস্ত। এদের চোখে ধুলো দিয়ে যাওয়া যাবে না।

কিন্তু রাজাবাবু নামলোনা ছিপ থেকে? নামলে একবার চাক্ষুষ পরিচয় হোতো। খুব হতাশ হোলো বাসুদেব।

শেষ রাতে সে ফিরে এলো ছাউনিতে।

যুদ্ধের গতি আরো দ্রুত হয়ে উঠলো। বর্ষাও নামলো প্রবল ভাবে। মিরজুমলা এসে ছাউনি ফেললো মাসুমাবাজারে। রাজমহলে রইলো জুলফিকার খাঁ। মহম্মদ সুলতান শাহ শুজার কন্যা গুলরুখবানুকে বিবাহ করলো। ভাদ্র মাসের শেষ দিকে আবার রাজমহল দখল করলো শাহ শুজা।

বাসুদেব ফিরে এলো গড় নাসিমপুরে।

অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি শুজার বাহিনীর আক্রমণ শুরু হোলো প্রবল ভাবে। মুরশিদাবাদে হটে এলো মিরজুমলা। শাহ শুজা এগিয়ে গেল নসীপুরের দিকে। ইতিমধ্যে বিহারের সুবাদার দাউদ খাঁ আরেক দল সৈন্য নিয়ে শুজাকে আক্রমণ করবার জন্যে এগিয়ে এলো। শুজা নসীপুর ছেড়ে চলে গেল টণ্ডার দিকে। তার পশ্চাদ্ধাবন করলো মিরজুমলা। শুজা গঙ্গা পার হয়ে চলে গেল। মিরজুমলা এসে আবার দখল করলো রাজমহল। পৌষ মাস শেষ হয়ে এসে গেল মাঘ।

শুজা এসে ছাউনি ফেললো চৌকি মিরদাদপুরে। মাঘের মাঝামাঝি মহম্মদ সুলতান শুজার পক্ষ ত্যাগ করে দোগাছিতে ফিরে গেল মিরজুমলার কাছে। মিরজুমলা তাকে বন্দী করলো। মাসখানেকের মধ্যেই মালদহ দখল করলো মিরজুমলা। এক মাস ধরে পরিশ্রম করে পুনর্গঠিত করলো সেনাবাহিনীকে। তারপর

শুরু হোলো শাহ্ শুজার উপর প্রবল আক্রমণ। সেই আক্রমণে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হোলো শাহ্ শুজার ফৌজ।

শাহ্ শুজা পালিয়ে এলো টণ্ডায়। সেখান থেকে নৌকায় চেপে বেগম ও পরিজনবর্গকে নিয়ে চলে গেল ঢাকা। সঙ্গে গেল সয়িদ আলম, মির্জা জান বেগ, সয়িদ কুলি উজবক, আর শ-তিনেক অনুচর ও ভৃত্য।

শুজার বাহিনী যোগ দিলো মিরজুমলার পক্ষে।

এই কয়েকমাস বাসুদেবও ব্যস্ত ছিলো খুব। শুজার তোপ-খানার অনেক কামান ও গোলাবারুদ নিয়ে আসা হয়েছে গড় নাসিমপুরে। রাজা ইন্দ্রনারায়ণ প্রথমে রাজী ছিলোনা এই ঝুঁকি নিতে। মিরজুমলার বাহিনী জিতে যাচ্ছে চারদিকে। এতে হয়তো তার বিরাগভাজন হতে পারে রাজা ইন্দ্রনারায়ণ। কিন্তু দেওয়ান শিবশঙ্কর আর বাসুদেব বোঝালো যে শেষ পর্যন্ত শাহ্ শুজা আর মিরজুমলার মধ্যে একটা সন্ধি হয়ে যাবে, বাংলার সুবাদারের পদে বহাল থাকবে শাহ শুজা। সুতরাং এর মধ্যে ঝুঁকি কিছু নেই। বরং ভবিষ্যতে শাহ্ শুজার কাছ থেকে নানারকম অনুগ্রহ পাওয়া যেতে পারে।

শাহ্ শুজার তোপখানা যে গড় নাসিমপুরে এসে গেছে দোগাছিতে মিরজুমলার কাছে গিয়ে খবর দিয়ে এলো বাসুদেব নিজে। মিরজুমলা খুশী হোলো একথা শুনে। শুজা আর এই তোপখানা ফিরে পাবে না। সে মালদহের ফৌজদার কাসিম খাঁ, অম্বিকাপুরের থানাদার সগিরউদ্দিন খাঁ আর বাসুদেব মজুমদারের উপর ভার দিলো গড় নাসিমপুরের উপর কড়া নজর রাখতে, শুজার পক্ষের কেউ যেন সেই তোপখানার সরঞ্জাম আর স্থানান্তরিত করতে না পারে।

মিরজুমলার সেনাধ্যক্ষেরা নানারকম উপকার পেলো বাসুদেবের

কাছ থেকে। শাহ শুজার ফৌজের গতিবিধির অনেক খবর বাসুদেব ওদের জানিয়েছে এই কয়েকমাসে। ওরা বাসুদেবের উপর খুবই প্রসন্ন। ভবিষ্যতের অনেক রঙিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো বাসুদেব।

শুধু একটা ব্যাপারে হতাশ হতে হলো তাকে। অনেক চেষ্টা করেও সে রাজাবাবুর কোনো সন্ধান করতে পারলো না। বুলন্দ আখতার ও সয়িদ আলমের মারফতে রাজাবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করার পরিকল্পনা যেটা ছিলো, যুদ্ধের হিড়িকে সেটা সফল হোলো না। নিজে ঘোরা ফেরা করে, খোঁজখবর করে, চর লাগিয়েও রাজাবাবুর কোনো খোঁজ পেলো না বাসুদেব। সাধারণ লোকে কিছু বলতেই চায় না তার সম্বন্ধে।

এত ব্যস্ততার মধ্যে উত্তরার উপর নজর রাখবার ফুরসত তার হয়নি। সে জানতো সব সময় মহলের মধ্যেই থাকে উত্তরা। সুতরাং সে একথা ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলো যে, রাজমহল ছেড়ে আসবার পর উত্তরার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেবীকান্তর আর দেখা হয়নি।

একবার শুক্লা চতুর্দশীর দিন গড় নাসিমপুরে ছিলো বাসুদেব। হঠাৎ চোখে পড়লো সকালবেলা পাইক পিয়াদা নিয়ে গড় থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে একটি পালকি।

নিজের অনুচর সহায়রামকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, "কে যাচ্ছে পালকি চড়ে?"

"রাজামহাশয়ের মেয়ে।"

"উত্তরা? কোথায় যাচ্ছে এই সকাল বেলা?"

"অম্বিকাপুরের অষ্টভুজার মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছেন।"

"ও।"

সেবার আর মাথা ঘামালো না। কিন্তু পরের শুক্লা চতুর্দশীর দিন দ্বিপ্রহরের পর আবার যখন দেখলো পালকি ফিরে আসছে

তখন তার সন্দেহ হোলো। খোঁজ নিয়ে জানলো প্রত্যেক শুক্লা চতুর্দশীতে উত্তরা নিয়মিত পূজো দিতে যায় অষ্টভুজার মন্দিরে।

বাসুদেব স্থির করলো যে, জানতে হবে উত্তরা কি শুধু পূজো দিতেই যায়, না কি এই সুযোগে দেখা করে দেবীকান্তর সঙ্গে। এই সম্ভাবনার কথা সে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলো না। সে কি তাহলে এই অঞ্চলেই কোথাও আছে? বাসুদেবের একটু ভাবনা হোলো।

একবার ভাবলো যে অষ্টভুজার মন্দিরে গিয়ে লুকিয়ে দেখে আসতে হবে। কিন্তু তারপর মনে পড়লো আরেকটি শুক্লা চতুর্দশী আসতে এখনো একমাস দেরী আছে। রাগে আঙ্গুল কামড়াতে লাগলো সে। সকালবেলা পালকি বেরোনোর সময় যদি চোখে পড়তো তাহলে গিয়ে দেখে আসা যেতো। সুযোগটা হাতছাড়া হোলো।

আচ্ছা, একমাসের মধ্যে তো আর দেখা হচ্ছে না ওদের মধ্যে, সে ভাবলো,—আরেকটি শুক্লা চতুর্দশী আসুক, তখন দেখা যাবে। কিন্তু ভাবতে ভাবতে ক্রমশ সে অধৈর্য হয়ে উঠলো। না, দেরি করলে চলবে না, ব্যাপারটা জানতে হবে যতো শীঘ্র সম্ভব, যাতে আগামী শুক্লা চতুর্দশীর মধ্যেই এই সমস্যার একটা নিষ্পত্তি করা যায়।

কিন্তু জানা যায় কি করে? তখন মনে পড়লো উত্তরার পরিচারিকা ললিতার কথা।

•

ললিতার কাছ থেকেই সে ক্রমশ সব জানতে পেরেছিলো। খুব সহজ হয়নি একাজ। ললিতা এমনিতে খুব শক্ত মেয়ে, টাকা-কড়ির লোভ দেখিয়ে তাকে বশ করা দুঃসাধ্য। আগেরবার রাজ-মহলে এ চেষ্টা করে বাসুদেব পারেনি। তাই এবার তাকে অন্য ফিকির খাটাতে হয়েছিলো।

বাসুদেবের ধারণা ছিলো যে কোনো সাধারণ নারী তার বিশ্বস্ততা, নীতিবোধ, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার সব কিছু ভুলতে পারে শুধু একটি মোহে,—সেটি ভালোবাসার মোহ। ললিতার সঙ্গে এই অভিনয়ই করতে হয়েছিলো বাসুদেবকে। তার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিপত্তির আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণ না করে পারেনি ললিতা।

তারই কাছ থেকে একটু একটু করে অনেক কথা বার করে নিলো বাসুদেব। রাজমহলের লক্ষ্মী জনাদনের মন্দিরে যার সঙ্গে দেখা করতে যেতো উত্তরা, সেই প্রত্যেক শুক্লা চতুর্দশীতে এখানে অম্বিকাপুরের অষ্টভুজার মন্দিরে এসে দেখা করে উত্তরার সঙ্গে। গঙ্গার ধারে বসে দুজনে গল্প করে অনেকক্ষণ।

"সে বজরায় চড়ে আসে ?"

"না। মাঝে মাঝে ছিপে চড়ে আসে, মাঝে মাঝে নৌকায়।"

"ছিপে চড়ে আসে ?" বাসুদেব বিস্মিত হোলো ললিতার কথা শুনে। জিজ্ঞেস করলো, "উনি কি করেন জানো ?"

"জানি না," ললিতা বললো, নিশ্চয়ই জমিদার। দু-একবার শুনেছি, বাবুমশায়ের মাল্লারা ওঁকে রাজাবাবু বলে ডাকে।"

"রাজাবাবু!" বাসুদেব ভ্রূকুঞ্চিত করলো।

"হ্যাঁ। একবার অষ্টভুজা দেবীর মন্দিরের মুরলীধর দিদিকে এসে বললো, রাজাবাবুর আসতে একটু দেরি হবে। আপনি মন্দিরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমি এসে খবর দিলে তবে যাবেন। পরে দিদির কাছে শুনেছিলাম, উনি নাকি দোগাছির ওদিকে কোথায় গিয়েছিলেন আগের দিন, তাই সকালে এসে পৌঁছাতে একটু দেরি হয়ে গেল। বাপরে বাপ, দিদির সেদিন কী রাগ!"

"রাজাবাবু!" নিজের মনে বললো বাসুদেব।

ললিতা হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল বাসুদেবের মুখ দেখে। জিজ্ঞেস করলো, "কেন, কি হোলো ?"

"না, কিছু না," বলে ললিতাকে বার করে দিলো ঘর থেকে। বললো, "আজ তুমি এসো ললিতা। আবার কাল দেখা হবে।"

"এরই মধ্যে?" ললিতা অধরস্ফীত করে বললো।

"আজ আমার একটু জরুরী কাজ আছে।"

ললিতা চলে যাওয়ার পর বাসুদেব নিজের মনে অনেকক্ষণ ভাবলো। রাজাবাবু! তবে সেই রাজাবাবু নাও হতে পারে দেবীকান্ত, হয়তো তাকে তার ভৃত্যরা এ নাম ধরেই ডাকে। কিন্তু এ নামে ডাকবে কেন? রাজা খেতাব না থাকলে তো এ নাম ধরে অনুগতেরা ডাকে না? ওর কি আছে এই খেতাব? না, সে হতে পারে না। হলে বাসুদেব জানতে পারতো। রাজমহলে দেওয়ানিতে আর ফৌজে এদ্দিন কাটিয়ে এলো সে, আশপাশের ছোটো বড়ো জমিদার অনেককেই সে চিনতো ব্যক্তিগত ভাবে, নাম জানতো সবারই। দেবীকান্ত রায় বলে কারো কথা তো শোনেনি কোনোদিন। অথচ তার নিজের বজরা আছে, নৌকো আছে, ছিপ আছে। কি করে সম্ভব? অনেকক্ষণ ভেবে ভেবে সে স্থির করলো যে, রাজাবাবু বলে যার সন্ধান সে এতদিন ধরে করছে, হয়তো দেবীকান্তই সেই লোক। রাজাবাবুর সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর সে যোগাড় করেছিলো। সে জানতো যে কিশোর বয়েস থেকে রাজাবাবুকে প্রতিপালন করে বড়ো করেছে ভুজঙ্গ ঠাকুর। বয়েস এবং সময়ের হিসেব করে দেখলো, দেবীকান্ত যে সময় নিখোঁজ হয়েছিল গড় নাসিমপুর থেকে, প্রায় ওরকম সময় থেকেই এক অজ্ঞাত কুলশীল কিশোরকে প্রতিপালন করতে শুরু করেছিলো ভুজঙ্গ ঠাকুর।

ভাবতে ভাবতে আজ এত বছর পরে হঠাৎ মনে পড়লো যে, যেদিন সন্ধ্যায় দেবীকান্ত নিখোঁজ হয়ে যায়, তার পরদিন সকালেই গড় নাসিমপুরের কাছে গঙ্গার উপর একটা বড়ো রকমের ডাকাতি করে ভুজঙ্গ ঠাকুরের দল। তার কিছু পরে নদীর বুকে একটি বজরা

দেখতে পেয়েছিলো কোতোয়ালির পিয়াদারা! কিন্তু বজরার মধ্যে শুধু এক প্রৌঢ় জমিদারও এক কিশোর বালককে দেখে ওরা বজরা আটক করেনি। পরে জানতে পেরেছিলো যে ওটা ভুজঙ্গ ঠাকুরের বজরা। আরো শোনা গিয়েছিলো যে আগের দিন রাত্রে গড় নাসিমপুরের কাছে যে ঘন জঙ্গল আছে, সেই জঙ্গলের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে আস্তানা পেতেছিলো ভুজঙ্গ ঠাকুরের লোকেরা।

নিশ্চয়ই দেবীকান্ত গড় থেকে পালিয়ে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলে ছিল সেই জঙ্গলের মধ্যে,—ভাবলো বাসুদেব। তারপরদিন সকালে ভুজঙ্গ ঠাকুরের বজরায় যেই কিশোরটিকে দেখা যায়, সে নিশ্চয়ই দেবীকান্ত।

তবু একেবারে নিশ্চিত হওয়ার মতো কোনো প্রমাণ নেই। বাসুদেব স্থির করলো, প্রমাণ যখন পাচ্ছিনা তখন এই অনুমানের ভিত্তিতেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যদি সে রাজাবাবু হয়, তাহলে এক চালে রাজাবাবু আর দেবীকান্ত দুটো পরিচয়ই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যাবে এই দুনিয়া থেকে। আর রাজাবাবু যদি না হয়, তাহলেও ক্ষতি নেই, এই চালে উৎপাটিত হবে দেবীকান্ত নামে এক পথের কাঁটা।

একদিন উত্তরা যখন বসেছিলো সুরেশ্বরীর কাছে, বাসুদেব হঠাৎ দেবীকান্তর প্রসঙ্গ তুললো। একরকম ঢিলই ছুঁড়লো অন্ধকারে। বলে ফেললো,—ভুজঙ্গ ঠাকুরের পালিত পুত্র রাজাবাবুর নাম শুনেছো? ওই রাজাবাবু হোলো আমাদের দেবীকান্ত।

বলতে বলতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে নিরীক্ষণ করছিলো উত্তরাকে। দেখলো ওর কথা শুনে উত্তরার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো। আরো নিশ্চিত হোলো বাসুদেব। দেবীকান্ত কি নিজের পরিচয় উত্তরার কাছে গোপন রেখেছে? রাজাবাবু নামটি তো উত্তরা জানে।

সে পরদিনই গিয়ে'দেখা করলো থানাদার সগিরউদ্দিন খাঁর

সঙ্গে। বললো, "আমি রাজাবাবুর সন্ধান পেয়েছি। আমার এক দল পিয়াদা ও বরকন্দাজ চাই।"

সগিরউদ্দিন খাঁ খুব খুশী হয়ে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। সময় মতো অম্বিকাপুরে গঙ্গার ধারে গিয়ে পৌঁছেওছিলো বাসুদেব আর তার লোকজন।

কিন্তু দেবীকান্ত ওরফে রাজাবাবুর চরের ব্যবস্থা খুব নিখুঁত। কি করে যেন খবর পেয়ে গেল দেবীকান্ত। অতো চেষ্টা করেও তাকে ধরা গেল না। সে সরে পড়লো সবার চোখে ধুলো দিয়ে।

চারদিকে যেরকম হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিলো সেদিন, বাসুদেব একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেল যে রাজাবাবু দেবীকান্তই। খুব বড়ো একটা সংগঠন না থাকলে ওভাবে পালাতে পারতো না সে। আর এরকম একটা সংগঠন সাধারণ জমিদারের নয়, সেটা একমাত্র ভুজঙ্গ ঠাকুরের দলের।

সেদিন খুব আশাহত হয়ে পড়েছিলো বাসুদেব,—এত চেষ্টা সত্ত্বেও রাজাবাবু হাত ফস্কে পালালো। মনে এটুকু মাত্র সন্তোষ ছিলো যে দেবীকান্তর সঙ্গে উত্তরার সাক্ষাত হওয়া চিরদিনের মতো সে বন্ধ করতে পেরেছে।

কিন্তু রাজাবাবুকে তো ধরতে হবে। আর কি পাওয়া যাবে এই সুযোগ?

সেই সুযোগ অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে গেল এক মাস কেটে যাওয়ার আগেই। আজ এসেছে রাজাবাবুকে ধরবার সুযোগ।

উপায় বলে দিয়েছে উত্তরার পরিচারিকা ললিতা।

কিন্তু ইতিমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে আরেকটি জটিলতার। এর জন্যে প্রস্তুত ছিলো না বাসুদেব।

জানলার ওপারে জমাট কালো অন্ধকার। বাসুদেব তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখলো খালের ওপারে জঙ্গলের দিকে। নিশ্চয়ই ভুজঙ্গ ঠাকুর ও দেবীকান্ত এসে গেছে ওখানে।

কিন্তু সঙ্কেত জানানোর সময় কি এখনো হয়নি? করছে কি ললিতা?

হ্যাঁ, আর সিতারা কি করছে এখন?—ওর কথা ভাবতে মন আবার কোমল হয়ে এলো।

সিতারা—মহম্মদ কাসিম খাঁর কন্যা সিতারা বানু। সে এসেই তো সব এলোমেলো করে দিলো ঝড়ের মতো। তা নইলে সব কিছু বেশ তো হয়ে আসছিলো বাসুদেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী। যে ভাবে জাল ফেলেছিলো বাসুদেব, কারো তো নিস্তার নেই তার থেকে। রাজা ইন্দ্রনারায়ণ বন্দী। উত্তরা এসে গিয়েছিলো বাসুদেবের হাতের মুঠোর মধ্যে। নাসিমপুর সুবর্ণগ্রামের জমিদারি তো আগে পরে পাওয়াই যাবে জায়গির হিসেবে। গড় নাসিমপুরের কিলাদার তো তাকে নিযুক্ত করাই হয়েছে। রাজাবাবুও তার জালে এসে পড়লো বলে—

খুব পরিতুষ্ট ছিলো বাসুদেব মজুমদার,—কিন্তু কোত্থেকে এলো এই সিতারা নামে মেয়েটি, এসে সব কিছু এলোমেলো করে দিলো দমকা ঝড়ের মতো।

মালদহের ফৌজদার মহম্মদ কাসিম খাঁর উপর হুকুম হয়েছিলো গড় নাসিমপুরে এসে থাকার জন্যে। এ সময় মিরজুমলার নওয়ারা ঢাকা রওনা হওয়ার তোড়জোর করছে, মোগল রসদ আর সামরিক উপকরণ সরবরাহ হচ্ছে নদীপথে। গড় নাসিমপুরে আছে তোপ

খানা। তার তত্বাবধানে এখন নিজেদের বিশ্বাসী লোক থাকাই বাঞ্ছনীয়।

কাসিম খাঁর সঙ্গে এলো তার পরিবার। মহলের ভিতর দিকে একটা অংশ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো তাদের জন্যে।

সেই কাসিম খাঁর তরুণী কন্যা একদিন হঠাৎ বে-আবরু অবস্থায় পড়ে গেল বাসুদেবের সামনে।

মহলের ভিতরে সব গোলক ধাঁধাঁর মতো পথ। অনেকদিন যারা মহলে আছে ওরাই চিনে উঠতে পারেনা সব সময়। সেই গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে হারিয়ে গিয়ে মেয়েটি পথ ভুল করে হঠাৎ এসে পড়লো এদিকের মহলের পেছন দিকের সিঁড়ির মুখে।

সেদিক দিয়ে নেমে আসছিলো বাসুদেব।

"কে? কে তুমি?"

মেয়েটি তাড়াতাড়ি মুখে নকাব টেনে দিলো। কিন্তু বাসুদেব ওই এক পলকে দেখে ফেলেছে তার রূপ, আনারদানার মতো তার গায়ের রং, সুর্মা আঁকা দীর্ঘায়ত আঁখি, রক্ত গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট।

এমন রূপ মানুষের হয়! স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো বাসুদেব।

সে চলে যাচ্ছিলো তাড়াতাড়ি। কিন্তু বাসুদেব পথ আটকে দাঁড়ালো।

"আমি চিনি না এমন কেউতো গড় নাসিমপুরে থাকে না," বাসুদেব বললো, "অপরিচিত কাউকে দেখলে আমাকে তার পরিচয় জানতে হয়। এটা এখানকার রেওয়াজ।"

মেয়েটি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে খুব সংবৃতভাবে উত্তর দিলো, "আমি সিতারাবানু,—মহম্মদ কাসিম খাঁর কন্যা। আপনি কে?"

"আমি? আমি এখানকার কিলাদার, বাসুদেব মজুমদার।"

ছোট্টো একটুখানি সালাম জানিয়ে মেয়েটি চলে গেল অন্যদিকে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে বাসুদেব আস্তে আস্তে নিজের কক্ষে ফিরে এলো।

সেদিন রাত্তিরে ঘুম আসেনি বাসুদেবের চোখে।

কিন্তু কেন এমন হোলো?—ভাববার চেষ্টা করেছিলো বাসুদেব—সে উত্তরাকে বিবাহ করবার স্বপ্ন দেখে এসেছে এতদিন, তার যা কিছু পরিকল্পনা, যা কিছু জাল বিস্তার, সব ওই উত্তরার জন্যে, আর আজ এক অপরিচিতা নারীকে এক মুহূর্তের জন্যে দেখে এরই মধ্যে বিস্বাদ বিবর্ণ মনে হচ্ছে তার এতদিনকার স্বপ্নগুলো!

অনেক ভাবলো সে, আস্তে আস্তে উপলব্ধি করলো,—না, উত্তরাকে তো সে উত্তরা হিসেবে চায়নি, প্রিয়া হিসেবে চায়নি, বধূ হিসেবে চায়নি, ঘরনী হিসেবে চায়নি। তাকে সে চেয়েছে তার আত্মম্ভরিতার পরিতুষ্টি হিসেবে, তার সাফল্যের প্রতীক হিসেবে। তার পিতা শিবশঙ্কর রাজা ইন্দ্রনারায়ণের বেতনভোগী ভৃত্য, অতএব ইন্দ্রনারায়ণের কন্যাকে তার পত্নী হিসেবে চাই। উত্তরা দেবীকান্তর প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু দেবীকান্তর পিতা একদিন বরখাস্ত করেছিলো তার পিতা শিবশঙ্করকে, অতএব দেবীকান্তর প্রণয়িনী উত্তরাকে তার শয্যাসঙ্গিনীরূপে চাই।—শুধু এইমাত্র, শুধু একটা বিকৃত জিঘাংসাবৃত্তি, আর কিছু নয়।

কিন্তু এতদিন সে শুধু নিজের পদোন্নতি, নিজের সাফল্য, নিজের প্রতিষ্ঠার কথাই ভেবেছে, কোনো নারীকে নারী হিসেবে চাইবার কথা ভাবেও নি।

কিন্তু এভাবে নিজের মনকে বঞ্চিত রাখবো চিরকাল,—বাসুদেব ভেবেছিলো সেদিন। নিজের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতার জন্যে, নিজের হৃদয়ের দাবীতে কি কোনোদিন চাইবো না কোনো নারীকে?

কে সেই নারী? উত্তরা? না, না, উত্তরা নয়। এই প্রথম সে পরিষ্কার বুঝতে পারলো নিজের মনকে। উত্তরা বাসুদেবকে ঘৃণা করে, তুচ্ছ করে, অবজ্ঞা করে। তার জন্যে উত্তরার মনে কোনো

ভালোবাসা, কোনো স্নেহ, কোনো মমতা নেই। উত্তরার জন্যেও তার মনে আছে ওই একই রকম ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা। কি মনে করে উত্তরা নিজেকে? তার পিতা রাজা ইন্দ্রনারায়ণের গর্বোদ্ধত শির ধুলায় লুটিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা বাসুদেব রাখে, এবং সেই ক্ষমতা দেখিয়েও দিয়েছে সে। এখন আর কি দরকার? উত্তরার যা হবে হোক।

তা হলে কে হবে সেই নারী যে তার মনের সমস্ত ঐশ্বর্য মাধুরী আর সুষমা নিয়ে বর্ণময় করে তুলবে তার জীবন। অনেকক্ষণ ধরে ভাবলো বাসুদেব। বার বার শুধু মনে পড়লো ওই অনল-শিখা-রূপিনী সিতারাবানুর কথা। তার পাশে নিষ্প্রভ হয়ে গেল শ্যামাঙ্গী উত্তরা।

জীবনে যদি নারীকে নারী হিসেবে স্থান দিতে হয়, তাহলে সিতারার মতো নারীই বাঞ্ছনীয়,—একথাই বাসুদেবের মনে হোলো বার বার।

কিন্তু সে যে যবন কন্যা।

তার ধর্ম আর বাসুদেবের ধর্মতো এক নয়। কি করে এই স্বপ্ন সম্ভব হতে পারে?

ধর্ম।—বাসুদেব হেসে ফেললো। কী তার ধর্ম? তার মা হিন্দু, বাবা হিন্দু,—কিন্তু সে কি হিন্দু? জীবনে কোনদিন মেনেছে হিন্দুর আচার বিচার? তার জীবনের একমাত্র ধর্ম—অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা।

বাসুদেব ভাবলো, অনেক ভাবলো। মোগল রাজত্বে কতদূর যেতে পারে একজন পূর্বদেশীয় হিন্দু?—বড় জোর একটা পাঁচ হাজারী মনসব, গড় নাসিমপুরের কিলাদারী, একটু জায়গির, রাজা খেতাব, আর উত্তরার মতো এক শ্যামাঙ্গী দাম্ভিকা পত্নী, যে স্থূলকায়া হয়ে যাবে যৌবন শেষ হবার আগেই।

আর একজন মুসলমান? সে কতদূর যেতে পারে মোগল রাজত্বে?—মোগল বাদশাহ্‌র উজীর কি মির বকশি কি সুবাদারের আসন সব সময় আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তাকে। বাদশাহ্‌ ছাড়া আর সব কিছু হতে পারে সে। আর সেই সঙ্গে সিতারাবানুর মতো বিবি।—শুধু একজন কেন? চার চারজন বিবি হলেও কেউ কিছু বলবে না।

নিজের চেনা এবং শোনা অনেক জনের কথা মনে পড়লো। মুরশিদ কুলি খাঁ তো হিন্দু ছিলো। আজ সে কোথায় উঠে এসেছে। ফিরোজ খাঁ, সমশের খাঁ, তাজ খাঁ, গফুর খাঁ,—সবাই তো হিন্দু, সবাই তো এক পুরুষের মুসলমান। আর মহারাজা জসবন্ত সিং-ও দরবারী কৌলিন্যে তাদের সমকক্ষ নয়।

অনেক ভাবলো বাসুদেব,—অনেক অনেক ভাবলো। একদিন দুদিন, তিনদিন ধরে ভাবলো।

তারপর বোঝালো নিজেকে,—জীবনে যখন বৈষয়িক উন্নতিই একমাত্র সার জেনেছি, তখন আর ধর্ম, সমাজ ইত্যাদির অলীক মোহে বাঁধা পড়ে থাকি কেন?

সে রুমালে আতর লাগিয়ে এসে উপস্থিত হোলো মহম্মদ কাসিম খাঁর কাছে। যখন প্রয়োজন হয় সোজাসুজি কথা বলতে পারে বাসুদেব।

সোজাসুজিই বললো কাসিম খাঁকে, "খাঁ সাহেব, আমি আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করতে চাই। আপনি অনুমতি দিন।"

খাঁ-সাহেব চতুর লোক। হেসে উত্তর দিলো, "ভাই সাহেব, আপনার মতো কৃতী ব্যক্তি যদি আমার কন্যাকে বিবাহ করতে চান, এতো আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু ভাই, পথতো শুধু একটিই আছে—।"

"খাঁ-সাহেব, আমি তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আপনার কাছে প্রস্তাবটা পেশ করেছি।"

খাঁ সাহেব অত্যন্ত প্রীত হোলো, আস্তে আস্তে বললো, "বেটা, তুমি শুনলে খুশী হবে, আমার বাবাও হিন্দু ছিলেন। ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে উনি আমার জননীকে বিবাহ করেন। ওঁর মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তি আমি জীবনে খুব কম দেখেছি।"

বাসুদেব নিস্পৃহ হয়ে গেল উত্তরা সম্বন্ধে।

দেওয়ান শিবশঙ্কর যে গোপনে গড় থেকে বার করে নিয়ে গেছে উত্তরাকে, এ খবরও তার অজানা রইলো না। তার চর মহলের আনাচে কানাচে ঘুরছে। কিন্তু খবরটা গায়ে মাখলো না বাসুদেব। থাকগে, ঝঞ্ঝাট মিটে গেছে। সে জানবারও চেষ্টা করলো না শিবশঙ্কর কোথায় নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে উত্তরাকে।

আগামী কাল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে বাসুদেব মজুমদার। দিন-ক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে।, পরদিন বিয়ে হবে সিতারাবানুর সঙ্গে। সবাইকে এখনো বলা হয়নি, বলার ফুরসত নেই, হয়তো বলার প্রয়োজনও নেই।

বলেছিলো শুধু তার পিতা দেওয়ান শিবশঙ্করকে। শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো দেওয়ান শিবশঙ্কর। মুখ ফুটে একটি কথাও বলেনি।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো বাসুদেব। ভাবতে আশ্চর্য লাগলো। বাসুদেব মজুমদারের আজ শেষ দিন। কাল বাসুদেব মজুমদার বলে আর কেউ থাকবে না। কাল থেকে তার পরিচয় হবে অন্য নামে।

মহম্মদ কাসিম খাঁকে লুকিয়ে বাসুদেব মাঝে মাঝে দেখা করে সিতারার সঙ্গে। অল্পক্ষণের দেখা, কিন্তু একটা আশ্চর্য মাদকতা অনুভব করে এই সাক্ষাতে। সিতারার মা বাবা যে টের পায় না তা নয়, কিন্তু এখন আর মনে করার কি আছে।

তবে সিতারাও খুব শক্ত মেয়ে, সে বাসুদেবের সামনে এখনো নকাব খোলে না। মুখ ফিরিয়ে থাকে অন্য দিকে। দু-চার কথার পর চলে যেতে চায়।

বাসুদেবের আর কোনো কাজে মন দিতে ইচ্ছে করে না। বার বার মনে পড়ে শুধু সিতারার সুর্মা আঁকা দুটি চোখ।

দেবীকান্ত সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ বাসুদেবের আর নেই। কে এই দেবীকান্ত? তাকে বাসুদেব চেনে না। কিন্তু রাজাবাবু সম্বন্ধে তার আগ্রহ আছে। ধরতে হবে তাকে। মিরজুমলা খুশী হবে, তার খাতির বেড়ে যাবে ইসলাম খাঁ, জুলফিকর খাঁ, আলি কুলি খাঁ প্রমুখ সেনাধ্যক্ষদের কাছে। মিরজুমলার ফৌজকে বড় উত্যক্ত করছে ভুজঙ্গ ঠাকুরের দল। মহম্মদ সুলতানকে দোগাছিতে সেই নিরাপদে নিয়ে এসেছিলো শাহ শুজার ছাউনিতে, এজন্যে তার উপর খুব রাগ আছে মিরজুমলার। ওকে ধরতে পারলে বাসুদেবের কদর বেড়ে যাবে, নিশ্চয়ই মিলাত ও সরোপা পাবে স্বয়ং বাদশাহের কাছে। বাসুদেবের এখন দরবারী কৌলিন্যের খুব প্রয়োজন।

সে আজ যেই ফাঁদ পেতেছে, এতে তাকে ললিতা খুব সাহায্য করেছে। কাজে লেগেছে তারই পরিকল্পনা। ধরতে হবে রাজাবাবুকে, ভুজঙ্গ ঠাকুরকে,—আজ রাত্রেই, যদি সব ব্যবস্থা ঠিক মতো হয়ে যায়।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ উত্তরার কথা মনে পাড়লো। তারও তো আসার সময় হয়ে গেছে।—সে কথা মনে পড়তে একটু বিরক্ত হোলো বাসুদেব। কে ভেবেছিলো এরকম একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।

আজকালকার নানা কাজে তার সহচর ছিলো অম্বিকাপুরের থানাদার সগিরউদ্দিন খাঁ।

এত স্পর্ধা তার,—আজ সকালে এসে একটা উদ্ধত প্রস্তাব রাখলো বাসুদেবের সামনে।

"মিঞা, তুমি তো আর ইন্দ্রনারায়ণের কন্যাকে বিয়ে করছো না?"

"না, ওকে বিয়ে করে আমার কী লাভ," উত্তর দিলো বাসুদেব, "আমি যাকে প্যার করি, তাকেই বিয়ে করবো।"

"বেশ," বললো সগিরউদ্দিন, "ওই হিন্দু মেয়েটিকে আমি বিবি করবো।"

"কী!" বাসুদেব ইসলাম ধর্ম নিতে চলেছে, কিন্তু হঠাৎ তার রক্ষণশীল হিন্দুর সংস্কার রক্তের ভিতর টগবগ করে উঠলো। ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠলো, "না, না, সে কি করে হয়?"

"হয় না?" স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো সগিরউদ্দিন। সে বুঝলো বাসুদেবের বিঁধছে কোথায়। একটু হেসে আস্তে আস্তে বললো, "মিঞা, অলাওয়ার্দি খাঁর কোতল হওয়ার ব্যাপারটা বোধ হয় তুমি ভুলে গেছ?"

"ওসব কথা মনে করে কী লাভ?" বাসুদেব গলার স্বর নামালো।

সগিরউদ্দিন বলে গেল, "শুজার কাছে ষড়যন্ত্রের খবর পৌঁছে গিয়েছিলো বলে অলাওয়ার্দি খাঁকে কোতল করা হোলো। তুমি কি ভুলে গেলে শুজাকে ষড়যন্ত্রের খবর তুমিই দিয়েছিলে, কারণ তুমি এক হাজার আশরফি চেয়েছিলে অলাওয়ার্দি খাঁর কাছে আর সে দিতে রাজী হয়নি। মনে আছে? তোমাদের মধ্যে যেই কথাবার্তা হয় তার সাক্ষী আছে অলাওয়ার্দি খাঁর খাদিম খোজা মকবুল। সে এখন কোথায় আছে, শুধু আমিই জানি।"

"আজ আবার এসব কথা কেন?" শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলো বাসুদেব।

"এখন বল ভাই, মিরজুমলা কি ইসলাম খাঁ কি জুলফিকর খাঁ এখবর জানতে পেলে কি তোমার খুব উপকার হবে?"

জোঁকের মুখে নুন পড়লে যেমনি হয়, তেমনি কুঁকড়ে গেল বাসুদেব। চোখ নামিয়ে বললো, "আমায় কি করতে হবে বলো।"

"কিছু করতে হবে না। শুধু তুমি কোনো গণ্ডগোল না পাকালেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। উত্তরাকে ধরে আমি এখানেই নিয়ে আসবো।

"ওকে তুমি পাবে কোথায়? ওতো এখানে নেই। কোথায় আছে তাও কেউ জানেনা।"

"আমি জানি। আরে ভাই, যেদিন ওর উপর আমায় চোখ পড়েছে, সেদিন থেকে আমি কড়া নজর রেখেছি ওর উপর। সত্যি বলছি, তুমি খুব বেঁচে গেছ। যদি দেখতাম ওকে তুমিই বিয়ে করবার উদ্যোগ করছো, সোজা ছুরি বসিয়ে দিতাম তোমার পেটে। কেউ টের পেতো না। সবাই দেখতো তোমার লাশ ভাসছে ওই খালের জলে। তোমার শত্রুতো বড়ো কম নেই। আমাকে কেউ আর সন্দেহ করতো না।"

চকিত হয়ে সগিরউদ্দিনের দিকে তাকালো বাসুদেব। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তুমি জানো উত্তরা কোথায় আছে?"

"হ্যাঁ, আমি জানি বইকি। আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালাবে কোথায়? কেউ তো খবর রাখেনি, শুধু আমিই দেওয়ান শিব শঙ্করের ছিপ অনুসরণ করে সব জেনে নিয়েছি। উনি উত্তরাকে নিয়ে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন, সে শুধু আমিই জানি। আজ সন্ধ্যেবেলাই ওকে আমি নিয়ে আসছি গড় নাসিমপুরে।"

বাসুদেব চুপ করে রইলো। মানুষ যখন নিজের নীতিবোধ ও আদর্শের বনিয়াদ হারিয়ে ফেলে, তখন তার কাছে নিজের সুখ ও স্বার্থ ছাড়া আর কোনো কিছুরই দাম থাকে না। তার বলারও কিছু ছিলো না।

ঘরের মধ্যে চুপচাপ পায়চারি করছিলো বাসুদেব। এক সময় জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো। তাকালো খালের ওপারের জঙ্গলের দিকে। সেখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। আকাশে শুধু অসংখ্য তারা।

বোধ হয় সময় হয়ে এলো। রাত্রি প্রথম প্রহরের দু-দণ্ড পরে দেবীকান্তকে সংকেত পাঠানোর কথা।

ঃ ছয় ঃ ঃ ললিতা ঃ

মহলের ছাদের এক কোণে চুপচাপ একলা বসেছিলো উত্তরার পরিচারিকা ললিতা।

এ প্রশ্ন এর আগে কোনোদিন মনে আসেনি, এখন কিন্তু বার বার মনে হচ্ছে,—একি ঠিক হোলো? আমার কি উচিত হয়েছে উত্তরা দিদির সঙ্গে এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করা?

পুরোনো দিনগুলোর কথা একে একে সব মনে পড়তে লাগলো। উত্তরা কতো স্নেহ করতো তাকে। তার যখন যা কিছু দরকার, চাইলেই পাওয়া যেতো উত্তরার কাছে। তার মায়ের যখন খুব অসুখ করেছিলো, ওষুধ-পথ্যি করার সব খরচা দিয়েছিলো উত্তরা। একবার সে নিজে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো, তাকে ছোটো বোনের মতো পরিচর্যা করেছিলো উত্তরা। সে কতো না বিশ্বাস করতো ললিতাকে, রাজাবাবু যে পান্নার আংটি দিয়েছিলো, সেটি বিশ্বাস করে দিয়েছিলো ললিতার হাতে।

অথচ তার বিশ্বাসের মর্যাদা ললিতা রাখে নি।

দিদি এখন কোথায় আছে কে জানে! ছাদের উপর একলা

বসে ললিতা চোখের জল মুছলো। সে জানতো না কে উত্তরাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাও জানতো না। শুধু জানতো, উত্তরা এখন আর গড় নাসিমপুরে নেই। সে কাউকে জিজ্ঞেস করেও কিছু জানতে পারে নি।

আকাশের দিকে তাকালো ললিতা। হীরের টুকরোর মতো ঝিকমিক করছে অসংখ্য তারা। দূর থেকে ভেসে আসছে একটানা ঝিল্লীরব। পশ্চিমের ঘন জঙ্গলের আড়ালে ক্ষীণ চাঁদ অস্ত গেছে এই মাত্র। গঙ্গায় ভাঁটার টান শুরু হয়েছে। এখান থেকে অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে খালের জলের প্রবাহ।

প্রথম প্রহর বোধহয় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ভুজঙ্গ ঠাকুরের লোকজনেরা নিশ্চয় এতক্ষণে এসে গেছে খালের ওপারে। রাজাবাবু তাকিয়ে আছে নির্দিষ্ট জানলার দিকে, আলোর সংকেতের প্রত্যাশায়।

একটু পরে ললিতাকে নিচে গিয়ে দাঁড়াতে হবে সেই জানলার কাছে। প্রদীপ জ্বেলে সংকেত পাঠাতে হবে রাজাবাবুর কাছে।

তারপর—।

আর ভাবতে পারলো না ললিতা, দুহাতে মুখ ঢাকলো।

পা দুটো যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। কিছুতেই উঠতে পারছে না এখান থেকে।

এরকম হীন কাজে সে জড়িয়ে পড়লো কেন? নিজের মনকে সে বার বার এ প্রশ্ন করলো। আজ সারাদিন ধরে জ্বলেছে বিবেকের দংশনে। কিন্তু—।

ওই কিন্তুটাই তার কাল হোলো।

দেওয়ানজীর ছেলে তাকে দেখলে কি রকম অদ্ভুত ভাবে হাসতো। প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগতো ললিতার। কাউকে কিন্তু বলতে সাহস হোতো না। সে এখানকার একজন পরিচারিকা, মালিকদের একজনের নামে কিছু বলতে যাওয়া তার সাজে না।

কিন্তু ভালো যে একেবারে লাগতো না, তা তো নয়। তারও মন বলে কিছু আছে। সারাদিন এক জমিদার কন্যার পরিচর্যায় থেকে তো জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায় না। নিজের নারীসত্তা সম্বন্ধে সে সচেতন হতে শুরু করলো আস্তে আস্তে। দর্পনে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো অনেকক্ষণ ধরে। পুকুরে স্নান করতে গিয়ে তাকিয়ে থাকতো স্বচ্ছ জলে তার প্রতিবিম্বের দিকে।

তারপর, উত্তরার সঙ্গে সেবার গেল রাজমহল। সেখানে যে ঘটনা ঘটে গেল উত্তরার জীবনে, তাতে ললিতার নিজেরই মনের ক্ষুধা বেড়ে গেল।

জলে ডুবে যাচ্ছিলো উত্তরা, তাকে উদ্ধার করলো এক রূপবান পুরুষ।—একেবারে গল্পের মতো। এতো ললিতার জীবনেও হতে পারতো! রাত জেগে জেগে ললিতা নিজেকে কল্পনা করতো উত্তরার জায়গায়। একটা দুর্বোধ্য বেদনায় ভরে যেতো তার মন।

উত্তরা প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দিরে সেই লোকটির সঙ্গে দেখা করতে যেতো। সঙ্গে নিয়ে যেতো ললিতাকে। সে দূর থেকে তাকিয়ে দেখতো দুজনের দিকে। উত্তরা যখন ফিরে আসতো, তাঁর চোখেমুখে দেখা দিতো একটা অনুপম সুখের ঘোর। ললিতা একটা জ্বালা অনুভব করতো মনের ভিতর।

কিন্তু না, উত্তরার প্রতি তার কোনো ঈর্ষা কোনোদিন হয়নি। ওর সুখে সুখী হোতো ললিতাও। উত্তরা গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে, সেই লোকটির বিষয়ে কোনো আলোচনা করতো না ললিতার সঙ্গে।

কিন্তু দুজনের মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাবুঝি ছিলো। উত্তরার মনের প্রত্যেকটা ভাবান্তর উপলব্ধি করতে পারতো ললিতা। তার ব্যথা, বেদনা, আনন্দ-উৎকণ্ঠা, তার ভাবনা ব্যাকুলতা, তার মনের পরিপূর্ণতা সব কিছু সে অনুভব করতে পারতো। তার নিজের মনও আস্তে আস্তে হয়ে গেল উত্তরার মনের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা। তার নিজের কল্পনায়ও গড়ে উঠলো অনুরূপ এক নিরাকার পুরুষ, যারই জন্যে মনে নানা সুর বাজতো বিভিন্ন সময়। মাঝে মাঝে চোখ জলে ভরে যেতো, ভাবতো,—রক্ত মাংসের দেহ নিয়ে কখন আমার জীবনেও আবির্ভাব হবে এই অচেনা দেবতার।

উত্তরা তাকে কোনোদিন বলে দেয়নি, কিন্তু সে জানতো. ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে, কারো কাছে উত্তরার এই প্রণয়ের কথা জানানো যাবে না, তাতে বিপদ হবে সেই লোকটির, এবং তার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে উত্তরার পক্ষে। এই গোপন উপাখ্যানের পার্শ্বচরিত্র হয়ে ললিতা যেই রোমাঞ্চ অনুভব করতো, তার থেকেও সে বঞ্চিত হবে। তার নিজের এই বিচিত্র অনুভূতি থেকে বঞ্চিত সে হতে চায় না, সেজন্যই চুপ করে থাকতে হবে তাকে।

উত্তরাও জানতো যে ললিতা কাউকে কোনোদিন বলবে না। তার জন্যে উত্তরার স্নেহ অনেক বেড়ে গেল। ললিতা যেরকম খুব যত্ন করতো উত্তরার, সেও তেমনি ললিতার সুখ-সুবিধের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতো। শৈশব থেকেই দুজন দুজনের সঙ্গী, তাদের মধ্যে এক বিরাট সামাজিক পার্থক্য সত্ত্বেও, মনে মনে ছিলো একটা প্রীতির সম্পর্ক।

ললিতা জানতো উত্তরাকে বিয়ে করতে চায় বাসুদেব। তার প্রতি উত্তরার যে একটা বিরূপতা আছে, একথাও তার অজানা ছিলো না। নিয়মিত লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দিরে যাওয়া বাসুদেব যে পছন্দ করছেনা, একথা বুঝে নিতেও তার দেরি হয়নি। তাই সে

সতর্ক হয়ে উঠেছিলো মনে মনে, যাতে বাসুদেব কোনোরকম সন্দেহ করতে না পারে।

রাজমহলে সেদিন অপরাহ্নের কথা ললিতার এখনো মনে আছে। বাড়ির ভেতরে আসছিলো বাসুদেব। ললিতা তখন কি একটা কাজে সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলো। পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বাসুদেব ললিতার দিকে তাকিয়ে হাসলো তার সেই অসহ্য ভঙ্গিতে, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কি খবর ললিতা, সন্ধ্যার পর খুব আরতি দেখা হচ্ছে? না কি, গঙ্গার ধারে হাওয়া খেয়ে বেড়ানো হচ্ছে?"

ললিতা মনে মনে পুষে আসছে চাপা ভয়, তাই চমকে উঠলো এ প্রশ্ন শুনে। কিন্তু সেভাব গোপন করে মিষ্টি করে হেসে বললো, "বেশ তো দাদাবাবু, আপনিও চলুন না আজ, আমাদের সঙ্গে গঙ্গার হাওয়া খাবেন—।"

ললিতা চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু বাসুদেব তাকে যেতে দিলো না। একটি রুপোর টাকা দিলো ললিতার হাতে, জিজ্ঞেস করলো, "তোমার দিদি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা মন্দিরে যায় কেন? সত্যি সত্যি আরতি দেখতে? না কি—"

কথাটা সে শেষ না করলেও ললিতা বেশ বুঝতে পারলো কি বলতে চাইছে। ললিতার রাগ হোলো খুব। বাসুদেব কি মনে করেছে তাকে? শুধু একটি রুপোর সিক্কা টাকা দিয়ে তার বিশ্বস্ততা ক্রয় করা যায়?

একথাই সে ব্যক্ত করলো অন্য ভাষায়। হাসি মুখে বললো, "ছোটো বাবু, আপনি কি মনে করেন আমার দিদিকে?" এই বলে সে টাকাটা ফিরিয়ে দিতে চাইলো।

কিন্তু টাকাটা ফেরত নিতে চাইলো না বাসুদেব। চুপ করে কি যেন ভাবলো, তারপর গলার আওয়াজ খুব কোমল করে বললো, "আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম—।"

কিরকম একটা অদ্ভুত দৃষ্টি বাসুদেবের চোখে। ললিতার মনে

একটা ভয় ধরে গেল। চোখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কি কথা?"

"আচ্ছা ললিতা," বাসুদেব বললো, "তোমার কি চিরকাল অন্যের সেবা করে অন্যের মহলেই কাটবে? নিজের জন্যে কি একটু ভাববে না?"

চমকে উঠলো ললিতা। কি বলতে চাইছে বাসুদেব? সে চোখ তুলে তাকালো তার দিকে।

বাসুদেব আস্তে আস্তে বললো, "ভগবান তো তোমায় অনেক কিছুই দিয়েছেন, ললিতা।"

হঠাৎ কেঁপে উঠলো ললিতার সারা শরীর, কিন্তু জোর করে সামলে রাখলো নিজেকে, বাসুদেবকে জানতে দিতে চাইলো না। টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে কোনো উত্তর না দিয়ে চলে গেল আস্তে আস্তে। পেছন ফিরে না তাকিয়েও বেশ বুঝতে পারলো, বাসুদেব নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে তার দিকে।

যে কাজে যাচ্ছিলো, সে কাজ আর হোলো না। মহলের পেছন দিকে গিয়ে একটি নিরিবিলি জায়গায় গালে হাত দিয়ে বসে রইলো চুপচাপ। মাঝে মাঝে মনে হোলো,—বাসুদেব যা বলেছে, সে তো অতি সামান্য কথা, তার জন্যে এত বিচলিত হওয়ার কি আছে?—নিজের জন্যে কি একটুও ভাববে না? ভগবান তো তোমায় অনেক কিছুই দিয়েছেন ললিতা।—কেন বাসুদেব বললো এই কথাগুলো?

কেটে গেল একদিন দুদিন তিনদিন। তার নিজের কল্পনার জগতে যে আবির্ভাব হয়েছিলো এক নিরাকার আরাধ্য দেবতার, আস্তে আস্তে তার চেহারা দেখতে পেলো ললিতা। তার সঙ্গে বাসুদেবের চেহারার আশ্চর্য মিল!

কিন্তু ললিতা জানতো এ হবার নয়। তাদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান প্রচুর। নিতান্ত নির্বোধ নয় ললিতা। বাসুদেবের ওই

ব্যবহার যে কোন একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত, এ সন্দেহও তার মনে হয়েছিলো।

রাজমহলে বাসুদেবের সামনে আর বেরোয়নি ললিতা। তারপর উত্তরার সঙ্গে ফিরে এলো গড় নাসিমপুরে। বাসুদেবও পশ্চিমে চলে গেল শুজার ফৌজের সঙ্গে।

প্রায় দেড় বছর আর দেখা হোলো না বাসুদেবের সঙ্গে।

খবর আসতো মাঝে মাঝে। কখনো খবর আসতো সে আছে পাটনায়, কখনো শুনতো সে গিয়ে পৌঁছেছে কাশীতে। খজওয়ার যুদ্ধের পর যখন শুজার বিপর্যয়ের সংবাদ এলো, তখন গড় নাসিমপুরে সবারই দুর্ভাবনা হোলো বাসুদেবের সম্বন্ধে।

রাত জেগে ললিতা ভাবতো বাসুদেবের কথা। ঘুম হোতোনা এক এক সময়। প্রত্যেকবার যখন অম্বিকাপুরে অষ্টভুজা দেবীর মন্দিরে যেতো উত্তরার সঙ্গে, বাসুদেবের মঙ্গল কামনা করে পূজো দিতো। পরে যখন খবর এলো যে নিরাপদে মালদহে পৌঁছে গেছে বাসুদেব, তখন ললিতা একটু নিশ্চিন্ত হোলো।

চৈত্র মাসের শেষদিকে বাসুদেব ফিরে এলো গড় নাসিমপুরে। ললিতা বুঝতে পারলো সে ফিরে আসবার পর উত্তরার মনে একটু ভাবনা হয়েছে, কিন্তু সে নিজে খুব খুশী হোলো। বাসুদেবের অবাধ যাওয়া আসা ছিলো মহলের ভিতর। দিনে অন্তত একবার কি দুবার দেখতে পেতো তাকে। এই এক পলক চোখের দেখাতেই ললিতার মন ভরে যেতো। কিন্তু অত্যন্ত সন্তর্পণে থাকতো সে। কেউ যেন জানতে না পারে তার মনের এই গোপন খবর,—বিশেষ করে উত্তরা। এমন কি, বাসুদেব নিজেও যেন জানতে না পারে।

তার ভয় ছিলো, ,বাসুদেব যদি সুযোগ পেয়ে তার সঙ্গে কোনো অশোভন আচরণ করে। কিন্তু এ ভাবনা কেটে গেল কিছুদিনের

মধ্যেই। সে বেশ বুঝতে পারলো, বাসুদেব মহলের ভিতর আসে শুধু উত্তরাকে দেখবার জন্যে। তবে, এই দেখবার আগ্রহের মধ্যে যে কোনো অনুরাগের গভীরতা নেই, একথাও জানতে তার বাকী ছিলো না। সে বুঝতো, এ শুধু এক রকমের খবরদারি। উত্তরার উপর বাসুদেবের একটা মালিকানার মনোভাব ছিলো, সে যেন আর কারো না হয়, এজন্যেই তার এত সতর্ক দৃষ্টি। ললিতা বুঝতো সবই, আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতো মনে মনে।

ললিতার দিকে বাসুদেবের তাকিয়ে দেখবারও অবসর ছিলো না। সে খুব ব্যস্ত এ সময়টা। বাসুদেব মাঝে মাঝে চলে যায় গড় নাসিমপুর ছেড়ে, বাইরে থাকে বেশ কিছুদিন। লোকে বলাবলি করে যে, সে এখন খুব বিশিষ্ট লোক, শাহ্ শুজার পুত্র বুলন্দ আখতার ও মির বকশি সয়িদ আলম তাকে ডাকিয়ে নিয়ে তার পরামর্শ নেয়।

কেটে গেল কয়েক মাস। যুদ্ধের গোলমাল ক্রমশ বেড়ে উঠলো। শুজার বাহিনী হেরে যাচ্ছে ক্রমাগত। শোনা যাচ্ছে গড় নাসিমপুর হবে শুজার গোলন্দাজ বাহিনীর ঘাঁটি। সবারই মনে প্রবল উৎকণ্ঠা।

একদিন সন্ধ্যেবেলা বাগানের পাশ দিয়ে আসছিলো ললিতা। হঠাৎ দেখতে পেলো বাসুদেব দাঁড়িয়ে আছে একটি ঝাড়ের আড়ালে।

"ললিতা," বাসুদেব ডাকলো।

সে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো, "আমায় কিছু বলছেন, দাদাবাবু ?"

বাসুদেব হাসলো। বললো, "হ্যাঁ। ইদানীং এত ব্যস্ত ছিলাম যে তোমাদের কারো কোনো খোঁজ খবর নেওয়ারও ফুরসত পাইনি। কেমন আছো ?"

খুব কোমল তার কণ্ঠ। কিন্তু ললিতার রাগ হোলো। সে

এমহলের একজন পরিচারিকা, তার সঙ্গে এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলা কেন? উত্তর দিলো, "ভালোই আছি। দিদিকে কি কিছু বলতে হবে?"

"না ললিতা, এমনি তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্মেই তোমায় ডাকলাম।"

"আমার সঙ্গে আর কি কথা বলবেন।" ললিতা মুখ ফেরালো অন্যদিকে। হঠাৎ একটা চাপা কান্না এলো বুক ঠেলে। সে সামলে নিলো নিজেকে।

"রাজমহলে সেবার দেখা হয়েছিলো, অনেকদিন হয়ে গেল,—না?" বললো বাসুদেব, "প্রায় দেড় বছর। তোমার শরীর আর চেহারা আরো ভালো হয়েছে দেখছি।"

"আমাদের গতর খাটিয়ে খেতে হয়, শরীর ভালো না রাখলে চলে কি করে?"

"না, ললিতা, ওকথা বলছো কেন। তোমায় দেখে বেশ ভালো লাগছে, তাই বললাম। আচ্ছা, গড়ের ভিতর বসে থেকে থেকে তোমাদের মন হাঁফিয়ে ওঠে না?"

"কোথায় আর যাবো?"

"তা তো বটেই। কোথায় আর যাবে। চারদিকে অরাজকতা এখন বাইরে চলাফেরা করার বিপদ অনেক। শুনেছি, মাঝে মাঝে তুমি উত্তরার সঙ্গে অম্বিকাপুরে যাও অষ্টভুজার মন্দিরে।"

"হ্যাঁ, দিদি যান মাঝে মাঝে। আমি সঙ্গে যাই।"

"মাঝে মাঝে নয়, প্রত্যেক মাসের একটা বিশেষ দিনে। শুক্ল পক্ষের চতুর্দশীতে।"

"হ্যাঁ, দিদির কাছে শুনেছি, মায়ের পূজোর জন্মে তিথিটা খুব ভালো।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতো বটেই, খুব ভালো তিথি। শুধু তোমার দিদিই পূজো দেয়? তুমি পূজো দাও না?"

প্রথমটা কোনো উত্তর দিলো না ললিতা। তারপর বললো, "আমি মাকে প্রণাম করি, চরণামৃত নিই। ওই আমার পূজো।"

"আচ্ছা ললিতা, একটা কথা—। রাজমহলে, ওই যে লোকটি, যে বজরায় চড়ে আসতো, যে বাঁচিয়েছিলো উত্তরাকে, ওকে কি আর কোনোদিন দেখেছো?"

এ প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলো ললিতা। কিন্তু সে কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই বাসুদেব তাড়াতাড়ি বললো, "অবশ্যি দেখবেই বা কি করে, তার কোনো পরিচয় তো কেউ জানে না। সেও জানেনা উত্তরার পরিচয়। যাই হোক, রাজমহলে একদিন দেখেছিলাম, তুমি মন্দিরে একা অপেক্ষা করছো, উত্তরা গেল গঙ্গার ঘাটের দিকে। তারপর দেখলাম, খুব সুপুরুষ দেখতে একজন নৌকোয় উঠে চলে গেল। আরে, তুমি অতো চমকে উঠলে কেন? হঠাৎ মনে পড়লো, তাই বললাম তোমায়। কাকে আর বলবো। সব কথা কি সবাইকে বলা যায়। তা-ছাড়া অন্যের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসত আমার কোথায়?"

তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। ললিতা বললো, "আমি এবার যাই—।"

"না, না, যেয়ো না। একটু দাঁড়াও। তোমায় কি একটা কথা যেন বলবো ভাবছিলাম? হ্যাঁ, কথাটা কি জানো ললিতা?"

"কি?" ললিতা তাকালো বাসুদেবের দিকে।

"একটা বছর তো পশ্চিমে ঘোড়ার পিঠে চেপে যুদ্ধ করে করেই কেটেছে। এবার আমার একটু বিশ্রাম চাই।"

"সত্যি, অনেক বিপদ আপদ থেকে বেঁচে আপনি ফিরে এসেছেন—।"

"বিপদ আপদ আর কি, সৈনিকবৃত্তি যে নিয়েছে, এসব তার জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। তবে, বড়ড় একলা মনে হয় আজকাল। ভালো লাগে না।"

"এখানে তো আপনার আপনজন সবাই আছেন," ললিতা বললো।

বাসুদেব আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "আর কে আছে না আছে জানি না, তুমি তো আছো।"

"আমি!" প্রথমটা চকিত হোলো, তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল ললিতা।

"হ্যাঁ, ললিতা তুমি। খুব অবাক লাগছে শুনে, তাই না? ফৌজের সঙ্গে নানাদেশ ঘুরেছি, তাঁবুতে রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে এখানকার কথা মনে পড়তো, তোমার কথা মনে পড়তো, ভাবতাম আমাদের ললিতা এখন কি করছে।"

ললিতার ইচ্ছে হোলো ছুটে পালাতে, কিন্তু পা-দুটো যেন এঁটে গেছে মাটির সঙ্গে।

"ললিতা সেই কবে থেকে দেখছি তোমায়। মাঝে মাঝে ভাবতাম তোমার কথা। ছেলেবেলায় এবাড়িতে এসে উত্তরার সঙ্গী হয়ে, ওর সঙ্গে সঙ্গেই কি থাকবে চিরকাল। ও যখন শশুরবাড়ি যাবে, তুমিও কি যাবে তার সঙ্গে। এভাবেই কি তোমার জীবন কাটবে? মনে হোতো, না, তা হবে কেন? উত্তরা গড় নাসিমপুরে থাকবে, আমিও থাকবো গড় নাসিমপুরে। আমি তো উত্তরাকে কোথাও যেতে দেবো না। উত্তরা এখানে থাকলে তুমিও থাকবে এখানে, আমরা সবাই একসঙ্গে থাকবো। কি বলো? তা ছাড়া,—হ্যাঁ, শুধু এভাবেই কি থাকবে? সম্মানে থাকবে, আদরের সঙ্গে থাকবে, ভালোবাসা নিয়ে থাকবে। তাই না?"

"ভগবান আমায় যে ভাবে রাখবেন, সেভাবেই থাকবো," অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিলো ললিতা।

"ভগবান? হ্যাঁ, ভগবান তো সুখে সম্মানে আদরে ভালোবাসায় থাকবার মতো সব কিছু দিয়েছেন তোমায়। একথা তোমায় রাজ মহলে একদিন বলেছিলাম। অনেক কথা ভেবে বলেছিলাম

ললিতা। কথা হচ্ছে এই, ভগবান তোমায় যে সবকিছু দিয়েছেন, এটা দেখবার চোখ কজনের আছে? এ পর্যন্ত কেউ কি তোমায় বলেছে একথা? আমি তোমায় সেদিন বলেছি, আজ আবার বলছি। এবার তুমি নিজে কি একথা বুঝবার চেষ্টা করবে না।"

"বুঝতে পারছি।" ললিতার গলা ধরে গেল।

"শোনো ললিতা," বাসুদেব ললিতার হাত ধরলো।

কিন্তু ললিতা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, "আপনি মানী লোক। আমি এক সামান্য মেয়েমানুষ, মহলে আশ্রিত হয়ে আছি—।"

"ললিতা!" খুব গম্ভীর দূরাগত মেঘ গর্জনের মতো শোনালো বাসুদেবের কণ্ঠস্বর।

"ললিতা, আমি অল্পকথার মানুষ। তোমাকে আমার চাই, তবে তোমাকে আমি স্নেহ করি, এতদিন ধরে দেখছি তোমায়। তোমার উপর আমি জোর করবো না। আমি চলে যাচ্ছি। তুমি চলে যেতে পারো। কিংবা আমার সঙ্গে এখানে দুদণ্ড দাড়িয়ে দুটো কথা বলতে পারো। তোমার যা ইচ্ছে।"

বাসুদেব চলে যাচ্ছিলো, হঠাৎ ললিতার কি হোলো সে নিজেই বুঝতে পারলো না। সমস্ত ক্ষোভ, সমস্ত লজ্জা ভুলে ডাকলো, "যাবেন না, শুনুন—।"

দিনের পর দিন একটু একটু করে আত্মসমর্পন করলো বাসুদেবের কাছে।

ললিতা বুঝতো যে, এর কোনো পরিণতি নেই, তাদের অবস্থার প্রভেদ অনেক। জানতো যে, বাসুদেব ঘরনী করতে চায় উত্তরাকে। কিন্তু সে নিজের মনকে এই বলে প্রবোধ দিতো যে, সে যতোটুকু পাচ্ছে বাসুদেবের কাছে, এর বেশী তো সে চায় না। এটুকুও ছিলো তার স্বপ্নের অতীত। তার পায়ে একটুখানি ঠাঁই পেলেই সে খুশী।

আর এটুকুর জন্যে বাসুদেব ওকে যা বলবে, তাই করতেই রাজী আছে ললিতা,—সে অন্যায় হোক, পাপ হোক, যাই হোক। তার মুখে পরিতৃপ্তির হাসি দেখার জন্য সে তার জীবন দিতে রাজী আছে, এসব তো সামান্য কাজ। সে যাই করুক, পরিণতি তো এই হবে যে, উত্তরা ঘর করবে বাসুদেবের সঙ্গে। তাহলে ললিতা থাকতে পারবে তার এখানে, বাসুদেবকে দেখতে পাবে দুবেলা, সময় অসময়ে এক-আধটু স্নেহ্ আদরও পাবে তার কাছে। উত্তরার যদি অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে যায়, সে তো জন্মের মতো হারাবে বাসুদেবকে।

আমি তো ভালোবাসি,—ললিতা ভাবতো,—এর জন্য কোনো কিছুই পাপ নয়, অন্যায় নয়। তাঁর চোখে আমি যাই হই, আমার চোখে তো তিনি আমার হৃদয়ের দেবতা।

ললিতাকে মাঝে মাঝে উত্তরার কথা জিজ্ঞেস করতো বাসুদেব। প্রথমটা বলতে চাইতো না সে।

বাসুদেব একদিন বললো, "ললিতা, আমার এত খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করার একটা কারণ আছে। আমি জানি যে, উত্তরা রাজমহলে একজনের সঙ্গে প্রত্যেকদিন দেখা করতে যেতো লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দিরের কাছে গঙ্গার ঘাটে। সে বোধ হয় সেই লোকটি, যে উত্তরাকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়েছিলো। তখন যা হয়েছে, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনা। কিন্তু তার সঙ্গে যদি এখনো ওরকম গোপনে সাক্ষাৎ হয়, সেটা কি ভালো? আর যাই হোক, সে তো একদিন আমারই স্ত্রী হবে। তোমার কি উচিত নয়, আমায় সব কথা জানানো?"

ললিতা চুপ করে রইলো।

বাসুদেব বুঝলো যে ললিতা মনের জোর হারিয়ে ফেলেছে। আস্তে আস্তে বললো, "আমি তোমায় কথা দিচ্ছি ললিতা, উত্তরাকে

আমি কিছু বলবোনা। আমি শুধু ওই লোকটার এখানে আসা বন্ধ করবো। উত্তরা জানতেও পারবে না।"

ললিতা তখনো চুপ করে রইলো।

"বলো ললিতা।"

"কি বলবো?"

"আমার সন্দেহ কি সত্যি?"

"কি সন্দেহ?"

"উত্তরা যে প্রত্যেক শুক্লা চতুর্দশীর দিন অষ্টভুজার মন্দিরে যায়, শুধু ওই লোকটির সঙ্গে দেখা করতে। ওখানেও তো গঙ্গা মন্দিরের ঠিক পাশেই। হয়তো সে লোকটি আসে সেখানে। সত্যি?"

"হতে পারে," ললিতা মুখ নিচু করে বললো।

সেদিন বাসুদেব আর কিছু বললো না। গভীর প্রণয়ের নিখুঁত অভিনয় করে গেল ললিতার সঙ্গে। ললিতা যেন হাতে স্বর্গ পেলো।

পরদিন আবার জিজ্ঞেস করলো বাসুদেব।

"এ কি সেই লোকটিই, যার সঙ্গে উত্তরার রাজমহলে দেখা হোতো?"

"হতে পারে?" বললো ললিতা।

"তুমি সঙ্গে থাকো?"

"না।"

"কোথায় থাকো তুমি?"

"মন্দিরে।"

"উত্তরা একলা যায় ওর সঙ্গে দেখা করতে?"

"হ্যাঁ।"

"থাকে কতক্ষণ?"

"বেশ কিছুক্ষণ থাকে।"

"গল্প করে খুব?"

"তা করে নিশ্চয়ই।"

"কি গল্প করে?"

"তা তো আমি জানিনা—।"

"তোমায় উত্তরা বলেনি কোনোদিন?"

"না।"

"তুমি জিজ্ঞেস করোনি?"

"না।"

"এভাবে কদ্দিন চলবে?"

"সে আমি কি করে বলবো? তবে একদিন—" বলে ললিতা হঠাৎ চুপ করে গেল।

"একদিন কি?" ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো বাসুদেব।

"কিছু না।"

"না, না, বলো আমায়।"

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে ললিতা বলে ফেললো। সে একদিন উত্তরাকে না জিজ্ঞেস করে পারেনি। বলেছিলো,—দিদি, এভাবে আর কদ্দিন চলবে? উনি কেন বিয়ে করছেন না তোমায়? উত্তরা বলেছিলো,—এখন ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। উনি বললে তো, আমি এখনই ঘর ছেড়ে চলে যেতে রাজী ওঁর সঙ্গে। কিন্তু উনি বলছেন সময় হয়নি। ললিতা জিজ্ঞেস করেছিলো,—কবে ওঁর সময় হবে? উত্তরা উত্তর দিয়েছিলো,—কি জানি, হয়তো এ অঞ্চলের যুদ্ধ বিগ্রহ শেষ হলে ওঁর সুবিধে হবে আমায় নিয়ে যাওয়ার।

এ অঞ্চলে যুদ্ধ বিগ্রহ শেষ হলে! একথা শুনে বাসুদেব চমকে উঠলো। যুদ্ধ তো প্রায় শেষ বললেই হয়। শুজার পরাজয় অবধারিত। সে যে ঢাকায় চলে যাওয়ার আয়োজন করছে, বাসুদেব জানে একথা। তখন উত্তরা কাউকে না জানিয়ে চলে যাবে বাড়ি ছেড়ে? ওই লোকটির সঙ্গে?

বাসুদেব মনে মনে একটা হিসেব করলো। শুক্লা চতুর্দশীর

আর অল্প কয়েকদিন মাত্র বাকী। যা হোক এর মধ্যে একটা কিছু করতে হবে।

সেদিন আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না ললিতাকে। পরদিন আবার জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা ললিতা, সে লোকটি কি এখানেও বজরায় চড়ে আসে?"

"না, মাঝে মাঝে ছিপে চড়ে আসে, মাঝে মাঝে আসে নৌকোয়," ললিতা উত্তর দিলো।

"ছিপে চড়ে আসে?" বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো বাসুদেব, "উনি কি করেন জানো?"

"জানি না। নিশ্চয়ই জমিদার। দু-একবার শুনেছি, বাবু মশায়ের মাল্লারা ওঁকে রাজাবাবু বলে ডাকে।"

"রাজাবাবু!" চট করে উঠে বসলো বাসুদেব।

ললিতা জানালো যে, হ্যাঁ, একবার অষ্টভুজা দেবীর মন্দিরের মুরলীধরের কাছে সে শুনেছে এ নামে তাঁর উল্লেখ। আগের দিন তিনি দোগাছির ওদিকে কোথায় গিয়েছিলেন, সকালে আসতে একটু দেরি হবে,—এ সংবাদ দিতে গিয়ে ও রাজাবাবু বলে তাঁর উল্লেখ করেছিলো।

"রাজাবাবু!" কি রকম যেন হয়ে গেল বাসুদেবের মুখ। ললিতা ভয় পেয়ে গিয়েছিলো ওর চেহারা দেখে। একবার মনে হোলো, কিছু না বললেই ভালো হোতো। কিন্তু তখন আর উপায় নেই।

শুক্লা চতুর্দশীর দিন সকালে যখন যাওয়ার আয়োজন হচ্ছে, তখন ললিতার সঙ্গে বাসুদেবের একবার দেখা হয়েছিলো বাগানের এক নিভৃত কোণে। তাকে ডেকে নানা কথা জিজ্ঞেস করেছিলো বাসুদেব,—ওরা কখন রওনা হচ্ছে, কে কে সঙ্গে যাচ্ছে, কতক্ষণ থাকবে, এসব। তার মুখে ললিতা শুনতে পেলো যে, আজ কাল এধারে মোগল সৈন্যদের উৎপাত বেড়ে গেছে, তাই সঙ্গে কিছু বরকন্দাজ দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাজামশায়।

সে ভাবতে পারেনি তাদের দেখে ফেলবে উত্তরা। উপরে যেতে উত্তরা যখন ডেকে জিজ্ঞেস করলো,—হ্যাঁরে, ছোটোবাবু বাগানের মধ্যে কি বলছিলেন তোকে,—ললিতা ভয় পেয়ে গেল, উত্তরা যদি কোনো রকমে টের পেয়ে যায় তাদের গোপন সম্পর্কের কথা। কোনো রকমে দু-চার কথা বলে সরে পড়লো সেখান থেকে।

সেদিন মন্দিরে যাওয়ার পর যা ঘটনা ঘটলো, তাতে বিস্ময়বিমূঢ় হোলো ললিতা। এই লোকটা ডাকাত? হ্যাঁ, ভুজঙ্গ ঠাকুরের পালিত পুত্র এক রাজাবাবুর নাম সে দু-একবার শুনেছে, কিন্তু এযে সে হতে পারে তার কোনোদিন মনেই হয়নি। ডাকাত হলে কি রকম চেহারার লোক হয়, সে সম্বন্ধে মনে মনে একটা নিষ্ঠুর বীভৎস ভয়াবহ রূপ সে কল্পনা করে নিয়েছিলো,—কিন্তু এরকম সুপুরুষ সম্ভ্রান্ত এক ব্যক্তি যে সেরকম হতে পারে ললিতা ভাবতেই পারে নি! ওর ধারণা ছিলো, ইনি নিশ্চয়ই কোনো সম্ভ্রান্ত জমিদার, রাজা খেতাব আছে।

সেই একদিনের মধ্যে কতো ওলট-পালট হয়ে গেল গড় নাসিমপুরে। রাজা ইন্দ্রনারায়ণ ও উত্তরা বন্দী হোলো মহলের মধ্যে। সুরেশ্বরী চলে গেল গড় নাসিমপুর ছেড়ে।

ললিতা বুঝতে পারলো না, কেন এরকম হোলো। কিন্তু মনে মনে একটা অপরাধ বোধ গড়ে উঠলো। চোখ তুলে তাকাতে পারতো না উত্তরার দিকে।

হয়তো অনুতপ্ত হোতো সে, কিন্তু হঠাৎ তার মন অন্য সমস্যায় ব্যাকুল হয়ে উঠলো। বাসুদেব আর ডাকছে না তাকে, সে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই দেখা করতে পারছে না তার সঙ্গে। সে ভেবে পেলোনা, এমন কি অপরাধ করেছে সে, যার জন্যে তার মুখ দেখছে না বাসুদেব।

উত্তরার সঙ্গে ইদানীং বেশী দেখা হোতো না। উত্তরা সারাদিন

চুপচাপ বসে থাকতো জানলার কাছে, উদাস মনে মশগুল হয়ে থাকতো নিজের ভাবনায়। ললিতা তাই তার কাছে বেশী থাকতো না, কাজকর্ম যা করবার করে দিয়ে সরে যেতো উত্তরার চোখের সামনে থেকে। উত্তরার দিকে চোখ তুলে তাকাবার মুখ তার ছিলো না।

সেদিন সকালে উত্তরা হঠাৎ তাকে ডেকে বললো, "আমার একটা কাজ করে দিবি ?"

"কি কাজ দিদি ?"

উত্তরার হাতে ছিলো একটি পান্নার আংটি। ললিতা জানতো এটা সেই রাজাবাবুর দেওয়া। সেটি খুলে ললিতার হাতে দিয়ে বললো, "অম্বিকাপুরে অষ্টভুজার মন্দিরে চলে যা। সেখানে মন্দির ঝাঁট দেয় মুরলীধর নামে সেই যে লোকটি, তাকে এই আংটি দেখিয়ে বলবি, তোকে রাজাবাবুর কাছে নিয়ে যেতে। ওঁর সঙ্গে যখন দেখা হবে, এই আংটি দিয়ে বলবি আমাদের অবস্থার কথা। পারবি তো ?"

আমাদের উদ্ধারের একটা উপায় করতে হবে তো,—বলছিলো উত্তরা। হ্যাঁ, উপায় তো একটা করতেই হবে। আংটি হাতে নিয়ে চুপচাপ দেখছিলো ললিতা। তাকে এখনো এতো বিশ্বাস করে উত্তরা দিদি ! তার চোখ জলে ভরে এলো। একটা অনুতাপ এলো তার মনে। স্থির করলো, না, একাজটি করতেই হবে। দিদির বিশ্বাসের মর্যাদা আমি রাখিনি,—অন্তত একাজটি করেই দেবো।

সে মনস্থির করে নেমে আসছিলো মহল থেকে। কিন্তু পথে দেখা হয়ে গেল বাসুদেবের সঙ্গে। আর তখনই সব গোলমাল হয়ে গেল। মুছে গেল তার সমস্ত অনুতাপ, ভেসে গেল তার সমস্ত সংকল্প।

বাসুদেব তাকে এড়িয়েই চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু ললিতা তার

সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বললো, "আপনি আমায় ভুলে গেছেন, তাই না?"

বাসুদেব গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "পথ ছাড়ো ললিতা, আজকাল আমি ভীষণ ব্যস্ত। অন্য কোনোদিকে মন দেবার সময় আমার নেই। পরে কথা হবে।"

ওর দিকে চুপচাপ তাকিয়ে দেখলো ললিতা। তারপর বললো, "হ্যাঁ, অন্য কোনো দিকে মন দেবার সময় আমারও নেই। আমিও ব্যস্ত। এই আংটি পৌঁছে দিতে হবে একজনের কাছে," বলে সেই পান্নার আংটি দেখালো।

"কার আংটি এটা?" জিজ্ঞেস করলো বাসুদেব, "কার কাছে পৌঁছে দেবে?"

ললিতা হাসলো, বললো, "তবু ছুটো কথা আমায় জিজ্ঞেস করার ফুরসত হোলো। কার আংটি মনে হয়?"

"কার? উত্তরার?"

"না।"

"তা হলে?"

"সেই রাজাবাবুর।"

"রাজাবাবুর! দেখি দেখি—।"

ললিতা আংটি দিলো না। একটু সরে দাঁড়ালো।

বাসুদেব এগিয়ে এলো ললিতার কাছে। গলাটা ভারী করে বললো, "ললিতা, তুমি আমার উপর এত রাগ করে আছো কেন? তুমি কি বোঝো না এখন আমি কতো ব্যস্ত? আমি গড় নাসিমপুরের কিলাদার হয়েছি, আমার এখন কত কাজ।"

"আমার সঙ্গে ভালো করে ছুটো কথা বলারও সময় হয়না?" অভিমানে ললিতার চোখে জল এলো।

বাসুদেব তাকিয়ে দেখলো ওর দিকে। তারপর বললো, "আচ্ছা, এসো। নিরিবিলিতে কোথাও বসে ছুটো কথা বলি।

ওরে বাবা, কী রাগ আমার ললিতার। যতো বেশী ভালোবাসা, ততো বেশী রাগ।"

এটুকুতেই ললিতার সব অভিমান মিটে গেল। নিরিবিলিতে গিয়ে বসলো দুজনে। অনেকক্ষণ নানাকথার পর বাসুদেব জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, এ আংটি তোমার কাছে কেন? তুমি যাচ্ছিলে কোথায়?"

"তোমায় বলে কি লাভ?" ললিতা অধর স্ফীত করে বললো, "তুমি তো আজকাল আমার দিকে আর ফিরেও তাকাওনা।"

"আজকাল কোনোদিকে ফিরে তাকানোর ফুরসত আমার হয়না ললিতা। কিন্তু মনে মনে সব সময় ভাবি তোমার কথা।"

"ভাবো, সত্যি সত্যি?"

"এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।"

ললিতা বিশ্বাস করলো বাসুদেবের কথা। একটু কাছ ঘেঁষে ওর কাঁধে মাথা রাখলো, বললো, "তুমি আমায় সব সময় তোমার কাছে কাছে রাখবে তো? দিনে একবার শুধু চোখের দেখা পেলেই আমি খুশী। আমি আর কিছু চাই না।"

বাসুদেব একটু আদর করলো ললিতাকে। তারপর বললো। "আমি তোমায় কথা দিচ্ছি ললিতা, তুমি চিরকাল আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে।"

এই আদর চোখ বুঁজে উপভোগ করলো ললিতা। সুযোগ বুঝে বাসুদেব আবার জিজ্ঞেস করলো আংটির কথা। কি যে হোলো ললিতার, ভুলে গেল সব অনুতাপ, ভুলে গেল উত্তরার প্রতি তার বিশ্বস্ততা। সব বলে ফেললো বাসুদেবকে।

শুনে বাসুদেব লাফিয়ে উঠলো। বললো, "হ্যাঁ, আবার সুযোগ এসেছে। এবার ধরতে পারবো সেই ডাকাতের বাচ্চাকে।"

ললিতা অবাক হয়ে বাসুদেবের দিকে তাকালো। না, না, এ কি করে হয়! কি ভুল করলো সে বাসুদেবকে বলে।

বাসুদেব বোঝালো ললিতাকে।

"তুমি জানোনা ললিতা, এতে আমার লাভ, আর তোমারও লাভ। রাজাবাবুকে ধরতে পারলে, কে জানে, আমি হয়তো তিন হাজারী মনসবদার হয়ে যেতে পারি। বাংলার কজন হিন্দু এতখানি উঠতে পেরেছে? তুমি কি চাওনা ললিতা, তোমার বাসুদেব তিন হাজারী মনসবদার হোক, যেই বাসুদেব তোমায় এত ভালোবাসে? তুমি আমায় বিশ্বাস করো ললিতা, আমি তোমায় গড় নাসিমপুরে রাজরাণী করে রাখবো।"

ললিতা চুপ করে রইলো।

বাসুদেব আস্তে আস্তে বললো, "তুমি কি বিশ্বাস করো রাজাবাবু এখান থেকে উত্তরাকে বার কবে নিয়ে যেতে পারবে? উত্তরার কি কোনো লাভ হবে এতে? রাজাবাবু আমার হাতে আজ বা কাল ধরা পড়বেই। শুধু এক্ষেত্রে সহজে হবে কাজটা। আর তোমার কাছে এরকম একটা উপকার যদি পাই, আমি চিরকাল কেনা হয়ে থাকবো তোমার।"

ললিতা একটু ইতস্তত করে বললো, "কিন্তু উত্তরা দিদি কী মনে করবে আমায়?"

"সে কি করে জানবে যে তুমি আমায় বলে দিয়েছো? সে শুধু জানবে যে, তাকে উদ্ধার করতে এসে ধরা পড়েছে রাজাবাবু। তারপর যার ভাগ্যে যা আছে হবে।"

"তুমি একটা কথা দাও আমায়—"

"বলো কি কথা?"

"তুমি উত্তরা দিদিকে কোনো কষ্ট দেবে না?"

"মাথা খারাপ? উত্তরাকে কষ্ট দেবো আমি? উত্তরা আর কিছু না হোক, আমার ছেলেবেলার খেলার সাথীতো। তুমি জানো না। আমি কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি দেবো রাজামশায় আর উত্তরাকে। শুনলে তুমি খুশী হবে, আমি উত্তরাকে বিয়ে কোরবো

না। রাজামশায় উত্তরাকে নিয়ে কাশী চলে যেতে পারেন। কিংবা অন্য যেখানে খুশী যাবেন। আমি সব সুবিধে করে দেব। - আর, এখানে থাকবো শুধু আমি আর তুমি।"

"সত্যি?" নিজের কান দুটাকে বিশ্বাস করতে পারছেনা ললিতা। এত সৌভাগ্য কি তার হবে?

আস্তে আস্তে বোললো, "বলো, আমায় কি করতে হবে?"

অষ্টভুজার মন্দিরে গিয়ে মুরলীধরকে খুঁজে পেতে ললিতার অসুবিধে হয়নি। রাজাবাবুর আংটি দেখে সে নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্বাস করলো ললিতাকে। ভুজঙ্গ ঠাকুরেরই দলভুক্ত চর সে।

নৌকোয় প্রায় চার দণ্ডের পথ। এখাল থেকে সে খালে পড়ে গহন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ভিতর দিয়ে ললিতা মুরলীধরের সঙ্গে এসে পড়লো দেবীকান্তর আস্তানায়!

খুব বিচলিত ছিলো দেবীকান্তও। মালদহের ফৌজদারের লোকজন গিয়ে যে গড় নাসিমপুর দখল করেছে, এ সংবাদ সে পেয়ে ছিলো। কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ আর উত্তরা যে কয়েদ হয়ে আছে গড়ের ভিতর, একথা সে জানতো না। ধরাপড়ার ভয় সত্ত্বেও আগের শুক্লা চতুর্দশীর দিন সে গিয়েছিলো উত্তরার খোঁজে, ওর দেখা না পেয়ে ফিরে এসেছে মর্মাহত হয়ে।

এখন ললিতার কাছে সব খবর শুনে রাগে উন্মাদ হয়ে গেল। —উত্তরাকে কয়েদ করেছে বাসুদেব? তার উত্তরাকে।

দেবীকান্ত তক্ষুনি ছুটে যেতে প্রস্তুত।

"অতো বিচলিত হলে কাজ হবে না," ললিতা বললো, "আপনাকে গড়ের ভিতর আসতে হবে। একেবারে একা। দল বল নিয়ে এলে কাজ হবে না।"

"একা আমি কী করতে পারবো?"

"যা কিছু করার একাই পারবেন। গড়ে এখন লোকজন বেশী নেই। অল্প কয়েকজন বাদে অন্য সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে জঙ্গীপুরের মোগল ছাউনিতে। শুমুন মন দিয়ে,—কাল রাত্রি প্রথম প্রহরের ঠিক দুই দণ্ড পরে আমি ডানদিকের একটি জানলায় এসে একটি প্রদীপ ঘোরাতে থাকবো। সেটাই আমার সংকেত। আপনি তখন সাঁতরে খাল পার হয়ে আসবেন। দেওয়াল বেয়ে কোনোরকমে উঠে জানলার কাছে আসতে হবে আপনাকে। আমি জানলা খুলে দেবো। আপনি ভিতরে আসবেন।"

"তারপর ?"

"ও সময় বাসুদেব একলা থাকেন নিজের ঘরে। আপনাকে আমি পথ দেখিয়ে দেবো! আপনি সোজা ওঁর ঘরে চলে যাবেন। যে ঘর দুটোতে রাজা ইন্দ্রনারায়ণ আর উত্তরাকে কয়েদ করে রাখা হয়েছে, তার চাবি বাসুদেবের কোমরেই গোঁজা থাকে সব সময়। এখন আপনি কি করে সে চাবি হাত করবেন, সেটা আপনাকে স্থির করতে হবে। তবে একথা নিশ্চয়ই জেনে রাখবেন যে, প্রাণ থাকতে সে চাবি হাত ছাড়া করবেন না বাসুদেব। এবং আপনার পক্ষে সশস্ত্র হয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

ললিতার ভয় ছিলো, যদি দেবীকান্তর কোনোরকম সন্দেহ হয়। কিন্তু পান্নার আংটি দেখে সে বিশ্বাস করলো। ললিতাকে সে অনেকবার দেখেওছে উত্তরার সঙ্গে।

ললিতা গড় নাসিমপুরে ফিরে আসতে বাসুদেব জিজ্ঞেস করলো, "সে আসছে তো ?"

"হ্যাঁ, আসছে," আশ্বাস দিলো ললিতা।

খুব খুশী হয়ে ললিতার হাত ধরে পাশে টেনে বসালো। সুখের আবেশে ললিতার চোখ দুটি বুঁজে এলো।

"ঠিক আছে," বাসুদেব বললো, "চারজন লোকই যথেষ্ট।

না, না, বলা যায় না, ও তলোয়ার ঘোরায় খুব ভালো। বরং ছ-জন লোক রাখবো সেই ঘরে। হ্যাঁ, ছ-জনই যথেষ্ট হবে।"

"লোক রাখবে কেন?" বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো ললিতা।

"ওরা লুকিয়ে থাকবে ঘরের ভিতর। ও জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই তুমি ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে সরে যাবে একপাশে।"

"তারপর?"

"ওই ছ'জন লোক তখন ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর উপর। বেশিক্ষণ লাগবে না। দু-তিন মুহূর্তের কাজ।"

আতঙ্কে ললিতার মুখ শুকিয়ে গেল। "কিন্তু ওঁকে হত্যা করার চাইতে বন্দী করলেই ভালো হোতো না?"

"ওকে জীবন্ত ধরে আমার কী লাভ." বললো বাসুদেব, "মির-জুমলা কি ইসলাম খাঁ ওর লাশ দেখলেই আমার কাজ হবে।"

বলতে বলতে একটা নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠলো বাসুদেবের মুখে। সে বলে গেল, "তোমরা কেউ জানোনা এই রাজাবাবুর আসল পরিচয়। দেবীকান্ত রায়ের নাম শুনেছো?"

"কোন দেবীকান্ত? যাকে রাজা মশায় সুবর্ণগ্রাম থেকে এখানে এনে রেখেছিলেন?"

"হ্যাঁ, আমাদের এই রাজাবাবু হোলো সেই দেবীকান্ত রায়। ছেলেবেলায় পালিয়ে গিয়েছিলো গড় নাসিমপুর থেকে। উত্তরা তাকে রাজাবাবু বলে প্রথমে জানতো না, তার এত ভালোবাসা দেবীকান্তর জন্যে।"

একটা নিষ্ঠুর কুটিল দৃষ্টি ফুটে উঠলো বাসুদেবের চোখে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো ললিতা। বাসুদেবের এই রূপ সে আগে দেখেনি কোনোদিন।

—ললিতার সারা মুখ ঘেমে উঠলো। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো সে। প্রথম প্রহর কেটে গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সংকেত পাঠানোর সময় হবে।

অনেক নিচে ওধারে খালের জল একটুখানি চিকচিক করছে রাতের অন্ধকারে। খালের উপরে ঘনঘোর জঙ্গল, সেই জঙ্গল ঘিরে নিকষ কালো অন্ধকার। প্যাঁচা ডেকে উঠছে থেকে থেকে, আর ডাকছে অসংখ্য ঝিঁঝিঁ পোকা। অনেকদূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে শেয়ালের তীক্ষ্ণ ডাক।

অন্ধকারের মধ্যে ভালো করে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো ললিতা। কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু এতক্ষণে এসে পড়েছে নিশ্চয়ই।

ললিতা আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

নিচে যাওয়ার সময় হয়ে আসছে।

ঃ সাত ঃ　　　　　　　　　　　　ঃ সিতারাবানু ঃ

একটি মহল মহম্মদ কাসিম খাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তার পরিবারের মহিলাদের জন্যে। কিন্তু সিতারাবানু বসে থাকতে পারে না নিজেদের ছোটো গণ্ডিটুকুর মধ্যে। গোলক ধাঁধাঁর মতো মহলের ভিতরের অলিগলি পথ। তার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে আর মাঝে মাঝে হারিয়ে যেতে ভালো লাগে।

এদিকটা অন্দর-মহল বলে বাইরের পুরুষেরা এদিকে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। রাজা ইন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর কন্যা উত্তরা কয়েদ হবার পর ভিতর মহলে ওদের যেসব নিকট কি দূর আত্মীয়েরা ছিলো তাদেরও বার করে দেওয়া হয়েছে গড় নাসিমপুর থেকে। তাই অন্দর মহল প্রায় ফাঁকা।

রাজা ইন্দ্রনারায়ণ বন্দী হয়ে আছে পূবদিকের মহলে। আগে সেখানে ছিলো পুরুষ পাহারাদার। ফৌজদার কাসিম খাঁর পরিবার এখানে এসে বসবাস শুরু করার পর ওদের সরিয়ে দিয়ে খোজা প্রহরী মোতায়েন করা হয়েছে। সেদিকে যায় না সিতারাবানু। ইন্দ্রনারায়ণের মেয়ে উত্তরার কথা সে অনেক শুনেছে মহলের

পরিচারিকাদের কাছে। ওকে দেখার খুব ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু পরে জানতে পেরেছে যে, তাকে গড় নাসিমপুরের বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এখন সে কোথায় আছে কেউ ঠিক করে বলতে পারে না।

ঝরোকার এধার থেকে, কিংবা ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে এদিক থেকে দেখা যায় বিস্তীর্ণ কলস্বরা গঙ্গা। মহলের অন্যদিকে চওড়া খাল। তার ওপারে গভীর জঙ্গল। সিতারাবান্নু এর ওর তার কাছে নানারকম গল্প শোনে গড় নাসিমপুরের পুরোনো গৌরবের দিনগুলোর সম্বন্ধে।

গঙ্গার বুকে সারাদিন চলাচল করে ছিপ, নৌকো, বজরা, পান্‌সি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে ভালো লাগে। কিন্তু সন্ধ্যে হতে না হতে আর নৌকো-চলাচল দেখা যায় না। আজকাল নাকি এ অঞ্চলে ডাকাতের উপদ্রব খুব বেড়ে গেছে। খাল পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে কেউ যায়ই না বড়ো একটা। গড়ের প্রধান প্রবেশ পথ উত্তরের ময়দানের দিকে। লোকজনের যাওয়া আসা সেদিক দিয়ে। মহলের পেছন দিক থেকে ওদিকটা দেখাই যায় না।

সিতারা মায়ের কাছে শুনেছে, গড় নাসিমপুর নাকি জায়গির হিসেবে দেওয়া হবে তার ভাবী-স্বামীকে। সে খুশী হয়েছিলো একথা শুনে। গড় নাসিমপুর তার খুব ভালো লেগে গিয়েছিলো। বিয়ের ব্যাপারে তার যে খুব আগ্রহ তা নয়, তবে সমকালীন আর দশজন সাধারণ মেয়ের মতো সে এই বিয়ের ব্যাপারটাকে নিয়েছিলো জীবনের একটা অপরিহার্য ঘটনা হিসেবে।

মাঝে মাঝে তার ভেবে অবাক লাগতো, শুধু তার রূপে মুগ্ধ হয়ে একজন সম্ভ্রান্ত বংশের হিন্দু নিজের ধর্ম ত্যাগ করতে রাজী হতে পারে কি করে! সাধারণ লোকের মধ্যে এরকম প্রচুর হয় বলে সে শুনেছে। ওদের জীবনযাত্রায় নানারকম অর্থনৈতিক

পীড়ন, সামাজিক অবিচার, রাজনৈতিক অত্যাচার প্রভৃতির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে অনেকে ধর্মান্তরিত হয়। এ ধরনের লোক মোগল শাসনাধীনে যেসব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধে পায়, তার আকর্ষণও বড় কম নয়।

কিন্তু উচ্চবংশের হিন্দুদের মধ্যে তো এরকম শোনা যায় না বড়ো একটা। সিতারার নিজের পিতামহ হিন্দু ছিলো, কিন্তু তাঁর মতো লোক খুব বেশী নয়। তিনি একজন পীর সাহেবের প্রভাবে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উচ্চবংশের হিন্দুদের আত্মগৌরব খুব। ওদের মধ্যে বেশির ভাগই নানা পীড়ন অসুবিধে সহ্য করে, এমন কি প্রাণ দিতেও দ্বিধাবোধ করে না তাদের ধর্মের জন্যে।

তবু মাঝে মাঝে শোনা যায় এক একজনের কথা। কারো কারো ক্ষেত্রে উপলক্ষ থাকে কোনো নারীর প্রতি মোহ। এদের কথা শুনলে সিতারাবানুর শ্রদ্ধা হয় না। ধর্মকে কি নেহাতই ছেলেখেলা মনে করে এরা?

শ্রদ্ধা যে মহম্মদ কাসিম খাঁর মতো লোকেরাও করে তা নয়, তবে এদের উৎসাহিত করার একটা রাজনৈতিক প্রয়োজন আছে। সিতারাবানুও জানতো একথা, তাই হিন্দুস্তানের মোগল-সাম্রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সে রাজী হয়েছিলো পিতার কথায়।

৮

তাকে প্রথম দেখাতেই সিতারার ভালো লাগেনি।

ভেতরের মহলটি বেশ নির্জন, লোকজন খুব বেশী নেই, শুধু কিছু খোজা খাদিম আর নিজেদের মুসলমান খাদিমানেরা। মহলের অন্য এক অংশ, যেদিকে উত্তরা থাকতো,—এবং এখন থাকে তার পরিচারিকা ললিতা নামে সেই হিন্দু মেয়েটি, এবং আর কয়েকজন হিন্দু দাসী ও রাঁধুনী,—এদিক থেকে একেবারে আলাদা। আরেকটি

অংশে থাকেন রাজা ইন্দ্রনারায়ণ, কিন্তু তার ঘরের দরজা বন্ধ থাকে সব সময়। বাইরে সর্বক্ষণের জন্যে মোতায়েন আছে খোজা প্রহরী। মহলের অন্যান্য অংশ থেকে কাসিম খাঁর জন্যে নির্দিষ্ট অংশে আসা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ হাবসী খোজা পাহারাদারের কড়া পাহারা আছে প্রবেশ করার পথে।

চারদিকে পাঁচিল ঘেরা বাগান। তার আরেক প্রান্তে আছে আরেকটি মহল। সেখানে থাকেন রাজা ইন্দ্রনারায়ণের দেওয়ান শিবশঙ্কর মজুমদার এবং তাঁর ছেলে, গড় নাসিমপুরের কিলাদার বাসুদেব মজুমদার। নাসিমপুর সুবর্ণগ্রামের জমিদারির কাছারিও আছে সেই মহলের সামনের দিকে।

বাসুদেব যে মাঝে মাঝে আসতো রাজা ইন্দ্রনারায়ণের মহল ও উত্তরার মহলের দিকে, এটা সিতারা জানতো। সে তার মহলে চিকের আড়াল থেকে দেখতে পেয়েছিলো কয়েকবার। তার ভাবনার কোনো কারণ ছিলো না। বাইরের কেউ যে ভুল করেও মহলের এদিকের অংশে এসে পড়বে, তার কোনো উপায় ছিলো না।

কিন্তু ভুল একদিন সে নিজেই করলো।

মহলের ভিতর গোলকধাঁধাঁর মতো পথ এক-এক জায়গায়। সেখানে ঘুরে বেড়াতে সিতারার ভালো লাগতো। কতো গুপ্ত পথ, গুপ্ত কক্ষ আছে এদিকে সেদিকে,—আস্তে আস্তে কিছু কিছু জেনে গিয়েছিলো সিতারা। সে অবাক হয়ে ভাবতো, কী অদ্ভুত ভাবে এই গড় তৈরী করেছিলো এক কুশল স্থপতি। রাজা ইন্দ্রনারায়ণের পরিবারের লোকজন তো বেশী ছিলো না কোনো সময়। সে এক সাধারণ জমিদার। এরকম একটা গড় সে তৈরী করিয়েছিলো কী উদ্দেশ্যে। কোন কাজে লাগে এই সব চোরা-পথ, গুপ্ত কক্ষ? সিতারার মনে হোতো, অদ্ভুত রহস্যময় এই পুরী, সরু নিচু আধো-অন্ধকার আঁকা বাঁকা পথে আর জনশূন্য আসবাব পত্র-হীন নিচু

নিচু প্রায় অন্ধকার ঘরগুলোতে নিজেকে মনে হোতো যেন এক রূপকথার নায়িকা।

মহলের এই বিচিত্র ছাঁদ রাজা ইন্দ্রনারায়ণ ও দেওয়ান শিবশঙ্কর ছাড়া আর কেউ জানতো না, এমন কি বাসুদেবও নয়। সুতরাং সিতারারও একথা জানবার উপায় ছিলো না যে, মহলের বিভিন্ন অংশ একে অপর থেকে যতোই বিচ্ছিন্ন হোক, ভূতলস্থিত গুপ্তপথে প্রত্যেক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের একটা সংযোগ আছে।

একদিন সে একটি অন্ধকার কুঠরির মধ্যে এসে দেখলো সেখান থেকে একটা সরু ঘোরানো সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। সিতারা খুব সাহসী মেয়ে। তার কৌতূহল ও প্রচুর। সে নামতে লাগলো সেই সিঁড়ি ধরে। কুঠরি ছিলো দোতালায়। কিন্তু নামতে নামতে সিতারা বুঝতে পারলো সে একতলা থেকেও নিচে নেমে এসেছে। খুব অস্পষ্ট আলো সেখানে, যেটুকু আলো আসছে, তাও কোনো একটা অদৃশ্য চোরা ঘুলঘুলি দিয়ে। নিচে নেমে এসে অপ্রশস্ত দেওয়ালএ ঘেরা নিচু পথ সোজা চলে গেছে, তারপর ডাইনে একটা বাঁক, তারপর বাঁয়ে, তারপর আবার ডাইনে। সোজা হাঁটতে লাগলো সিতারা। নিশ্চয়ই মহলের এই অংশটা মাটির নিচের তহ্‌খানায় যাবার পথ। অনেকটা গিয়ে দেখলো সিঁড়ি আবার উঠে গেছে উপর দিকে

সিতারা উঠতে লাগলো সিঁড়ি বেয়ে। খানিকটা উঠে আসতে অন্ধকার কমে এসে পরিষ্কার আলো দেখতে পেলো। এক জায়গায় এসে একটা খোলা দরজা। বাইরে বাগান। সিতারা তাকিয়ে দেখে বুঝলো, সে নিচে থেকে আবার এক তলায় উঠে এসেছে, এবং এটা মহলের আরেক অংশ।

এখানে ঘুরে বেড়ানো ঠিক হবে না,—সিতারা ভাবলো,—এখানে অন্য লোক থাকে। কে জানে, কে না কে কখন এসে পড়বে।

সে ফিরে যাচ্ছিলো। হঠাৎ শুনলো উপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে একটা ভারী পদশব্দ। তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছিলো সিতারা। কিন্তু সে দেখে ফেললো।

"কে? কে তুমি?" শোনা গেল এক অপরিচিত পুরুষের কণ্ঠ।

সিতারা তাড়াতাড়ি মুখের উপর নকাব টেনে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালো। কিন্তু লোকটি চলে গেল না। দাঁড়িয়ে রইলো স্তব্ধ হয়ে। সিতারা না তাকিয়েও বুঝতে পারলো, সে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

লোকটিকে অত্যন্ত বেয়াদব মনে হোলো সিতারার। সে যখন ভুল করে হঠাৎ সামনে এসে পড়েছে, তখন যে কোনো ভদ্র ব্যক্তির মতো তৎকালীন আদব অনুযায়ী এ লোকটির উচিত ছিলো চোখ নিচু করে মাথা নত করে অন্য দিকে চলে যাওয়া। কিন্তু তা না করে লোকটি নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে আছে তার দিকে! ভাগ্যিস নকাব ছিলো সিতারাবানুর মুখের উপর, তা নইলে একেবারে বে-আব্রু হোতো এই অপরিচিত ব্যক্তির সামনে। ভালো করে তাকিয়ে দেখেনি সিতারা। মনে হোলো লোকটি হিন্দু।

খানিক অপেক্ষা করে সিতারা যখন দেখলো লোকটি যাচ্ছে না, তখন সে নিজেই তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার উদ্যোগ করলো। সে শুধু বিরক্ত হয়েছিলো, তার ভয় হয়নি একটুও। ফৌজদার মহম্মদ কাসিম খাঁর কন্যাকে অসম্মান করবে, এমন সাহস কারো নেই।

সে চলে যাচ্ছিলো, কিন্তু লোকটি নেমে এসে পথ আটকে দাঁড়ালো। বললো, "আমি চিনি না এমন কেউতো গড় নাসিমপুরে থাকে না। অপরিচিত কাউকে দেখলে আমাকে তার পরিচয় জানতে হয়। এটা এখানকার রেওয়াজ।"

সিতারাবানু অভিজাত পরিবারের কন্যা, তার একটা রুচি আছে। সে যতোই বিরক্ত হোক, অকারণ অন্য লোকের অসম্মান

সে করে না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে খুব সংবৃত ভাবে উত্তর দিলো, "আমি সিতারাবানু,—মহম্মদ কাসিম খাঁর কন্যা। আপনি কে?"

"আমি? আমি গড় নাসিমপুরের কিলাদার বাসুদেব মজুমদার।"

সিতারা আর দাঁড়ালো না। সৌজন্য করে একটুখানি সালাম করে চলে গেল অন্যদিকে।

একবার ভেবেছিলো, ঘটনাটা কাসিম খাঁকে জানাবে। কিন্তু পরে স্থির করলো এসব সামান্য ব্যাপার কাউকে না জানানোই ভালো। বাসুদেব মজুমদারের সঙ্গে তার পিতা কাসিম খাঁর একটা সদ্ভাব আছে। অনর্থক বাসুদেবের উপর অসন্তুষ্ট হবে কাসিম খাঁ। তা-ছাড়া তারও এভাবে অবাধে মহলের ভিতর ঘুরে বেড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে।

সে মন থেকে ঝেড়ে ফেললো এই ঘটনার স্মৃতি।

দিন ছয়েক পর একদিন দেখলো মহম্মদ কাসিম খাঁ সিতারার জননীর সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছে! সে সেখানে গিয়ে পড়তেই ওরা চুপ করে গেল। কোনো গোপনীয় কথা হচ্ছে ভেবে সিতারা চলে আসছিলো, কিন্তু কাসিম খাঁ ডাকলো তাকে।

"শোনো সিতারা।"

সে ফিরে দাঁড়ালো।

"বাসুদেব মজুমদার কি এর মধ্যে কোনোদিন এখানে কোথাও দেখেছে তোমায়?"

"হ্যাঁ," মাথা নাড়লো সিতারা। সে একটু বিস্মিত হোলো, কি করে জানলো তার পিতা!

"সে কি এদিকে এসেছিলো?" ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করলো মহম্মদ কাসিম খাঁ।

"না। আমিই পথ ভুল করে ওদিকের মহলে চলে গিয়েছিলাম।"

"এভাবে একলা ঘুরে বেড়ানো তোমার পক্ষে উচিত হয়নি। সে তোমায় চিনতে পারলো কি করে?"

"আমার পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। আমি বললাম যে, আমি আপনার কন্যা।"

একটু চুপ করে রইলো কাসিম খাঁ। তারপর বললো, "বাসুদেব মজুমদার তোমায় শাদী করতে চায়।"

"সে কি?" স্তম্ভিত হোলো সিতারা।

"হ্যাঁ। কাল এসে বলেছে আমায়।"

সিতারার মুখ আরক্ত হোলো। বললো, "ওই হিন্দু কিলাদারের স্পর্ধা তো কম নয়—।"

"আমি ওর সঙ্গে তোমার শাদী করিয়ে দিতে রাজী হয়েছি," আস্তে আস্তে বললো কাসিম খাঁ।

সিতারা সবিস্ময়ে কাসিম খাঁর দিকে তাকালো। তারপর বলে উঠলো, "সে কি করে সম্ভব? ও তো হিন্দু—।"

"যেভাবে সম্ভব হতে পারে, তাতেই আমি রাজী হয়েছি।"

"বাসুদেব মজুমদার তা হলে কি—"

"হ্যাঁ, সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে।"

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সিতারা।

"তুমি তো তোমার অভিমত জানালে না—," বললো কাসিম খাঁ।

"আমার আর কি অভিমত," চোখ নত করে সিতারা মৃদুকণ্ঠে বললো, "আপনি যখন সম্মতি দিয়েছেন, তখন আমার তো বলার কিছু নেই—।"

"তবু তোমার মত একবার জেনে নেওয়াটাই রীতি।"

সিতারা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, "ওই লোকটিকে আমার ভালো লাগেনি।"

"কেন?"

"আমায় দেখে তার উচিত ছিলো চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চলে যাওয়া। কিন্তু তা না করে সে আমায় ডেকে পরিচয় চাইলো।"

"তুমি তো পরিচয় দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করো নি—।"

"উনি কিলাদার। আপনার বন্ধু, সহকর্মী। আমি ওঁর অসম্মান করতে চাইনি।"

"দেখ সিতারা, বাসুদেবের আচরণ কিছুটা অশোভন হয়েছে, তোমার আচরণও একটু অশালীন হয়নি তা নয়। বে-আব্রু অবস্থায় মহলে এভাবে ঘুরে বেড়ানো উচিত হয়নি তোমার পক্ষে। বিশেষ করে এই মহলের নানা অংশে যখন নানা রকম লোক থাকে। যাই হোক, এই অবাঞ্ছিত ঘটনার পর বাসুদেব তোমাকে শাদী করতে চেয়ে তার সম্ভ্রম বোধের পরিচয় দিয়েছে। ভুলে যেও না, সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে এজন্যে। আমি তো তার উদারতার প্রশংসা করি। ভুল মানুষ মাত্রেই করে। কে কি ভাবে সে ভুলের সংশোধন করে তাতেই মানুষের অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। তোমারও উচিত এই বিয়েতে সম্মতি দেওয়া।"

সিতারা চুপ করে রইলো।

কাসিম খাঁ বলে গেল, "আরো অনেক কথা আমাদের বিবেচনা করা উচিত। বাসুদেব মজুমদার খুব প্রতিভাবান লোক। খুব কম হিন্দুই এবয়েসে এতটা উন্নতি করেছে। কিন্তু হিন্দু হিসেবে সে তো আর বেশিদূর যেতে পারবে না। তখন একটা ব্যর্থতাবোধ আসবে তার মনে। এ ধরনের লোক পরে অনেক সময় আমাদের প্রবল শত্রু হয়ে ওঠে। ভুজঙ্গ ঠাকুরের কথা মনে করে দেখ। এই ভুজঙ্গ হালদার ছিলো আমাদেরই ফৌজের একজন মনসবদার। এখন ডাকাত হয়ে আমাদের কী বিব্রতই না করছে। তুমি ভেবে দেখ, বাসুদেবের মতো একজন উপযুক্ত লোক যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, আমরাই তাতে উপকৃত হবো। শাহী-রিয়াসতে এ ধরনের লোকেরই প্রয়োজন খুব বেশী। তাছাড়া আমার দৃঢ়

বিশ্বাস, মুসলমান হলে এ লোকটি জীবনে আরো অনেক বেশী উন্নতি করবে। বাদশাহ্‌র ওমরাহ্‌ পর্যন্ত হতে পারে।"

সিতারা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললো, "আপনি যদি বলেন তা হলে আমার কোনো অসম্মতি নেই।"

বাসুদেবের প্রস্তাব শুনে সিতারা সত্যিই খুব বিস্মিত হয়েছিলো, কারণ মহলে অন্য পরিচারিকাদের কাছে সে শুনেছিলো যে বাসুদেব রাজা ইন্দ্রনারায়ণের কন্যা উত্তরাকে ছলে বলে কৌশলে যেভাবেই হোক বিয়ে করতে বদ্ধপরিকর।

তা-ছাড়া, উত্তরার পরিচারিকা ললিতার সঙ্গে যে বাসুদেবের একটি প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক আছে, চিকের আড়াল থেকে কয়েকবার তাও লক্ষ্য করেছে সিতারা।

কিন্তু এসব ব্যাপারে তার নিজের কোনো মতামত নেই। পিতার কথাই সব। তৎকালীন সমাজে এসব যে খুব অস্বাভাবিক ঘটনা তাও নয়। শুধু এ ধরনের ব্যাপারে সিতারার ব্যক্তিগত রুচির অনুমোদন নেই,—এই মাত্র।

এর পর বাসুদেব কয়েকবার সবার অলক্ষ্যে তার সঙ্গে সাক্ষাত করে কথা বলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই অসংযম সিতারার ভালো লাগেনি। সে নারীর স্বাভাবিক সঙ্কোচের ভান করে সরে পরেছে। তার বুঝতে দেরি হয়নি যে তার প্রতি বাসুদেবের এই অনুরাগে কোনো গভীরতা নেই। এ শুধু তার অনিন্দ্য সৌন্দর্যের প্রতি এক কামনা পীড়িত পুরুষের সহজাত আকর্ষণ।

আজ কিন্তু একটা চাঞ্চল্য জেগেছে তার মনে। দুটো ঘটনা ঘটে গেছে, যার জন্যে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক প্রবল উত্তেজনা।

সকালবেলা সে বেড়াতে বেড়াতে উত্তরার মহলের দিকে

গিয়েছিলো। উত্তরা নেই সেখানে। আছে শুধু তার পরিচারিকারা। সুতরাং স্বচ্ছন্দ মনে সেদিকে ঘুরে বেড়াতো সিতারা।

ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালো একটি নির্জন কক্ষে। দেওয়ালের গায়ে পুরোনো কয়েকটি অস্ত্র ও বর্ম টাঙানো। আর আছে অনেকগুলো কুলুঙ্গি। তাতে রাখা আছে বই, পুঁথি পত্র। বোধ হয় এটি ছিলো সেই উত্তরা মেয়েটির কিতাবগাহ্,—ভাবলো সিতারা। সে ঘরের ভিতর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো।

হঠাৎ বাইরে শুনতে পেলো পদধ্বনি। দুজন লোক কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে এদিকে।

এই মহলে আবার পুরুষের সাড়া কেন? অবাক হোলো সিতারা। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাববার সময় ছিলো না। ওরা এদিকেই এগিয়ে আসছে। সিতারা তাড়াতাড়ি একটি মস্তোবড়ো সিন্দুকের আড়ালে আত্মগোপন করলো।

ওরা এসে ঢুকলো এ ঘরেই। একটি কণ্ঠ সিতারার চেনা। সেটি বাসুদেব মজুমদারের কণ্ঠ। অন্য লোকটি কে?

সিতারা সন্তর্পণে একটুখানি উঁকি মেরে দেখলো।

অন্য লোকটি মোগল। মুখে কালো চাপ দাড়ি। তলোয়ার ঝুলছে কোমরে।

ভেতরে এসে বাসুদেব বললো, "কি ব্যাপার সগিরউদ্দিন?"

সগিরউদ্দিন? এবার বুঝতে পারলো সিতারা। এ নিশ্চয়ই সগিরউদ্দিন খাঁ, অম্বিকাপুরের থানাদার। তার পিতা মহম্মদ কাসিম খাঁর একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী এই সগিরউদ্দিন খাঁ। সেও যে সম্প্রতি গড় নাসিমপুরেই আছে, একথা জানতো সিতারা।

বাসুদেব বলছিলো, "কি এমন গোপনীয় কথা যে আমাকে এখানে ডেকে নিয়ে আসতে হোলো?"

"শুধু গোপনীয় নয়, গুরুতর এবং জরুরী।"

"কি ব্যাপার শুনি।"

"একটি কথা তোমায় জিজ্ঞেস করার ছিলো বাসুদেব
জুমদার।"

"কি কথা?"

"শুনছি, তুমি নাকি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছো?"

"হ্যাঁ।"

"খুব ভালো কথা। আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি একথা শুনে।
ছিলে আমাদের বন্ধু, এখন হবে আমাদেরই ভাই।"

"শুধু একথা জিজ্ঞেস করবার জন্যেই এত গোপনে এত সতর্কতা
অবলম্বন করে আমাকে এখানে ডেকে নিয়ে এলে?" হাসলো
বাসুদেব।

"না আরো কথা আছে। একথাও শুনলাম তুমি নাকি মহম্মদ
কাসিম খাঁর কন্যা সিতারাবানুকে শাদী করছো?"

নিজের নাম শুনে সিতারা উদ্‌গ্রীব হোলো। তার খুব কৌতূহল
হোলো এই আলোচনার কারণ জানতে। সে আড়াল থেকে
নিঃশব্দে শুনতে লাগলো এদের কথা।

"হ্যাঁ, ওকেই আমি বিয়ে করছি," বাসুদেব উত্তর দিলো।

"খুবই আনন্দের কথা। তা হলে তো তোমার সঙ্গে আমার
একটা আত্মীয়তাও হয়ে গেল। তুমি বোধ হয় জানো না, মহম্মদ
কাসিম খাঁ আমার দূর সম্পর্কের মাতুল।"

"তাই নাকি?" নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো বাসুদেব। তারপর
জিজ্ঞেস করলো, "ব্যস? এই কটা কথা জানবার জন্যে আমাকে
এখানে টেনে নিয়ে এলে?"

সগিরউদ্দিন হাসলো। বললো, "না, আসল কথাটা এখনো
বলা হয়নি।"

"তাহলে এতো ভনিতা করছো কেন? বলেই ফেল। শুনি
তোমার আসল কথাটা।"

সগিরউদ্দিন একটু চুপ করে রইলো। তারপর ঈষৎ গম্ভীর

কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "মিঞা, তাহলে তুমি তো আর রাজা ইন্দ্রনারায়ণের কন্যাকে শাদী করছো না ?"

"না। ওকে বিয়ে করে আমার আর কী লাভ ?" উত্তর দিলো বাসুদেব, "আমি যাকে প্যার করি, তাকেই বিয়ে করবো।"

যাকে প্যার করি! বিরক্তিতে ভরে উঠলো সিতারার সারা মন

সগিরউদ্দিন বললো, "বেশ। তাহলে ওই হিন্দু মেয়েটিকে আমি শাদী করবো।"

"কী ?" শোনা গেল বাসুদেবের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ, "না, না, সে কি করে হয় ?"

"হয় না ?" একটু চুপ করে রইলো সগিরউদ্দিন। তারপর শোনা গেল সে বলছে, "মিঞা, অলাওয়ার্দি খাঁর কোতল হওয়ার ব্যাপারটা বোধ হয় তুমি ভুলে গেছ ?"

কথা বলে গেল সগিরউদ্দিন। সিতারা স্তম্ভিত হয়ে শুনে গেল বাসুদেবের নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা ও নীচতার কাহিনী। ভাবলো, —এরকম একটি হৃদয়হীন নীতিজ্ঞানহীন লোকের সঙ্গে শাদী দিতে চাইছেন আমার পিতা ?

স্তব্ধ হয়ে সিতারা শুনলো সগিরউদ্দিনের পরিকল্পনা।

কিছুক্ষণ পরে কথা শেষ হতে ওরা বেরিয়ে চলে গেল। ওদের ভারী পদশব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর সিতারাও বেরিয়ে এলো সিন্দুকের আড়াল থেকে।

তা হলে উত্তরাকে আজ আবার নিয়ে আসা হচ্ছে গড় নাসিমপুরে!

এই তাহলে বাসুদেবের মনের আসল চেহারা!

সাগিরউদ্দিন খাঁর মতো সাহসী যোদ্ধার মনে আসতে পারে এরকম অন্যায় পরিকল্পনা? একটি অভাগা নিঃসহায় মেয়েকে এভাবে জোর করে ধরে এনে বিয়ে করবে সে?

তোলপাড় হতে লাগলো তার মনের মধ্যে। বাসুদেব চুপ করে
্রইলো সগিরউদ্দিনের কথা শুনে? কোনো আত্মমর্যাদাস পন্ন
এভাবে সমর্থন করতে পারে সম্ভ্রান্ত নারীর উপর এরকম
? বাসুদেব উত্তরাকে বিয়ে করছে না বলে সগিরউদ্দিন
াকে ধরে এনে বিয়ে করবে, আর বাসুদেব প্রশ্রয় দেবে সেই
ন্যায়ের, যেহেতু সগিরউদ্দিন তার এমন কতকগুলো
িশ্বাসঘাতকতার কথা জানে, যেসব মিরজুমলার কানে গেলে
াসুদেবের ক্ষতি হবে?

মানুষ এত নিচে নামতে পারে!

সিতারাবানু তক্ষুনি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হোলো। সে আর
াকেই বিয়ে করুক, এরকম একটি ভয়ানক প্রকৃতির লোককে
ক্ষনো নয়। মাকে খুলে বলবে সব কথা, যদি প্রয়োজন হয়
গড়া করবে পিতার সঙ্গে, কিন্তু এই শাদীতে রাজী হবে না
িছুতেই। যে অন্য নারীর সম্মান রাখতে জানে না, সে নিজের
াকেও কোনোদিন সম্মান ও মর্যাদা দিতে পারবে না।

কিন্তু এখানেই তার ভাবনা থামলো না। থেকে থেকে মনে
ড়লো এক অসহায় নারীর কথা, যাকে আজ সন্ধ্যার মধ্যে অপহরণ
রে নিয়ে আসা হবে গড় নাসিমপুরে। সিতারা একবার ভাবলো,
-থাক আমার কী আসে যায়। আমি কেন অতো ভাবনা করবো
ক অপরিচিতা হিন্দু নারীর জন্যে। সে আমার কে হয়?

কিন্তু এসব ভেবেও সে ঝেড়ে ফেলতে পারলোনা তার দুর্ভাবনার
ঘ। নারীর জন্যে নারীর যে বিশ্বজনীন সহানুভূতি দেশ-জাতি-
কে অতিক্রম করে সঞ্চারিত হয় মনের মধ্যে, সেই সহানুভূতি
ালোড়ন তুললো তার মনের ভিতর।

সে স্থির করলো, যে করেই হোক বাঁচাতে হবে এই বিপন্না
রীকে। কিন্তু তার উপায় করবে কি করে? সে ভেবে পেলো
কিছুতেই।

মহম্মদ কাসিম খাঁকে বলে কিছু হবে না। এসব সাম
ব্যাপারে তিনি মাথা ঘামাবেন না। মাকে বললে, মা ভৎর্সনা ক
তাকে আটকে রাখবে ঘরের ভিতর।

কি করা যায় তাহলে?

সিতারাবানু চঞ্চল হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো এদি
থেকে সেদিকে। কিছুই স্থির করতে পারলো না। উত্তরাকে এদে
কবল থেকে মুক্ত করতে পারলে কোথায় লুকিয়ে রাখবে, এপর্যন্ত
ভেবে রেখেছে। এই কদিনের মধ্যে মহলের সব কিছু তার জা
হয়ে গেছে। চোরা কামরা আছে তিনচারটা, গড়ের বাই
যাওয়ার গুপ্ত পথ আছে তুটো,—সিতারা সব সন্ধান করে ফেলেছে

কিন্তু এ তো পরের কথা। সগিরউদ্দিনের হাত থেকে উত্তরা
বাঁচানো যায় কী উপায়ে?

এই শেষ নয়। গোপনে অন্যের কথোপকথন শুনে ফে
সেদিন আরো ছিলো সিতারার ভাগ্যে। আরেকটি ঘটনা ঘট
দ্বিপ্রহরের পর।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে সে নামছিলো ছাদ থেকে,—হঠাৎ নি
বারান্দার পাশে চাপা গলার কথাবার্তা শুনতে পেলো।

এবারে চেনা গলা,—ললিতা আর বাসুদেব কথা বল
গোপনে। বাসুদেব আজ সারাদিন এই মহলে কেন?—বির
হয়ে ভাবলো সিতারা, স্থির করলো সোজা নিজের মহলে ফি
যাবে, আজ আর এই মহলে আসবে না। নিশ্চয়ই গোপ
প্রণয়ালাপ করছে এরা তুজনে। এসব কথা শুনবার অভিলাষ ত
ছিলো না। সে ঘুরে চলে যাচ্ছিলো।

হঠাৎ একটি নাম শুনে সে থমকে দাঁড়ালো। আরে, এ
অত্যন্ত চেনা নাম। ভুজঙ্গ ঠাকুর নামে সেই তুর্ধর্ষ ডাকাতের পালি
পুত্র রাজাবাবু।

কি হয়েছে রাজাবাবুর? তার সম্বন্ধে কি আলোচনা করছে এরা দুজন? সিতারা একটি থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো, ওদের কথা শুনলো কান পেতে।

"রাজাবাবুর সঙ্গে তাহলে দেখা হয়েছে?" জিজ্ঞেস করছিলো বাসুদেব।

"হ্যাঁ," উত্তর দিলো ললিতা।

"ও বিশ্বাস করেছে তোমার কথা?"

"অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। আমাকে সব সময় দেখেছে উত্তরা দিদির সঙ্গে।"

"সে তাহলে আসছে তো?"

"হ্যাঁ, আসছে।"

"ঠিক আছে," বাসুদেব বললো, কিছুক্ষণ পরে, "চারজন লোক যথেষ্ট। না, না, বলা যায় না, রাজাবাবু তলোয়ার ঘোরায় খুব ভালো। বরং ছ-জন লোক রাখবো সেই ঘরে। হ্যাঁ, ছ-জনই যথেষ্ট হবে।"

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে বাসুদেবের পরিকল্পনা শুনলো সিতারাবায়ু। ছ-জন লোক লুকিয়ে থাকবে ঘরের ভিতর। ললিতা জানালায় দাঁড়িয়ে আলো নেড়ে সংকেত পাঠাবে। রাজাবাবু সাঁতরে খাল পার হয়ে দেওয়াল বেয়ে উঠে আসবে। ও জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে ললিতা ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে সরে যাবে একপাশে। তারপর ওই ছ-জন সশস্ত্র লোক ঝাঁপিয়ে পড়বে রাজাবাবুর উপর।

"বেশিক্ষণ লাগবে না." এক ক্রুর আনন্দের সঙ্গে বললো বাসুদেব, "দু-তিন মুহূর্তের কাজ।"

আরো একটি হীন ষড়যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে?—সিতারার মুখ শুকিয়ে গেল। আর এই পরিকল্পনার নায়ক বাসুদেব? ছল করে একটি লোককে গড়ের ভিতর এনে তাকে হত্যা করা হবে।

ললিতা ভয় পেয়েছিলো বাসুদেবের কথা শুনে। বাসুদেব হাসতে হাসতে তাকে বলছিলো, "তোমরা কেউ জানো না এই রাজাবাবুর আসল পরিচয়। দেবীকান্ত রায়ের নাম শুনেছো?"

"কোন দেবীকান্ত? যাঁকে রাজামশায় সুবর্ণগ্রাম থেকে এনে এখানে রেখেছিলেন?" ললিতা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ। আমাদের এই রাজাবাবু হোলো সেই দেবীকান্ত রায়। ছেলেবেলায় পালিয়ে গিয়েছিলো গড় নাসিমপুর থেকে।"

ওদের কথাবার্তা থেকে অনেক কথা জানতে পারলো সিতারাবানু। তাহলে এই রাজাবাবুই দেবীকান্ত রায়, যার পিতা রায় রায়ান উমাকান্ত রায়ের কথা সিতারা শুনেছিলো তার পিতা মহম্মদ কাসিম খাঁর কাছে।

উত্তরার সঙ্গে এই রাজাবাবুরই ভালোবাসা?

আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে গেল সিতারাবানু।

মনে মনে সিতারা খুব খুশী হোলো। কেউ তো জানেনা, এই রাজাবাবুর কাছে তার নিজের কৃতজ্ঞ হওয়ার একটা কারণ আছে। সে একদিনের জন্যেও ভোলেনি রাজাবাবুকে।

কিন্তু রাজাবাবুর কি মনে আছে তার কথা? সে কি জানে গড় নাসিমপুরে আছে সিতারাবানুও?

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো সিতারা। হঠাৎ মাথায় এসে গেছে, কি করে বাঁচানো যাবে উত্তরাকে, কি করে শোধ করা যাবে রাজাবাবুর প্রতি তার ঋণ।

খোদা মেহেরবান,—সিতারা ভাবলো,—তিনি কোনো অন্যায় হতে দেন না। তা নইলে এই তুটো গোপন ষড়যন্ত্রের কথা সিতারাবানু জানতে পারার কি কারণ থাকতে পারে?

সে নিঃসহায় অবলা নারী, কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস হোলো, সে যা ভাবছে, ঠিক হাসিল করতে পারবে।

এখনো সময় হয়নি।

নিজের মনে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগলো সিতারাবানু। মুহূর্তগুলো কেটে যাচ্ছে একটা আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার মধ্যে।

সিতারার মনে পড়লো তিন বছর আগেকার একটি দিনের কথা।

মহম্মদ কাসিম খাঁ তখন রাজমহলের শহর-কোতোয়াল।

কাসিম খাঁর স্ত্রী আর কন্যা সিতারাবানু সেদিন নৌকোয় করে সাহেবগঞ্জ থেকে রাজমহল আসছে। সঙ্গে পাহারাদার আছে চারজন বরকন্দাজ।

এ সময় সে অঞ্চলে নদীপথে জলদস্যুর খুব ভয়। যথেষ্ট পাহারা ছাড়া কেউ দিনের বেলাই জলপথে ভ্রমণ করতে সাহসী হয়না। রাতের বেলা তো নদীতে নৌকো চলাচল একরকম বন্ধই।

কিন্তু রাজমহল পৌঁছানোর বেশ কিছুক্ষণ আগেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। অন্ধকার ছেয়ে গেল চারিদিকে। ধারে কাছে আর অন্য কোনো ছিপ নৌকো বা বজরা দেখা যায় না।

বরকন্দাজেরা গালাগাল দিতে লাগলো মাঝিদের। মাঝিরা প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগলো।

সিতারার পরিষ্কার মনে আছে সেই সন্ধ্যার কথা। আকাশের মাঝখানে আধখানা চাঁদ, আর অসংখ্য তারা সারা আকাশ জুড়ে। চাঁদের আলো অতি ম্লান, অন্ধকার ভেদ করে বেশিদূর দেখা যায় না। একটু একটু কুয়াশা হয়েছে চারদিকে। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে উত্তর দিক থেকে। গঙ্গায় ভরা জোয়ার।

চারদিকে বিপুল স্তব্ধতা। সিতারা আর ওর মায়ের মনে একটা অজানা আশঙ্কা। ভালোয় ভালোয় কোনোরকমে রাজমহলে পৌঁছাতে পারলে হয়।

কিন্তু যা ভয় করছিলো তাই হোলো।

অন্ধকারের ভিতর থেকে হঠাৎ একটি ছিপ এসে তাদের নৌকোর পাশে ভিড়লো। আর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে মুখে রং-চং মাখা আট দশজন ভীষণ দর্শন ডাকাত লাফিয়ে পড়লো তাদের নৌকোয়।

বরকন্দাজ চারজন বন্দুক তুলে নিশানা করলো তাদের দিকে। দু-একটি গুলি ছুঁড়লোও একজন। সেই আওয়াজ প্রতিধ্বনি ছড়ালো নদীর বুকে।

কিন্তু ওরা ডাকাতদের ঠেকাতে পারলো না। তাদের নিশানা ব্যর্থ হোলো। সড়কি চালিয়ে তাদের চারজনকেই নিহত করলো ডাকাতেরা।

ভিতরে জড়োসরো হয়ে বসেছিলো সিতারা আর ওর মা। ওরা তাদের কাছে এসে বললো গা থেকে গয়নাগুলো একটি একটি করে খুলে দিতে।

সে সময় হঠাৎ দেখা গেল অন্যদিক থেকে ভেসে আসছে একটি বজরা, তার পেছন পেছন কয়েকটি ছিপ।

বজরা দেখে সিতারাবানু চিৎকার করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক তাকে থামাতে ছুরি তুললো তাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু সেই মুহূর্তে শোনা গেল বন্দুকের আওয়াজ।

ডাকাতেরা সচকিত হয়ে উঠলো।

চোখের পলকে নৌকোর অন্য পাশে এসে ভিড়লো আরো দুটো ছিপ।

সেখান থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো,—ওখানে কারা ?

একটা সংকেতও ছিলো এই প্রশ্নের সঙ্গে। ডাকাত দলগুলোর মধ্যে নিজেদের পরিচিতি পরস্পরকে জানানোর সংকেত।

নৌকোতে যে ডাকাতেরা ছিলো, ওরা আশ্বস্ত হয়ে প্রতি-

সংকেত করে উত্তর দিলো,—আমরা জনার্দন ঝা-র দলের লোক। এটা আমাদের এলাকা।

মেয়েমানুষের চিৎকার শোনা যাচ্ছে কেন?—প্রশ্ন এলো অন্য ছিপ থেকে।

এদের দলপতি ক্রুদ্ধ হোলো। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো,—তোমরা সে কৈফিয়ত চাইবার কে?

রাজাবাবু জানতে চাইছেন।—উত্তর এলো অন্য ছিপ থেকে।

রাজাবাবু। একটা মৃদু গুঞ্জন উঠলো। একটা পরিবর্তন দেখা গেল এদের হাবভাবে।

একটি মশাল জ্বলে উঠলো। মশালের আলোয় দেখা গেল দুজন লোকের সঙ্গে এক সুকান্ত তরুণ অন্য ছিপ থেকে নৌকায় উঠে এসেছে।

এই ডাকাতেরা সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিলো।

সিতারাবানু তখনো রাজাবাবুর নাম শোনেনি। অবাক হয়ে ভাবছিলো,—এ কোথাকার রাজা, যার নাম শুনলে জনার্দন ঝা-র দলের দুর্ধর্ষ ডাকাতেরাও সমীহ করে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়! মুঙ্গের অঞ্চলের বিখ্যাত দস্যু জনার্দন ঝা। রাজমহল থেকে পাটনা পর্যন্ত তার অপ্রতিহত দাপট। তাকেও ধমকাতে পারে এ লোকটি কে?

রাজাবাবু নামে সেই লোকটি পর্যবেক্ষণ করলো নৌকোর পরিস্থিতি। দেখলো, ভেতরে জড়াজড়ি করে বসে আছে দুজন ভয়ার্ত নারী। মাঝিরা ছাড়া একজন পুরুষও নেই সেই নৌকায়। পাটাতনের উপর পড়ে আছে দুজন বরকন্দাজের রক্তাক্ত দেহ। আর দুজন জলে পড়ে গেছে।

তাকিয়ে দেখলো রাজাবাবু। তারপর বললো, "এরা তো মেয়েমানুষ। না, এদের উপর কোনো হামলা করা চলবে না,—এলাকা তোমাদেরই হোক, কি যারই হোক। তোমরা নেমে যাও।"

কেউ কোনো প্রতিবাদ করলো না, একটি টুঁ শব্দও করলো না। যেমনি এসেছিলো, তেমনি চলে গেল। নদীর অন্ধকারে অদৃশ্য হোলো তাদের ছিপ।

রাজাবাবু এসে দাঁড়ালো সিতারাবান্থ ও তার মায়ের কাছে।

ওরা মুখের উপর নকাব্ টেনে দিলো।

"আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?" সে জিজ্ঞেস করলো।

সিতারার মায়ের মুখ দিয়ে তখনো ভয়ে কথা সরছে না। সিতারাই উত্তর দিলো, "আমরা যাচ্ছি রাজমহল।"

"রাত্তিরে তো এপথ দিয়ে নৌকায় যাওয়া নিরাপদ নয়।"

"জানি। কিন্তু মাঝিরা কিছুতেই সন্ধ্যে হওয়ার আগে পৌঁছে দিতে পারেনি।"

"হ্যাঁ, দোষ মাঝিদের। আজ আমি এসে না পড়লে আপনাদের সত্যিই বিপদ হোতো।"

"আপনি সঙ্গে করে পৌঁছে দেবেন ?" জিজ্ঞেস করলো সিতারা।

"আমি ?" সে লোকটি হাসলো, বললো, "না, সে হয় না। আমার পক্ষে আপনাদের সঙ্গে রাজমহলে যাওয়া অসম্ভব। তবে আপনারা নির্ভয়ে চলে যান। পথে আর কেউ কোনো হামলা করবে না। আমি সে আশ্বাস আপনাদের দিতে পারি।"

"আমার পিতা আপনার সাক্ষাত পেলে খুব খুশী হবেন," বললো সিতারা, "আপনি আমাদের জান আর ইজ্জত বাঁচিয়েছেন।"

"উনি রাজমহলেই থাকেন ?"

"হ্যাঁ।"

"ওঁর নাম কি ?" রাজাবাবু জিজ্ঞেস করলো।

"মহম্মদ কাসিম খাঁ।"

"কাসিম খাঁ ? রাজমহলের কোতোয়াল ?"

"হ্যাঁ"

রাজাবাবু হঠাৎ খুব জোরে হেসে উঠলো। বললো, "হ্যাঁ দিদি, ঠিক বলেছেন। আপনার পিতা আমার সাক্ষাত পেলে খুব খুশী হবেন।"

"উনি চেনেন আপনাকে ?"

"প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। আমরা নামে পরস্পরকে চিনি।—আচ্ছা, তাহলে আপনারা মহম্মদ কাসিম খাঁর পরিবারের লোক ? ওঁকে গিয়ে আমার কথা বলবেন। উনি শুনে হয়তো খুশী হবেন। উনি তো আমার সাক্ষাত পাওয়ার জন্যে খুব ব্যগ্র। কিন্তু আমি সামান্য লোক, ওঁর ধারে কাছে যেতে সাহস হয় না।"

"আপনি কে ?" জিজ্ঞেস করলো সিতারাবানু।

সে তার নিজের ছিপে গিয়ে উঠেছিলো। ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, "আমি ? আমার নাম—লোকে আমাকে রাজাবাবু বলে জানে। আমি আপনার ভাই।"

সিতারাবানুর খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো তাকে ধরে রাখতে, কিন্তু মুখ ফুটে আর কিছু বললো না।

সে চলে গেল।

খুব উৎকণ্ঠ হয়ে তাদের প্রতীক্ষা করছে কোতোয়াল মহম্মদ কাসিম খাঁ। এসে পৌঁছাতে দেরি হচ্ছিলো দেখে চেষ্টা করলো তাদের সন্ধানে ছিপ পাঠানোর জন্যে। কিন্তু দলে ভারী না হয়ে যেতে সাহস করেনা কোতোয়ালির পিয়াদারা। তাদের এত ডাকাতের ভয়। কিন্তু সহরের কোতোয়ালের স্ত্রী ও কন্যাকে খুঁজে আনবার জন্যে সমস্ত নওয়ারাকে সাজিয়ে পাঠানো সম্ভব নয়।

এরা নিরাপদে ফিরে আসতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

"ডাকাতের হাতে পড়েছিলাম," সিতারা বললো কাসিম খাঁকে।

"সে কি ? ওদের হাত থেকে বাঁচলে কি করে ?"

"কয়েকজন এসে আমাদের উদ্ধার করলেন তাদের হাত থেকে। ওঁর নাম শুনেই ডাকাতেরা মাথা নিচু করে চলে গেল।"

এ কথা শুনে বিস্মিত হোলো কাসিম খাঁ। জিজ্ঞেস করলো, "কে সে? কি তার নাম?"

"তিনি বললেন, লোকে তাঁকে নাকি রাজাবাবু বলে জানে।"

"রাজাবাবু!" স্তম্ভিত হোলো মহম্মদ কাসিম খাঁ।

পিতার কাছে সিতারা পরে শুনেছিলো, এই রাজাবাবু একটা বিশাল সুসংগঠিত দস্যুদলের অধিনায়ক। ভুজঙ্গ ঠাকুরের দলের আসল পরিচালক সে।

তারপর আরো কতোদিন কতোজনের কাছে নানারকম ভয়াবহ ও দুঃসাহসের গল্প শুনেছে ওই রাজাবাবুর সম্পর্কে। অভিজাত ও রাজপুরুষ মহলে রাজাবাবুর একটুও জনপ্রিয়তা ছিলো না।

কিন্তু সিতারাবানু চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে তার একটি রাতের দেখা ভাইকে।

আজ হয়তো তার সঙ্গে দেখা হবে,—সিতারা ভাবলো। সময় হয়ে আসছে।

নিজের মহল থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো সিতারাবানু। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিক সরিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলো।

অন্ধকারে আকাশ ছেয়ে আছে। চাঁদ অস্ত গেছে কিছুক্ষণ আগে। আকাশে শুধু অসংখ্য তারার ঝিকিমিকি আলো। চারদিক নিস্তব্ধ। বাগান থেকে ভেসে আসছে ঝিঁ ঝিঁ পোকার অবিশ্রাম আওয়াজ। শেয়াল ডেকে উঠলো অনেক দূরে দূরে।

রাত্রি প্রথম প্রহর হয়ে এলো।

এবার তার পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হবে।

মহলের যে অংশটি খালের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, সিতারাবানু আস্তে আস্তে সেদিকে চললো অন্ধকার বারান্দা ধরে।

ঃ আট ঃ

শিবশঙ্কর মজুমদার ঃ

দেওয়ান শিবশঙ্কর থাকে সামনের দিকের মহলে।

সেদিনের সেই সন্ধ্যেবেলা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে আছে শিবশঙ্করও। এরকম অস্থির সে জীবনে আর কোনোদিন হয়নি। কখনো দ্রুত পায়চারি করছে, কখনো উপবেশন করছে। বসে থাকতে পারছেনা বেশিক্ষণ, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে জানালার দিকে।

কিছুই ভালো লাগছে না।

তার সারাজীবনের স্বপ্ন, সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে ওই বাসুদেব, তার ওই কুলাঙ্গার ছেলে।

সে ধর্মত্যাগ করতে বসেছে এক যবন কন্যার রূপের মোহে? বাসুদেব তাঁর একমাত্র ছেলে,—সে এই কাজ করলো? শিবশঙ্করের তিন কুলে আর কেউ নেই, ওই একমাত্র বাসুদেব। কতো আশা, কতো স্বপ্ন গড়ে তুলেছিলো তাকে ঘিরে। সে তার পিতার কথা একবারও ভাবলো না? একবারও তার মনে হোলো না, এর পর আর কি নিয়ে বাঁচবে শিবশঙ্কর?

আজ মনে অনুশোচনা এলো, অনুতাপ এলো। শিবশঙ্কর

জীবনে অনেক অন্যায় করেছে, অনেক অবিচার করেছে,—রায়তদের উপর, আমলা-কর্মচারীদের উপর, দেবীকান্তর পিতার উপর, ইন্দ্রনারায়ণের উপর।

সব অন্যায়ের শাস্তি কি এভাবেই দিলেন ভগবান? শাস্তি দিলেন নিজের ছেলে বাসুদেবের হাত দিয়ে,—সেই বাসুদেবের জন্যেই শিবশঙ্কর করেছে জীবনের যা কিছু অন্যায়?

জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো শিবশঙ্কর মজুমদার, মনে হোলো যেন ওই অন্ধকার ঘিরে আসছে তার নিজের জীবনে, ঠিক অমনি ভয়াবহ স্তব্ধতা নামছে চিরদিনের মতো।

তিন চারদিন আগেও শিবশঙ্কর মজুমদার ভাবতে পারেনি যে, তার সমস্ত পরিকল্পনা সফল হওয়ার সম্ভাবনার মুখে, এভাবে সব ওলট পালট হয়ে যাবে। নিজের জন্যে সে কিছুই চায়নি, শুধু চেয়েছিলো তার ছেলে বাসুদেব হোক রায় রায়ান উমাকান্ত রায় রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ বাংলার অভিজাত জমিদারদের সমকক্ষ। সামাজিক মর্যাদার তুঙ্গশিখরে উপনীত হোক মজুমদার বংশ। এখন থেকে চিরকাল ধরে মজুমদার বংশের সামাজিক সম্পর্ক হোক দেশের মুখ্য পরিবারগুলোর সঙ্গে, শিবশঙ্কর মজুমদারের কোনো বংশধরকে যেন অন্য কারো কাছে খাটো হয়ে থাকতে না হয়। তার নিজের কোনো ধন সম্পদ ঐশ্বর্য কিছুরই দরকার নেই, সে শুধু ভাবীকালের সমাজপতিদের স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকুক মজুমদার বংশের আদিপুরুষ হিসেবে।

কয়েকদিন আগেও তার মন ছিলো সাফল্যের আনন্দে পরিপূর্ণ। রাজা ইন্দ্রনারায়ণের প্রতিপত্তি শেষ হয়ে গেছে। গড় নাসিমপুরের কিলাদার হয়েছে বাসুদেব। মিরজুমলাও অন্যান্য মোগল মনসবদারেরা খুব খাতির করে তাকে। শুজার তো হার হয়েছে। এবার মিরজুমলা হবে সুবাদার। শোনা যাচ্ছে, যুদ্ধ থেমে যাওয়ার

পর রাজা খেতাব দেওয়া হবে বাসুদেবকে, নাসিমপুর-সুবর্ণগ্রাম পরগণা জায়গির হিসেবে তাকে দেওয়া হবে। বাসুদেবকে কন্যাদান না করে রাজা ইন্দ্রনারায়ণের কোনো উপায় নেই। এখন আর উপযাচক হয়ে শিবশঙ্করকে বিয়ের সম্বন্ধের প্রস্তাব তুলতে হবে না ইন্দ্রনারায়ণের কাছে।

মনে মনে কল্পনার জাল বুনছিলো শিবশঙ্কর। পুত্র ও পুত্রবধূকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে সুরেশ্বরীকে নিয়ে সে চলে যাবে কাশী। শেষ জীবন কাটিয়ে দেবে সেখানে।

এমন সময় বাসুদেব এসে জানালো যে, সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে, বিয়ে করছে মালদহের ফৌজদার মহম্মদ কাসিম খাঁর কন্যা সিতারাকে।

প্রথমে নিজের কান দুটোকেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করলো না শিবশঙ্করের। নিশ্চয়ই একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। একথা হাস্যকর মনে হবে ঘুম ভাঙবার পর।—কিন্তু আস্তে আস্তে উপলব্ধি করলো যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বাসুদেব, সে কারো কথা শুনবে না।

শিবশঙ্কর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আমার কি হবে বাসুদেব? সমাজ তোমায় তো কিছু বলতে পারবে না, শাস্তি দেবে আমার মতো এক নিঃসহায় বৃদ্ধকে।"

"আপনি পিসীমাকে নিয়ে কাশী চলে যান," বাসুদেব নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দিলো "আপনার সারাজীবন যাতে স্বচ্ছল ভাবে কেটে যায় সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো।"

"থাক, আমার জন্যে তোমায় কোনো ব্যবস্থা করতে হবে না," ভগ্নকণ্ঠে বললো শিবশঙ্কর, "তোমার অনুগ্রহের দান নিয়ে জীবন-ধারণ করার প্রবৃত্তি আমার নেই। আমার দুবেলা অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা আমি নিজেই করতে পারবো।"

"তা হলে তো ভালোই," হৃদয়হীন উত্তর দিলো বাসুদেব।

"কিন্তু উত্তরার কি হবে?" শিবশঙ্কর জিজ্ঞেস করলো।

"সেকথা উত্তরা জানে আর ওর বাবা জানে। ওর জন্যে আমাদের মাথাব্যথা হওয়ার কোনো কারণ নেই।"

"কিন্তু আমি তো তাকে আমাদের কুলবধূরূপে মনোনীত করেছি।"

বাসুদেব হাসলো, "আমি আমার স্ত্রীরূপে নির্বাচিত করেছি সিতারাবানুকে। রূপে গুণে উত্তরা সিতারার ধারে কাছেও লাগে না।"

"কিন্তু উত্তরার জন্যে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে তো। আজ তাকে যে কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে তার জন্যে আসলে তো দায়ী আমরাই। আমরা যদি তার একটা ব্যবস্থা না করে দিই, সে যাবে কোথায়?"

বাসুদেব একটু চুপ করে রইলো। তার একঘেয়ে লাগছে এই আলোচনা। হাই তুলে আস্তে আস্তে বললো, "বেশ, সিতারার সতীন হয়ে আমার ঘর করতে পারে সে। এও বা মন্দ কি?"

"বাসুদেব!" গর্জে উঠলো শিবশঙ্কর।

"আমার তো চারজন স্ত্রী থাকতে কোনো বাধা নেই," বাসুদেব উত্তর দিলো, "তা-ছাড়া একটি বড়ো-সড়ো হারেম না থাকলে তো আমার মান থাকবে না। এখানকার সমাজে তাই তো রেওয়াজ।"

শিবশঙ্কর কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো বাসুদেব।

ওর কথা শুনে শিবশঙ্কর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো। অনেক ভেবে স্থির করেছিলো,—না, এ কিছুতেই হতে দেবে না সে। সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের একটি মেয়ের এই পরিণতি শিবশঙ্কর হতে দেবে না কিছুতেই। বাসুদেব যদি ধর্মত্যাগ করে তাহলে উত্তরাকে

কিছুতেই তার ঘরনী হতে দেবে না, হোক না বাসুদেব তার নিজেরই ছেলে।

সেদিন রাত্তিরেই শিবশঙ্কর উত্তরাকে গোপনে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো গড় নাসিমপুর থেকে। ভেবেছিলো সুরেশ্বরীর কাছে নিরাপদেই থাকবে উত্তরা,—অন্তত কিছুদিনের মতো। বাসুদেব তার সন্ধান পাবে না।

কিন্তু আজ অপরাহ্নে শিবশঙ্করের কাছে খবর এসে গেছে যে, উত্তরাকে অপহরণ করা হয়েছে সুরেশ্বরীর হেপাজত থেকে। কারা অপহরণ করেছে সেকথা বলতে পারলো না সুরেশ্বরীর গাঁয়ের লোক।

শিবশঙ্কর ভাবলো,—এ নিশ্চয়ই বাসুদেবের কাজ। তা নইলে, আর কার কী স্বার্থ থাকতে পারে উত্তরার সম্বন্ধে। আর বাসুদেবের লোকই যদি তাকে অপহরণ করে থাকে, তাহলে তাকে সম্ভবত নিয়ে আসা হবে এখানে এই গড় নাসিমপুরেই।

বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। আকাশে ঝিকমিক করছে অসংখ্য তারা। গঙ্গায় ভাঁটার টান এসেছে, এখান থেকে শোনা যাচ্ছে খালের জলের প্রবাহ। শেয়ালের ডাক ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে।

শিবশঙ্কর স্তব্ধ হয়ে বসে বসে ভাবছিলো।—

কি করার আছে এখন? উত্তরাকে কি বাঁচানো যাবে না?

নিয়তির হাতে একান্ত অসহায় মনে হোলো নিজেকে। সে

এখন একেবারে একা। গড় নাসিমপুরে নিজেদের অনুগত যারা ছিলো সবাইকে নিরস্ত্র করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে জঙ্গীপুরে। এখানে আছে শুধু বাসুদেবের লোক, মহম্মদ কাসিম খাঁর লোক। একলা ওদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারা যাবে না।

নিজের নিঃসহায় অবস্থার উপলব্ধি উন্মাদ করে তুললো শিবশঙ্কর মজুমদারকে। সারা জীবন ধরে প্রভাব ও প্রতিপত্তি সৃষ্টি করবার এত চেষ্টার পর আজ সে এতখানি নিঃসহায়! ভাগ্যের এ কী আশ্চর্য পরিহাস,—গত কয়েক বছর ধরে তার এত পরিকল্পনা ইন্দ্রনারায়ণের কন্যাকে বাসুদেবের পরিণীতা বধূ রূপে মজুমদার পরিবারে আনবার জন্যে, আর আজ সেই বাসুদেবের হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে শিবশঙ্করের এত দুর্ভাবনা!

কিছু একটা করতেই হবে,—পাগলের মতো পায়চারি করতে করতে শিবশঙ্কর ভাবলো। সব শেষ হয়ে যাক, সব ধ্বংস হয়ে যাক, সব নষ্ট হয়ে যাক, সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাক,—কোনো কিছুর জন্যে, কারো জন্যে, আর কোনো মায়া মমতা তার মনে নেই।

এখন শুধু একটা মাত্র চিন্তা। পুরোনো অন্যায়ের কোনো প্রতিকার করার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু নতুন অন্যায় রোধ করতে হবে যে কোনো উপায়েই হোক।

—কিন্তু কী তার উপায়!

হঠাৎ বিদ্যুৎস্ফূরণের মতো মাথায় একটা মতলব খেলে গেল।

তোপখানায় সঞ্চিত আছে রাশি রাশি বারুদ, গুলি গোলা। সে সব আর শাহ শুজার কাজে লাগবে না। মিরজুমলার মির আতশ এসে তোপখানার দখল নেবে কয়েক দিনের মধ্যেই।

তোপখানার প্রবেশপথে মোতায়েন আছে কড়া পাহারা। কিন্তু প্রহরীদের অলক্ষ্যে সেখানে প্রবেশ করার আরেকটি গুপ্তপথ আছে। এরা কেউ জানেনা,—জানে শিবশঙ্কর।

উত্তরাকে বাসুদেবের হাত থেকে বাঁচানোর যখন আর কোনো উপায় নেই, তখন তোপখানায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে গড় নাসিমপুর। আর কোনো সহায়ের দরকার নেই, কোনো অস্ত্রের দরকার নেই। দরকার শুধু একটি মশাল।

সব ভেঙে চুরে ধ্বংস হয়ে যাক। শেষ হয়ে যাক গড় নাসিমপুরের সমস্ত প্রাণী। এই একমাত্র মুক্তির উপায়।

শিবশঙ্কর মজুমদারের সারা মুখ ঘামে ভিজে গেছে। আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়ালো।

চারিদিক অন্ধকার, নিস্তব্ধ। দূরে জঙ্গলের গাছের পাতার মরমর ধ্বনি পরিষ্কার শোনা যায় এখান থেকে। আর শোনা যায় অবিরাম ঝিল্লিরব।

এমন সময় বেজে উঠলো রাত্রি প্রথম প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি।

তার রেশ মিলিয়ে যেতে নিজের ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো শিবশঙ্কর মজুমদার।

: নয় :

গড় নাসিমপুর :

গড় নাসিমপুরে রাত্রি প্রথম প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি পড়েছে কিছুক্ষণ আগে। অপেক্ষা করতে হবে আরো দেড় দণ্ডকাল সময়।

দেবীকান্ত আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো।

মহেশ্বর আর কালীকৃষ্ণ মিশে আছে গাছের ছায়ার সঙ্গে। তাদের দেখা যাচ্ছেনা এই অন্ধকারে। দেবীকান্ত পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলো। জঙ্গলের ভিতর আত্মগোপন করে আছে আরো অনেকে। কিন্তু কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই।

চারদিক যেন আরো স্তব্ধ হয়ে আসছে। কিছুক্ষণ ধরে দূরের শেয়ালগুলোও আর ডাকছে না। হয়তো বুঝতে পেরেছে ধারে কাছে মানুষের উপস্থিতি, সরে গেছে আরো দূরে দূরে। শোনা যাচ্ছে না গাছের পাখিদের ডানার ঝটপট শব্দ। গভীর ঘুম নেমেছে তাদের চোখে। চাঁদ অস্ত যাওয়ার পর অন্ধকার আরো জমাট বেঁধে গেছে। মাঝে মাঝে হাওয়া দিচ্ছিলো এতক্ষণ। এখন তাও থেমে গেছে, নিথর হয়ে আছে গাছের পাতা। শুধু শোনা যাচ্ছে খালের জলের মৃদু প্রবাহ।

ঝিঁঝিঁপোকার ডাকও যেন হঠাৎ থেমে গেল একসময়।

দেবীকান্ত মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলো। আর বেশী দেরি নেই। হয়তো এখনই দেখা যাবে আলোর সঙ্কেত।

ভুজঙ্গ ঠাকুর দাঁড়িয়েছিলো খালের পাশে। দেবীকান্ত নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়ালো।

"সময় হয়ে এলো মনে হচ্ছে," বললো খুব মৃদু কণ্ঠে।

ভুজঙ্গ ঠাকুর আকাশের তারার দিকে তাকালো। তারপর বললো, "না। আরো এক দণ্ডকাল অপেক্ষা করতে হবে।"

"আরো এক দণ্ডকাল!"—দেবীকান্ত অধৈর্য হয়ে উঠলো। তাকিয়ে দেখলো গড় নাসিমপুরের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, "ওই দেখুন। সঙ্কেত করছে কেউ।" দেখতে পেয়েছে ভুজঙ্গ ঠাকুরও। একটি জানলায় কেউ দাঁড়িয়ে প্রদীপ ঘোরাচ্ছে।

ভুজঙ্গ ঠাকুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।

"ওই জানলা তো নয়!" বলে উঠলো সে।

"হ্যাঁ, তাই তো।" দেবীকান্তরও খেয়াল হোলো সে কথা।

"বাঁ দিক থেকে তৃতীয় জানলা,—একথাইতো বলা হয়েছিলো তোমায়?"

"হ্যাঁ, সেকথাই তো বলেছিলো ললিতা।"

"কিন্তু এটা তো—দুই, তিন, চার, পাঁচ," আস্তে আস্তে গুনে গেল ভুজঙ্গ ঠাকুর, "ছয়, সাত—বাঁ দিক থেকে সপ্তম জানলা।"

আঙ্গুল দিয়ে গুনে দেখলো দেবীকান্তও। বললো, "হ্যাঁ তৃতীয় জানলা একেবারে অন্ধকার। অন্য জানলাগুলোও বন্ধ।

"ব্যাপার কি দেবীকান্ত?" ভুজঙ্গ ঠাকুর জিজ্ঞেস করলো।

"হয়তো কোনো পরিবর্তন হয়েছে ললিতার পরিকল্পনায়।"

ভুজঙ্গ ঠাকুর চুপ করে একটু ভাবলো।

জানলায় প্রদীপ আস্তে আস্তে ঘোরানো হচ্ছে তখনো।

"হয়তো পূর্বনির্দিষ্ট জানলা থেকে সঙ্কেত পাঠানোর সুবিধে হয়নি," দেবীকান্ত বললো।

ভুজঙ্গ ঠাকুর আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"যাই হোক সঙ্কেত তো পাওয়া গেছে। আর কালবিলম্ব করা উচিত হবে না।"

প্রদীপ এখন স্থির হয়ে আছে। আলোর শিখা অল্প অল্প কাঁপছে। যতক্ষণ না দেবীকান্ত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে ততক্ষণ থাকবে এই আলো।

"আমার ভালো মনে হচ্ছে না," ভুজঙ্গ ঠাকুর বললো, "ওখানে তুমি একেবারে একা হয়ে পড়বে।"

"আপনি ভাববেন না। আপনার আশীর্বাদে আমি নির্বিঘ্নে কাজ হাসিল করে বেরিয়ে আসবো।"

ভুজঙ্গ ঠাকুর দেবীকান্তর কাঁধে হাত রাখলো। খুব শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "যাবেই?"

'হ্যাঁ, যেতে তো হবে," দেবীকান্ত উত্তর দিলো একটু হেসে।

ভুজঙ্গ ঠাকুর চুপ করে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললো, "তাহলে আর বিলম্ব কোরো না।"

গাছের ছায়া থেকে কালীকৃষ্ণ আর মহেশ্বরও এসে এদের কাছে দাঁড়ালো।

সবাই তাকালো সেই জানলার দিকে। থেকে থেকে কেঁপে উঠছে আলোর শিখা। আবার প্রদীপ নাড়তে লাগলো একটি অদৃশ্য হাত।

দেবীকান্ত আস্তে আস্তে নেমে পড়লো খালের জলে। তারপর নিঃশব্দে সাঁতার কেটে পৌঁছে গেল অন্য পাড়ে।

এপাড়ে এরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছে ছায়ামূর্তির মতো। খালের ওপাড়ে ঘন অন্ধকার। দেবীকান্তকে আর দেখা গেল না।

পাড় থেকে দেওয়াল উঠে গেছে। সেই দেওয়াল বেয়ে জানলায় উঠে আসতে হবে দেবীকান্তকে।

আস্তে আস্তে একটি মেঘ দেখা গেল আকাশের ঈশান কোণে। দেখতে দেখতে অর্ধেক আকাশ ছেয়ে গেল। হাওয়া বইতে শুরু করেছে আবার। মুহূর্তের মধ্যেই যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো সেই হাওয়া। অলোড়ন শুরু হোলো গাছের ডালে ডালে, বাঁশ বনের পাতায় পাতায়। একসঙ্গে অনেকগুলো শেয়াল ডেকে উঠলো চারদিকে।

খালের পাড় থেকে খাড়া দেওয়াল উপরে উঠে গেছে। নিচের থেকে দেবীকান্ত পরিষ্কার দেখতে পেলো ঠিক দশ বারো হাত উচুতে একটি জানলায় প্রদীপের আলো নাড়ানো হচ্ছে ডাইনে থেকে বাঁয়ে।

দেবীকান্ত জল থেকে উঠে এলো। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে দেওয়াল অনুভব করলো। দেওয়াল বেয়ে উঠতে হবে ওই জানলায়। বেশ শক্ত কাজ, কিন্তু দুঃসাধ্য নয় তার পক্ষে।

ইটের মাঝখানে মাঝখানে সামান্য সামান্য খাঁজ আছে। দেওয়াল বেয়ে খানিকদূর পর্যন্ত উঠে গেছে এক ধরনের শক্ত লতা। শক্ত হয়ে এঁটে আছে দেওয়ালের গায়ে। অতি সন্তর্পণে একটু একটু করে উঠতে লাগলো সে। কোনোরকমে ফস্কে গেলেই একেবারে খালের জলে গিয়ে পড়বে।

দু-একবার পা ফস্কে গেল। কিন্তু হাতের জোরে সেই পুরু শক্ত লতা ধরে কোনোরকমে সামলে নিলো নিজেকে। আবার খুঁজে নিলো পা রাখবার একটুখানি জায়গা।

প্রায় হাতের নাগালের কাছে এসে গেল উপরের জানলা। কিন্তু এইটুকু চড়া আরো শক্ত। পুরু লতা শেষ হয়ে গেছে জানলার চার পাঁচ হাত নিচে। এটুকু চড়াই ইটের খাঁজ খুঁজে নিয়ে উঠতে

হবে। কিন্তু দেওয়াল বেশ মসৃণ এজায়গায়। পাওয়া যাচ্ছে না কোনো খাঁজ। অন্ধকারের মধ্যে একটু একটু হাতড়াতে লাগলো দেবীকান্ত।

একটি খাঁজ পাওয়া গেছে। সেখানে পা রেখে সে আরেকটুখানি উঠলো। আরও তিন হাত উঠতে হবে।

অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াতে লাগলো সে। একটা পা দিয়ে একটু একটু অনুভব করে খুঁজতে লাগলো পা রাখবার জায়গা। কোনোরকমে আস্তে আস্তে আরো এক হাত উঠলো।

অনেক উপরে একটি জানলায় কাশি শোনা গেল একটুখানি। উপর তলার জানলায় বোধহয় কেউ এসে দাঁড়িয়েছে।

হ্যাঁ, জানলায় এসে দাঁড়িয়েছিলো বাসুদেব। বাসুদেব জানতো না। জানবার কথা নয়। বাসুদেব চঞ্চল মনে তার নিজের ঘরে পায়চারি করতে করতে জানলায় এসে দাঁড়িয়েছিলো।

দেবীকান্ত দেওয়ালের সঙ্গে একেবারে লেপ্টে গেল। আর দু-হাতের মতো উঠতে হবে। হাত দুটো অবশ হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন, না আর পারছে না, এক্ষুনি হাত ফস্কে পড়ে যাবে খালের জলে।

বাসুদেব বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলো। চারদিক নিস্তব্ধ। আকাশের অর্ধেকটা মেঘে ছেয়ে গেছে। ঝড় উঠছে আস্তে আস্তে। সে ঘরের ভিতর আবার পায়চারি করতে লাগলো।

দেবীকান্ত অপেক্ষা করলো কিছুক্ষণ। আর যখন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না উপরতলার জানলায়, সে আবার উঠতে লাগলো একটু একটু করে।

বিপুল উৎকণ্ঠা নিয়ে খালের ধারে দাঁড়িয়ে গড় নাসিমপুরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো ভুজঙ্গ ঠাকুর, মহেশ্বর আর

সব কিছু অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। শুধু একটা আলো জ্বলছে ওই জানলায়।

"দেখুন, দেখুন," বলে উঠলো কালীকৃষ্ণ।

প্রদীপের আলোয় দেওয়ালের গায়ে দেখা গেল একটি কালো ছায়া। নিচে থেকে আস্তে উপরে উঠে জানলা দিয়ে ভিতরে ঢুকলো।

পর মুহূর্তেই প্রদীপ নিভে গেল।

অন্ধকার ছেয়ে গেল চারদিকে। ঝড় যেন আরো প্রবল হয়ে উঠলো। এপাড়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ভুজঙ্গ ঠাকুর আর তার সহচরেরা।

জানলার চৌকাঠে হাত পৌঁছোতে দেবীকান্তর মনে হয়েছিলো যেন একযুগ কেটে গেছে। আস্তে আস্তে শুধু হাতের জোরে সে নিজেকে টেনে তুললো জানলার উপর। তারপর ঘরের ভিতর লাফিয়ে পড়লো নিঃশব্দে।

প্রদীপের আলোয় এক পলকের জন্যে যার মুখ দেখলো, সে ললিতা নয়। কিন্তু চিনতে পারলো সঙ্গে সঙ্গে-ই।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে সে ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে দিলো।

"তুমি!" স্তম্ভিত হয়ে দেবীকান্ত জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ আমি। চিনতে পেরেছেন?" বললো সিতারাবানু।

"ফৌজদার মহম্মদ কাসিম খাঁর স্ত্রী এবং কন্যা যে গড় নাসিমপুরে আছে, এ সংবাদ আমি পেয়েছি। কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে যে এভাবে এখানে দেখা হবে, সে কথা ভাবতে পারিনি। ললিতা কোথায়?"

"ললিতা আরেকটু পরে আপনাকে সংকেত করার জন্যে ওদিকের ঘরের জানলায় গিয়ে দাঁড়াবে। ও যে সময় আলো নেড়ে

সংকেত পাঠাবে বলে আপনাকে জানিয়েছিলো সেই নির্ধারিত সময়ের সামান্য দেরি আছে এখনো।"

"দেবীকান্ত বিস্মিত হোলো সিতারার কথা শুনে। জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে নির্ধারিত সময়ের আগে তুমি সংকেত করলে কেন? আমি ভেবেছিলাম হয়তো কোনো কারণে ললিতা সময় হওয়ার আগেই সংকেত পাঠিয়েছে। তোমার উদ্দেশ্যটা কি?"

বলতে বলতে তলোয়ারের বাঁটে হাত রাখলো দেবীকান্ত। সন্দেহ হোলো, মোগল ফৌজদারের কন্যা তাকে কোনো বিপদে ফেলবার জন্যে এরকম করেনি তো?

সিতারা উত্তর দিলো, "দু-বছর আগে একদিন আপনি আমার প্রাণ ও ইজ্জত রক্ষা করেছিলেন, বলেছিলেন আপনি আমার ভাই। আজ আমার ভাইয়ের প্রাণ বাঁচানোর জন্যেই আমাকে একাজ করতে হোলো।"

"প্রাণ বাঁচানোর জন্যে?" আরো বিস্মিত হোলো দেবীকান্ত, "আমার? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমার কথা।"

"ললিতাকে আপনি বিশ্বাস করে ভুল করেছেন," বললো সিতারাবানু।

"সেকী? ললিতা যে আমায় এসে বললো উত্তরা আমার সাহায্য চায়, একথা সত্যি নয়?"

"ললিতাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলো উত্তরাই, আপনার আংটিও সে-ই দিয়েছিলো তাকে। কিন্তু উত্তরার দূতী হয়ে ললিতা আপনার কাছে যায়নি, গিয়েছিলো বাসুদেব মজুমদারের চর হয়ে।"

"সে কি করে সম্ভব?" দেবীকান্ত জিজ্ঞেস করলো।

"উত্তরা জানতো না, ললিতা বাসুদেবের অত্যন্ত অনুগত। তাই সে বিশ্বাস করেছিলো ললিতাকে। কিন্তু ললিতা গিয়ে সব কথা

জানিয়েছিল বাসুদেবকে। ওর নির্দেশেই সে আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। আপনাকে এভাবে এখানে নিয়ে আসার ষড়যন্ত্র বাসুদেবের। ও ঘরে অপেক্ষা করছে পাঁচ ছ-জন লোক। ললিতার সংকেত পেয়ে আপনি খাল পার হয়ে দেওয়াল বেয়ে উঠে জানলা দিয়ে ওঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারের মধ্যে ওরা তলোয়ার হাতে আপনাকে আক্রমণ করতো। আপনি একলা ওদের সঙ্গে বেশিক্ষণ লড়তে পারতেন না।"

দেবীকান্ত স্তম্ভিত হোলো। জিজ্ঞেস করলো, "এত কথা তুমি কি করে জানো?"

"আজ হঠাৎ আড়াল থেকে শুনতে পেলাম ওদের কথাবার্তা, তাইতে জানতে পারলাম সব। খোদা মেহেরবান, আমি জানতে না পারলে আজ আপনার প্রাণে বেঁচে ফিরে যাওয়ার এবং উত্তরাকে উদ্ধার করার কোনো আশাই ছিলো না।"

"তোমার এ উপকার আমি জীবনে কোনোদিন ভুলবো না সিতারা," কৃতজ্ঞতাভরা কণ্ঠে দেবীকান্ত বললো, "কিন্তু এখন কি হবে?"

"ওধারে আরেকটা পথ আছে। আমরা উপরে চলে যাবো। আপনাকে দেখিয়ে দেবো বাসুদেবের কক্ষ। ওকে আপনি একাই পাবেন। আর যা করার আপনি স্থির করবেন।"

"কিন্তু এদিকে যে ললিতা সংকেত পাঠাবে?"

"ও তো কিছু জানে না," সিতারা বললো, "যখন দেখবে কেউ আসছে না, তখন হতাশ হয়ে চলে যাবে।"

"কিন্তু আমার লোকেরা অপেক্ষা করছে খালের ধারে। দ্বিতীয় বার আরেকটি জানালায় সংকেত দেখলে ওরা যে কিছু বুঝতে না পেরে ভাবনায় পড়বে।"

সিতারা বললো, "আমাদের তো আর কিছু করার নেই। খোদার হাতে ছেড়ে দিন সব।"

দেবীকান্ত একটু ভাবলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "উত্তরা ভালো আছে তো?"

সিতারা এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "উত্তরা এখানে নেই।"

একথা শুনে বিস্মিত হোলো দেবীকান্ত। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "এখানে নেই? কোথায় আছে উত্তরা? তাকে কোথায় নিয়ে রেখেছে বাসুদেব?"

"বাসুদেব নয়, অন্য কেউ। আমি ঠিক জানিনা," সিতারা উত্তর দিলো, "আমার যদ্দুর মনে হয় উত্তরা অন্য কারো সহায়তায় এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু—"

"কিন্তু কি? ও কোথায় আছে এখন?"

"অতো উদ্বিগ্ন হবেন না," সিতারা বললো, "ওর সঙ্গেও আজই আপনার দেখা হবে।"

"কোথায় দেখা হবে?"

"এখানে, এই গড় নাসিমপুরেই।"

"কিন্তু তুমি যে বললে উত্তরা এখানে নেই?"

"আমি জানতে পেরেছি, এখান থেকে পালিয়ে ও যেখানে লুকিয়েছিলো, সেখান থেকে অপহরণ করা হয়েছে ওকে। ওকে আজই এখানে নিয়ে আসা হবে।"

"কে তাকে ধরে আনছে? বাসুদেব?"

"না।"

"তাহলে কে?"

"অম্বিকাপুরের থানাদার সগিরউদ্দিন খাঁ। তার উদ্দেশ্য ভালো নয়। উত্তরার খুব বিপদ। আজ আপনি ছাড়া কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না।"

দেবীকান্তর শরীরের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরায় যেন আগুনের

প্রবাহ শুরু হয়েছে। বললো, "আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, উত্তরার কোনো বিপদ হতে পারেনা।"

"আসুন আমার সঙ্গে," বললো সিতারা, "কিন্তু খুব হুঁশিয়ার, আপনি একেবারে একা।"

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পালকি আসছিলো খুব দ্রুত গতিতে। ব্যথা ধরে গেছে উত্তরার সারা গায়ে।

আর কতক্ষণ?—ভাবলো উত্তরা।

শোনা গেল একজন জিজ্ঞেস করছে, "আর কদ্দুর?"

"বেশী দূর নয়," আরেকজনের উত্তর শোনা গেল, "জঙ্গল শেষ হয়ে আসছে।"

"তা হলে তো এসেই পড়েছি।"

"জঙ্গল থেকে বেরিয়ে খাল ধরে পূর্বদিকে আরো এগিয়ে তারপর খালের বাঁক ধরে উত্তর দিকে গিয়ে পেয়ে যাবো গড় নাসিমপুরের প্রবেশ পথের সাঁকো। ফাটক খোলা থাকবে আমাদের জন্যে। তবে কেউ কোনো সাড়াশব্দ করবে না।"

গড় নাসিমপুর? উত্তরা শুনে বিস্মিত হোলো, নিশ্চিন্তও হোলো একটুখানি। যাক, তবু চেনা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। কিন্তু দেবীকান্ত কি খবর পায়নি এখনো? ললিতা কি যেতে পারেনি তার কাছে?

হঠাৎ পালকি থেমে গেল। একটা ভয়ার্ত চাপা শব্দ নির্গত হোলো বাহকদের মুখ থেকে।

"কে তোমরা?" শোনা গেল কিছুক্ষণ আগে যে পথের নির্দেশ দিচ্ছিলো, তারই উদ্ধত কণ্ঠস্বর।

"পালকি নামাও," ভারী গলায় আদেশ দিলো আরেকটি অচেনা কণ্ঠস্বর, "কোনো শব্দ কোরোনা। নইলে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবো।"

বাহকেরা আস্তে আস্তে পালকি নামিয়ে রাখলো।

আবার কাদের হাতে পড়লাম ?—ভাবলো উত্তরা।

খালের ধারে ছায়ার মধ্যে মিশে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো ভুজঙ্গ ঠাকুর, মহেশ্বর আর কালীকৃষ্ণ। ওরা গড় নাসিমপুরের দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। মহলের উপরতলায় ছটো তিনটে জানলায় আলো জ্বলছে। বেশির ভাগ জানলাই অন্ধকার। কোনো রকম সাড়াশব্দ আসছে না গড়ের ভিতর থেকে।

দেবীকান্ত দেওয়াল বেয়ে উঠে জানলা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে একটু আগে। কিন্তু এদের মনে হোলো যেন এক যুগ কেটে গেছে। জানলায় প্রদীপ নির্বাপিত হয়েছে দেবীকান্ত ভিতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই।

"বড়ো ভাবনা ধরে গেল ভুজঙ্গ ঠাকুর," বললো কালীকৃষ্ণ, "রাজাবাবু একেবারে একা। কি হয় কে জানে!"

"ভাবনা করে কোনো লাভ নেই কালীকৃষ্ণ," ভুজঙ্গ ঠাকুর উত্তর দিলো, "আমরা তিন দণ্ড সময় অপেক্ষা করবো। এর মধ্যে যদি বেরিয়ে না আসে দেবীকান্ত, গড়ের ভিতর ঢুকতে হবে আমাদের।"

"আমরা এখনই যেতে রাজী ঠাকুর," বলে উঠলো মহেশ্বর।

পেছনে মৃছু পদশব্দ শোনা গেল। ফিরে তাকালো তিনজনেই।

"কে ?" ভুজঙ্গ ঠাকুর জিজ্ঞেস করলো চাপা গলায়।

"আমি বনমালী।"

"কি হয়েছে ?"

"একটি পালকি আসছিলো জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। সঙ্গে আটজন পিয়াদা। একজন মোগলও আছে। মনে হচ্ছে খুব হোমরা-চোমরা লোক।"

"কে আছে পালকির ভেতর ?"

"একটি মেয়ে। তার হাত পা মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা।"

"হিন্দু না মুসলমান?"

"হিন্দু বলেই মনে হচ্ছে।"

"ধরে আনছে নিশ্চয়ই কোনো গাঁ থেকে।" রাগে টগবগ করে উঠলো ভুজঙ্গ ঠাকুর।

"আমরা পিয়াদাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ওদের গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখেছি। সেই মোগলকে বাঁধিনি, কিন্তু ওর তলোয়ার খুলে নিয়েছি। আমাদের লোকেরা ওদের ঘিরে আছে।"

"পালকি কোথায়?"

"জঙ্গলের মধ্যে। একেবারে ধারেই। ওরা প্রায় বেরিয়ে আসছিলো জঙ্গল থেকে।"

"জঙ্গলের ভিতর খুব অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাবো না। বনমালী, পালকি জঙ্গলের বাইরে নিয়ে এসো, ওই জায়গাটায়। আর সেই মোগলকেও ধরে নিয়ে এসো।"

বনমালী চলে গেল। ভুজঙ্গ ঠাকুর এদিকে ফিরে বললো, "মহেশ্বর তুমি এখানে থাকো, নজর রাখো গড় নাসিমপুরের উপর। কালীকৃষ্ণ এসো আমার সঙ্গে।

কয়েকজন লোক পালকি তুলে আনলো জঙ্গলের প্রান্তে খোলা জায়গায় একপাশে। আর কয়েকজন লোক ধরে নিয়ে এলো এক দীর্ঘকান্তি মোগলকে। এখানে তারার আলোয় অন্ধকার একটু ফিকে হয়ে আছে। ঠাহর করে তাকিয়ে আবছা বোঝা যায় সব কিছু।

ভুজঙ্গ ঠাকুর কাছে আসতে সেই মোগল বললো, "তোমরা যদি আমাদের ছেড়ে না দাও এই মুহূর্তে, তাহলে কিন্তু বিপদে পড়বে। তোমরা জানোনা আমি কে।"

"কে তুমি?" জিজ্ঞেস করলো ভুজঙ্গ ঠাকুর।

"আমি সগিরউদ্দিন খাঁ, অম্বিকাপুরের থানাদার।"

"বটে!" ভুজঙ্গ ঠাকুর হাসলো।

সগিরউদ্দিন তাকিয়ে দেখলো গড় নাসিমপুরের দিকে। তার গন্তব্যস্থলের এত কাছে এসে তাকে এরকম বিপদে পড়তে হবে, সে ভাবতে পারেনি। এখান থেকে খুব জোরে একটা হাঁক দিলে গড় থেকে শোনা যাবে। ছুটে আসবে তার লোকজন। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। একজন লোক তার গলার কাছে তলোয়ার ধরে আছে। সন্দেহজনক কোনো ব্যবহার করলেই মাথাটা খসে পড়বে ঘাড়ের উপর থেকে।

"পালকির ভিতর কে?" ভুজঙ্গ ঠাকুর জিজ্ঞেস করলো।

"আমার বিবি।"

"তাই নাকি? তা তোমার বিবিকে হাত পা বেঁধে চোরের মতো নিয়ে যাচ্ছো কেন?"

"আমার হারেমের ব্যাপার আমি বাইরের লোকের সঙ্গে আলোচনা করিনা," উদ্ধত কণ্ঠে উত্তর দিলো সগিরউদ্দিন।

ভুজঙ্গ ঠাকুর তার দিকে আর দৃকপাত করলো না। পালকির কাছে এসে দরজা সরিয়ে, নিজের হাতে খুলে দিলো উত্তরার বাঁধন। উত্তরার সারা শরীর তখন অবশ হয়ে আছে। সে কোনো রকমে বাইরে বেরিয়ে এলো। তাকিয়ে দেখলো চারদিকের পরিস্থিতি। কয়েকজন লোক তাদের ঘিরে আছে। চারজন লোক ধরে রেখেছে এক মোগলকে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক দীর্ঘকান্তি বয়স্ক লোক।

"তোমার কোনো ভয় নেই মা," স্নিগ্ধ কণ্ঠে ভুজঙ্গ ঠাকুর বললো, "আমাদের হাতে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমাকে তোমার ছেলে বলেই মনে করো। আমার লোক তোমায় তোমার বাড়ি পৌঁছে দেবে। তোমার বাড়ি কোন গাঁয়ে মা?"

"আপনি কে?" ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো উত্তরা।

"আমার নাম ভুজঙ্গ হালদার।"

ভুজঙ্গ হালদার। সগিরউদ্দিন তাকিয়ে দেখলো চক্ষু বিস্ফারিত করে। ভয়ে সারা শরীর কেঁপে উঠলো তার। ভাবলো,—এর হাত থেকে তো নিস্তার নেই।

উত্তরাও চকিত হয়ে তাকিয়ে দেখলো। বলে উঠলো উল্লাস ভরা কণ্ঠে, "আপনি ভুজঙ্গ ঠাকুর? দেবীকান্ত কোথায়?"

অন্ধকার জঙ্গলের ধারে এক অপরিচিতা যুবতীর মুখে দেবীকান্তর নাম শুনে ভুজঙ্গ ঠাকুর বিস্মিত হোলো। মনে ঘনিয়ে এলো একটা সন্দেহের ছায়া। জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কে মা?"

"আমি রাজা ইন্দ্রনারায়ণের কন্যা উত্তরা।"

এ সন্দেহই ভুজঙ্গ ঠাকুরের মনে এসেছিলো। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি এখানে কেন?"

"আমাকে দেওয়ান কাকা গড় নাসিমপুর থেকে গোপনে বার করে নিয়ে ওঁর বোনের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এই লোক গুলো আজ ওখানে গিয়ে আমায় জোর করে ধরে নিয়ে এলো।"

"কিন্তু—ললিতা তো দেবীকান্তকে জানায়নি যে তুমি গড় নাসিমপুরে নেই!"

"দেবীকান্ত কোথায়?"

"গড়ের ভিতর ঢুকেছে তোমার উদ্ধারের উপায় করতে।"

"একা?" ভয়ার্ত কণ্ঠে উত্তরা জিজ্ঞেস করলো।

সগিরউদ্দিন হেসে উঠলো। বললো "ওকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। তবে এখনো সময় আছে। যদি আমাকে নিরাপদে গড় নাসিমপুরে ফিরে যেতে দেওয়া হয়, তাহলে আমি হয়তো তার প্রাণ বাঁচানোর উপায় করে দিতে পারি।"

"ওকে ছেড়ে দিন ভুজঙ্গ ঠাকুর," উত্তরা বলে উঠলো ব্যাকুল কণ্ঠে।

"না," উত্তর দিলো ভুজঙ্গ ঠাকুর, "ওর মতো লোককে আমি বিশ্বাস করিনা।"

"তাহলে কি হবে?" চাপা কান্নায় উত্তরায় গলা ধরে গেল।

দাঁতে দাঁত ঘসে ভুজঙ্গ ঠাকুর বললো, "আমাকেই যেতে হবে গড়ের ভিতর। যে উপায়েই হোক। আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিলো এসব কোনো একটা ষড়যন্ত্র, দেবীকান্তকে ধরবার জন্যে। কিন্তু ওতো আমার কথা শুনলো না।"

"দেখুন, দেখুন—" বলে উঠলো কালীকৃষ্ণ।

ভুজঙ্গ ঠাকুর ফিরে তাকালো গড় নাসিমপুরের দিকে। সবিস্ময়ে দেখলো,—বাঁ-দিক থেকে তৃতীয় সেই পূর্ব নির্দিষ্ট জানলায় কেউ দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে একটি প্রদীপ ঘোরাচ্ছে।

"এ কি! এই সংকেত আবার কেন?" বলে উঠলো ভুজঙ্গ ঠাকুর, "তাহলে আগের সঙ্কেতটা কিসের ছিলো!"

"কিছুই বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা," বললো কালীকৃষ্ণ।

ভুজঙ্গ ঠাকুর বললো, "আমিই যাচ্ছি এবার।"

"না, না, আপনি থাকুন," বলে উঠলো কালীকৃষ্ণ, "আমি যাই।"

ওরা এগিয়ে যাচ্ছিলো খালের দিকে। এমন সময় একটা চিৎকার শুনলো পেছনে!

—ধর ধর। লোকটা পালাচ্ছে, ওকে ধর।

—চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সগিরউদ্দিন বিদ্যুতের মতো তাদের পাশ দিয়ে ছুটে গেল খালের দিকে। কেউ ওকে আটকানোর আগেই সে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো, দ্রুত সাঁতার কেটে ওপারে গিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। কিছুই দেখা গেল না কিছুক্ষণ।

"বোধ হয় ও দেওয়াল বেয়ে উঠবার চেষ্টা করছে," মহেশ্বর বললো।

একটু পরে তাকে দেখা গেল সেই জানলায়, যেখানে তখনো

প্রদীপ ঘোরাচ্ছিলো একটি হাত। দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠে যেতে সক্ষম হয়েছে সগিরউদ্দিন খাঁ।

জানলা দিয়ে সে ঘরের ভিতর ঢুকলো।

প্রদীপ নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

অন্ধকারের বুক চিরে হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে এলো সেই জানলার ওদিক থেকে।

তারপর আবার সব নিঝুম নিস্তব্ধ।

খালের ধারে এরা পাষাণমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো নির্বাক বিস্ময়ে।

. .

উত্তরার কাছ থেকে ভুজঙ্গ ঠাকুর শুনেছিলো গড়ের উত্তরদিকের প্রবেশ দ্বার খোলা থাকবে সগিরউদ্দিন খাঁ ও তার সঙ্গীদের জন্যে। পালকির ভিতর বসে ওদের কথাবার্তা থেকে একথা জানতে পেরেছিলো উত্তরা।

কালীকৃষ্ণ আর মহেশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ করলো ভুজঙ্গ ঠাকুর। স্থির হোলো খালি পালকির বাহক ও পাহারাদার সেজে এরা অন্তত দশজন লোক গড় নাসিমপুরে প্রবেশ করবে। ঢোকবার সময় ফাটকের চৌকি সন্দেহ না করারই সম্ভাবনা।

কিন্তু উত্তরা জিদ ধরে বসলো,—খালি পালকি নয়। সেও থাকবে পালকির ভিতর। বললো, "যদি ফাটকে কেউ পালকির ভিতর উঁকি মেরে দেখে? খালি পালকি দেখে যদি ওদের সন্দেহ হয়, তাহলে গড়ের ভিতর ঢোকাই অসম্ভব হবে।"

"তোমার ওখানে যাওয়ার বিপদ আছে অনেক," ভুজঙ্গ ঠাকুর বললো, "তোমার যাওয়া কি ঠিক হবে?"

"ওখানে যে দেবীকান্ত আছে ভুজঙ্গ ঠাকুর," উত্তরা বললো, "আমি তো এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবো না। তা-ছাড়া,

গড়ের ভিতর আপনারা ঠিক মতো পথ খুঁজে পাবেন না। আমি থাকলে আপনাদের পথ দেখিয়ে দিতে পারবো।"

উত্তরা কোনো মানা শুনলো না। পালকির ভিতর গিয়ে বসলো।

সগিরউদ্দিন খাঁর সঙ্গীদের পোশাক খুলে নিয়ে মোগল সাজলো ভুজঙ্গ ঠাকুর আর তার আটজন অনুচর। পালকির বাহক হয়ে চললো আরো ছ-জন। ওরাও অস্ত্র নিলো সঙ্গে।

পালকি তুলে সবাই এগিয়ে চললো খালের পাড় ধরে।

ললিতা দুহাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে ছিলো এককোণে। সেই আর্ত চিৎকার এখনো বাজছে তার কানে।

একটু পরে শুনলো বাসুদেব বলছে, "একেবারে খতম হয়ে গেছে। আর উঠবে না। আলো জ্বালিয়ে দাও।"

প্রদীপ জ্বালানো হোলো। কিন্তু ললিতা তখনো চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিতে পারছে না। তার সারা শরীর কাঁপছে তখনো।

হঠাৎ কানে এলো বাসুদেবের বিস্মিত কণ্ঠ।

"একি! এ তো দেবীকান্ত নয়!"

"আরে! এ যে সগিরউদ্দিন খাঁ," বলে উঠলো আরেকজন।

"এ এখানে কি করে এলো," বাসুদেব স্তম্ভিত হয়ে বললো।

ললিতা আস্তে আস্তে চোখের উপর থেকে হাত সরালো। দেখলো, ঘরের মাঝখানে পড়ে আছে সগিরউদ্দিন খাঁর নিষ্প্রাণ রক্তাক্ত দেহ। ললিতার বিশ্বাস হচ্ছে না চোখে দেখেও। এ কি করে হোলো?

"সব পণ্ড হোলো!" গর্জে উঠলো বাসুদেব। এগিয়ে গেল জানলার দিকে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখলো বাইরের অন্ধকারে। কিছুই দেখতে পেলো না সে।

চারদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। শুধু থেকে থেকে দমকা হাওয়া দিচ্ছে।

"দেবীকান্ত কোথায়?" বাসুদেব জিজ্ঞেস করলো ললিতাকে।

ললিতা মাথা নাড়লো আস্তে আস্তে।

"সগিরউদ্দিন খাঁ এখানে কি করে এলো? সে এলোই বা কেন? এদিক দিয়ে কেন? ফৌজদার কাসিম খাঁকে আমি কী বোঝাবো? কে শুনতে চাইবে আমার কথা? সবাই দেখবে সাগিরউদ্দিন খাঁকে হত্যা করা হয়েছে এঘরে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না কি অবস্থায় ওর মৃত্যু হয়েছে। আমি সবাইকে কী বোঝাবো? সুবাদার মিরজুমলাকে আমি কী কৈফিয়ত দেবো?"

রাগে উন্মাদ হয়ে গেল বাসুদেব। মনে ভয়ও হয়েছে খুব। ফিরে দাঁড়ালো ললিতার দিকে। তার রক্তচক্ষুর সামনে ললিতা কুঁকড়ে গেল।

"ললিতা!"

"কি?"

"তোমার সঙ্গে রাজাবাবুর দেখা হয়েছিলো?"

"হ্যাঁ।"

"ওকে তুমি বলেছিলে সত্যি সত্যি?"

"হ্যাঁ বলেছিলাম। বিশ্বাস করো আমায়।"

"সে আসবে বলেছিলো?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে এরকম হোলো কেন? সে এলো না কেন? আর সগিরউদ্দিন খাঁই বা এলো কেন এদিক দিয়ে?"

ললিতা কি উত্তর দেবে! চুপ করে রইলো।

দু'হাত দিয়ে ললিতার গলা চেপে ধরলো বাসুদেব।

"সত্যি কথা বলো, তা নইলে সগিরউদ্দিন খাঁর সঙ্গে আরো

একটি লাশ ভাসবে ওই খালের জলে। লাশ ওখানে দেখলে আমায় কেউ সন্দেহ করবে না। আমি সবাইকে বলবো, একাজ রাজাবাবুর দলের লোকের। —বলো, তুমি রাজাবাবুর সঙ্গে মিলে কোনো ষড়যন্ত্র করো নি আমার বিরুদ্ধে ?"

ললিতা ভয়ে কেঁদে ফেললো, তারপর লুটিয়ে পড়লো বাস্থদেবের পায়ের কাছে! বললো, "বিশ্বাস করো আমায়, আমি কিছুই জানিনা।"

বাস্থদেব চলে যাচ্ছিলো, কিন্তু ললিতা তার পা জড়িয়ে ধরলো। বললো, "আমায় একটা কথা বলে যাও,—তুমি কি বিশ্বাস করো আমি তোমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করতে পারি ?"

বাস্থদেব কোনো উত্তর দিলো না, পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলো ললিতাকে। তারপর বেরিয়ে চলে গেল ঘর থেকে।

আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাস্থদেব নিজের ঘরে ঢুকলো। ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। সারাদিন বড্ড চাপ গেছে মনের উপর। এখন বড্ড ক্লান্ত বোধ করছে। কারো সঙ্গে দেখা করার বা কথা বলার ইচ্ছে আর একেবারেই নেই।

দরজা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়াতে দেখলো, খোলা তলোয়ার হাতে একজন দাঁড়িয়ে আছে ঘরের ভিতর।

"আমি এসেছি বাস্থদেব," দেবীকান্ত বললো।

ফাটকের চৌকি একেবারেই সন্দেহ করেনি। উত্তরার পালকি নিয়ে ভুজঙ্গ ঠাকুর আর তার লোকজন গড় নাসিমপুরের ভিতর ঢুকলো।

নিশুতি রাত। ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই। একটু দূরে দুচারজন জটলা করছে। কেউ লক্ষ্য করলো না।

লোহার দরজার ভারী শব্দ কানে এলো।

"কি হোলো ?" ফিরে দাঁড়ালো ভুজঙ্গ ঠাকুর।

উত্তরা ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে পালকির ভিতর থেকে। বললো, "ফাটক বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এতক্ষণ খোলা রাখা হয়েছিলো পালকির জন্যেই। রাত্তিরে তো ফাটক আর খোলা থাকবে না।"

"এখানে আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না," ভুজঙ্গ ঠাকুর বললো, "বাসুদেবের ঘর কোন দিকে? দেবীকান্ত হয়তো সেদিকেই যাবে।"

"ওই সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে হবে আমাদের।"

উত্তরার সঙ্গে সবাই এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

• •

অসিচালনায় বাসুদেবও অত্যন্ত পটু। কিছুতেই সুবিধে করতে পারছিলো না দেবীকান্ত। বাসুদেব মরিয়া হয়ে লড়ছে নিজের প্রাণ বাঁচাতে।

দেবীকান্তর উদ্যত আঘাত প্রতিহত করে সে একলাফে দরজার কাছে এসে, দরজা খুলে বাইরে চলে এলো। পেছন পেছন ছুটে এলো দেবীকান্ত! গড়ের এদিকটা নির্জন। বাসুদেব যদি এখান থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে গিয়ে হাঁক দেয়, তার লোকজন ছুটে আসবে চারদিক থেকে। তখন দেবীকান্তর পক্ষে নিজের প্রাণ বাঁচানোই অসম্ভব হয়ে উঠবে।

ঘরের মধ্যে দুহাতে মুখ গুঁজে পড়েছিলো ললিতা। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে মুখ তুললো। তাকিয়ে দেখলো চারদিকে। কেউ নেই ঘরের ভিতর।

সবাই কখন চলে গেছে। শুধু এককোণে প্রদীপ জ্বলছে টিম টিম করে। সেই আলোয় আগুনের মতো জ্বলতে লাগলো ললিতার চোখ দুটো!

হঠাৎ চোখে পড়লো মেঝের উপর পড়ে আছে একটি রক্তাক্ত

ছোরা। ললিতা হাত বাড়িয়ে সেটি তুলে নিলো। অন্য হাত দিয়ে পরীক্ষা করলো ছোরার ধার।

তারপর আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

সিঁড়ির ধাপের উপর পা হড়কে পড়ে গেল দেবীকান্ত। হাতের তলোয়ার ছিটকে কয়েক ধাপ নিচে গিয়ে পড়লো।

বাসুদেব ছুটে এসে তার পথ আটকে দাঁড়ালো।

দেবীকান্ত সরে গেল পেছন দিকে। তাকিয়ে দেখলো চারদিকে। পেছনে দেওয়াল। পালাবার পথ নেই।

বাসুদেবের চোখে একটা হিংস্র দৃষ্টি। একটা নিষ্ঠুর হাসি বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে। দেওয়ালের গায়ে বসানো ছিলো একটি মশাল। তার আলোয় ঝকমক করে উঠলো তার হাতের তলোয়ার।

"এখন কোথায় পালাবে রাজাবাবু,—শ্রীমান দেবীকান্ত রায়!" দাঁতে দাঁত চেপে বললো বাসুদেব।

দেবীকান্ত দাঁড়িয়ে রইলো নিশ্চল হয়ে!

বাসুদেব ছিলো একটি থামের পাশে। —হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সামনের দিকে। দেবীকান্ত সবিস্ময়ে দেখলো তার পিঠে একটি ছোরা আমূল বিঁধে আছে। আর থামের আড়াল থেকে একজন এসে দাঁড়িয়েছে বাসুদেবের পেছনে।

"ললিতা!" বিস্মিতকণ্ঠে দেবীকান্ত বললো।

ললিতা কোনো উত্তর দিলো না। সে একটা দুর্বোধ্য শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাসুদেবের নিষ্প্রাণ দেহের দিকে।

দেবীকান্ত কাছে এগিয়ে এলো। বললো কৃতজ্ঞ কণ্ঠে, "তুমি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো ললিতা।"

ললিতা তাকালোই না দেবীকান্তর দিকে।

"উত্তরা কোথায়, ললিতা?" দেবীকান্ত জিজ্ঞেস করলো।

ললিতা কোনো উত্তর দিলো না। আস্তে আস্তে বসে পড়লো বাসুদেবের পাশে। ওর মাথাটি তুলে নিলো নিজের কোলে, তারপর কেঁদে উঠলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো দেবীকান্ত। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করলো। কয়েক ধাপ নিচে পড়ে ছিলো তার তলোয়ার। নিচে যাওয়ার পথে সেটি তুলে নিলো।

সিঁড়ির বাঁকে অপেক্ষা করছিলো সিতারাবানু। জিজ্ঞেস করলো, "বাসুদেব ?"

আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লো. দেবীকান্ত। সিতারা বুঝতে পারলো। বললো, "আসুন, এবার আমরা রাজা ইন্দ্রনারায়ণের সন্ধানে যাই।"

উত্তরার সঙ্গে ভুজঙ্গ ঠাকুর আর অন্য সবাই উপরে উঠে আসছিলো। দেখতে পেলো তলোয়ার হাতে দেবীকান্ত নেমে আসছে। সঙ্গে সিতারাবানু।

"উত্তরা!" দেবীকান্ত বলে উঠলো।

"দেবীকান্ত!" উত্তরা ছুটে এলো তার কাছে, কোনোরকমে চোখের জল সামলে নিলো।

"বাসুদেব কোথায় ?" ভুজঙ্গ ঠাকুর জিজ্ঞেস করলো।

"সে আর নেই।"

"এখন কোনদিকে যাচ্ছো ?"

"কাকামহাশয়ের কাছে।"

ভুজঙ্গ ঠাকুর বললো, "ইন্দ্রনারায়ণের খোঁজে তোমাকে আর যেতে হবে না। আমরা আছি তার জন্যে।"

দেবীকান্ত ইতস্তত করছিলো। কিন্তু ভুজঙ্গ ঠাকুর বলে উঠলো, "না, না, আমার কথার অবাধ্য হোয়ো না। গড়ের অন্যান্য

লোকজন টের পাওয়ার আগেই তোমাকে আর উত্তরাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।"

"কিন্তু ফাটক দিয়ে বেরোনো কি সহজ হবে?" দেবীকান্ত জিজ্ঞেস করলো।

"না, ফাটক দিয়ে নয়। ফাটক বন্ধ হয়ে গেছে। দেওয়াল বেয়ে যেই জানলা দিয়ে ঢুকেছিলে, সেই জানলা দিয়েই বেরিয়ে যাও। জানলা থেকে পনেরো হাত নিচে খাল। কালীকৃষ্ণ আর ভবানী যাক তোমার সঙ্গে। উত্তরাকে ধরে খুব সাবধানে নিচে নামিয়ে দেবে। উত্তরা, সাঁতার জানো?"

"হ্যাঁ, জানি।"

"তা হলে তো কোনো কথাই নেই। সাঁতরে খাল পার হয়ে যাবে তোমরা। খালের ওপারে তারানাথের সঙ্গে অপেক্ষা করছে আরো দশজন। ওদের নিয়ে চলে যাবে গঙ্গার ধারে। সেখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।"

উত্তরাকে নিয়ে চলে গেল দেবীকান্ত। সঙ্গে গেল কালীকৃষ্ণ। সিতারাবানু ভুজঙ্গ ঠাকুরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

তোপখানার বাইরে পায়চারি করছিলো দুজন মোগল পাহারাদার। হঠাৎ একটি শব্দ শুনে দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়লো। তাকিয়ে দেখলো চারদিকে।

কেউ কোথাও নেই।

"শব্দটা এসেছে তোপখানার ভিতর থেকে," বললো একজন।

"কিন্তু সেখানে কেউ ঢুকবে কি করে? এই দরজা ছাড়া তো অন্য পথ নেই।"

"দেখে আসি ভেতরে গিয়ে।" দরজা ঠেলে সে ভিতরে ঢুকলো। ঢুকেই দেখতে পেলো শিবশঙ্করকে। তার এক হাতে মশাল, অন্য হাতে খোলা তলোয়ার।

“আরে মশাল নিয়ে তোপখানার ভেতর কে?” পাহারাদার চিৎকার করে উঠলো। সে ভেবেই পেলো না এ লোকটি এখানে ঢুকলো কি করে। এখানে আসবার যে একটি গুপ্তপথ আছে সেকথা মোগলদের জানা ছিলো না।

সে হাতিয়ার তুলে ছুটে গেল শিবশঙ্করের দিকে।

শিবশঙ্কর নিজের তলোয়ার দিয়ে প্রতিহত করলো তার আঘাত। তার বয়েস হয়েছে, বেশ কষ্ট হচ্ছিলো পাহারাদারের আক্রমণ সামলাতে।

পাহারাদার চিৎকার করে ডাকলো তার সঙ্গীকে। হঠাৎ একটা ঘণ্টা বাজতে শুরু করলো বাইরে। মহলের সবাইকে হুঁসিয়ার করে বিপদের সংকেত জানানো হচ্ছে।

আরো পায়ের সাড়া শোনা যাচ্ছে। অনেকে ছুটে আসছে এদিকে।

পাহারাদারের মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

শিবশঙ্করও জখম হয়েছে। তার ক্ষতস্থান থেকে খুব রক্তস্রাব হচ্ছে। অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে সে।

দরজার কাছে একটা শোরগোল। কয়েকজন পাহারাদারকে দেখা গেল সেখানে।

পাশের একটি ঘরে সংরক্ষিত আছে গোলা-গুলি-বারুদ। জ্বলন্ত মশাল হাতে শিবশঙ্কর টলতে টলতে সে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

পেছন থেকে চিৎকার করে উঠলো সবাই।

গঙ্গার ধারে অন্যান্য সবার সঙ্গে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিলো দেবীকান্ত আর উত্তরা।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল। এর মধ্যে বেরিয়ে আসা উচিত ছিলো ওদের সবার।

৫

হঠাৎ চারদিক প্রকম্পিত করে একটা তীব্র বিস্ফোরণের শব্দ হোলো। আর সঙ্গে সঙ্গে আকাশে দেখা গেল আগুনের আভা। বহুদূরাগত কণ্ঠের আর্তনাদ, চিৎকার, শোরগোল শোনা গেল।

বিস্ফোরণ আর থামেই না, হয়েই চলেছে একটার পর একটা।

জঙ্গলের ভিতর থেকে একজন লোক এলো ছুটতে ছুটতে। দেবীকান্তর কাছে এসে বললো, "কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তোপখানায়। মহলগুলো সব ধ্বসে পড়েছে। সারা গড় নাসিমপুরে আগুন জ্বলছে।

ঠোঁট কামড়ালো দেবীকান্ত। উত্তরা দুহাতে মুখ ঢাকলো।

তখন শেষ রাত।

তিন চারটি ছিপ গঙ্গায় উজান বেয়ে এগিয়ে চলেছে। জোয়ার এসে গেছে নদীতে।

চুপচাপ পাশাপাশি বসেছিলো উত্তরা আর দেবীকান্ত।

গড় নাসিমপুর ওরা অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। কেউ ফেরেনি,—ভুজঙ্গ ঠাকুর নয়, ওর সঙ্গীরা নয়. রাজা ইন্দ্রনারায়ণও নয়। ওই অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে সবার সঙ্গে ওরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সিতারাবানু আর ললিতাও।

সবারই কথা দেবীকান্তর মনে পড়ছিলো,—বিশেষ করে সিতারাবানুর কথা। ওরই মুখখানি নিজের মনের মধ্যে ভেসে উঠছিলো বারবার।

অনেকক্ষণ পর উত্তরা জিজ্ঞেস করলো. "দেবীকান্ত, আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"দক্ষিণে। সেখানে নতুন আবাদ গড়ে তুলবো আমরা," দেবীকান্ত উত্তর দিলো।

"এখান থেকে, এসব থেকে অনেক দূরে?"

"হ্যাঁ উত্তরা, অনেক দূরে।"

উত্তরা আর কিছু বললো না।

পূব আকাশে দপদপ করে জ্বলছে একটা মস্তো বড়ো তারা।

উত্তরা সেদিকে তাকিয়ে রইলো।